অরবিন্দের গীতা

প্রথম খণ্ড

(অরবিন্দের Essays on the Gita হইতে অনূদিত)

ডি, এম্, লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

উৎসর্গ

জন্মিয়া অবধি তোমার চরণে কত অপরাধ করেছি, তোমার প্রাণে ব্যথা দিয়েছি—তবু তোমার স্নেহ কোন দিন কম করে দাওনি। াকে সংসারে সুখী করবার আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ন্যার শোকে তোমার হৃদয় জর জর। গীতাতে সকল শোকেব ঃ আছে, আত্যন্তিক সুখের সন্ধান আছে, কেমন করিয়া সংসারের ল ঘটনা, সকল জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ, দ্বন্দ্ব মিলনের মধ্যে ভগবানের ইচ্ছা দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতে পারা যায় তাহার সন্ধান ছ—তাই এই বইখানি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম। অকৃত্য ানের এই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ কর।

তোমার চির স্নেহাশ্রিত

অনিল

শ্রীঅরবিন্দের গীতা

অনিলবরণ রায় অনূদিত

প্রথম খণ্ড	...	১।০
দ্বিতীয় খণ্ড	...	২॥০
তৃতীয় খণ্ড	...	১।০
চতুর্থ খণ্ড	...	১।০

প্রকাশক

ডি, এম্, লাইব্রেরী

সূচীপত্র

১ম অধ্যায়—	গীতার উপযোগিতা	... ...	১
২য় ”	ভগবান গুরু	... ...	১০
৩য় ”	মানব শিষ্য	... ...	২১
৪র্থ ”	গীতার মূলশিক্ষা	... ...	৩৫
৫ম ”	কুরুক্ষেত্র	... ...	৫১
৬ষ্ঠ ”	মনুষ্য ও জীবন-যুদ্ধ	... ...	৬২
৭ম ”	ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম	... ...	৭৪
৮ম ”	সাংখ্য ও যোগ	... ...	৯০
৯ম ”	সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত	... ...	১১৪
১০ম ”	বুদ্ধি যোগ	... ...	১২৮

"অনুবাদ খুবই ভাল হইতেছে। সাধারণ পাঠকেরা
আপনার অনুবাদের সাহায্যে সহজেই
গীতা বুঝিতে পারিবে।"

—শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দের গীতা

প্রথম অধ্যায়

গীতার উপযোগিতা

জগতে বহু ধর্ম্মগ্রন্থ, বহু দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত আছে। যে সকল লোকের জ্ঞানের গভীরতা বড় অধিক নহে তাঁহারা ভাবেন একমাত্র তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থেই ভগবানের পরম বাক্য নিহিত আছে, আর সব জুয়াচুরি বা ভ্রান্ত। অনেক সময় বিজ্ঞ দার্শনিকেরাও মনে করেন যে তাহাদের মতই জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে শেষ কথা। তবে আজকাল মানুষ এ বিষয়ে একটু নরম হইতেছে। এখন আর আমরা অস্ত্রের সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার করি না, মতের সহিত না মিলিলে আমরা কাহাকেও পোড়াইয়া মারিতে চাহি না। এখন আমরা শিখিয়াছি যে সত্য কাহারও একচেটিয়া নহে—সকল মতে, সকল ধর্ম্মগ্রন্থেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত থাকিতে পারে। তবে এখনও অনেকের এই অভিমানটুকু আছে যে অন্যত্র আংশিক সত্য থাকিলেও—আমাদের যাহা তাহাই অখণ্ড পূর্ণ সত্য এবং তাহা ছাড়া গতিমুক্তির আর পথ নাই। আমরা যে ধর্ম্মগ্রন্থের আদর করি, যে দার্শনিক মত পোষণ করি তাহার সবটাই আমরা অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চাই—এতটুকু ছাঁটিয়া দিতেও আমরা নারাজ।

অতএব, বেদ, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা করিতে হইলে আমরা এগুলিকে কি চক্ষুতে দেখি এবং জীবন সমস্যার

সমাধানে ইহাদের উপযোগিতা কতটা উপলব্ধি করি, সর্ব্বাগ্রে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন।

সত্য যে এক এবং সনাতন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দুর সত্য, মুসলমানের সত্য, খৃষ্টানের সত্য ভিন্ন নহে। লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যাহা সত্য ছিল তাহা আজও সত্য। তবে দেশ কাল পাত্র ভেদে এক সনাতন সত্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।—আবার, সেই এক সনাতন সত্য হইতে অন্য অনেক সত্য উদ্ভূত ও উদ্ভাসিত হইয়াছে। সে সবই কোন এক বিশেষ গ্রন্থে বা কোন এক বিশেষ অবতারের দ্বারা নিঃশেষে কথিত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব সত্যজ্ঞান যাহা কিছু লাভ করিবার আছে তাহার সবই যে গীতায় আছে তাহা আমরা বলি না। আবার গীতার ভিতর যাহা আছে তাহার সবই যে সকল দেশ, সকল কালের জন্য সত্য তাহাও আমরা বলি না।

তবে কোন বিশেষ কাল বা স্থানের বাহিরে প্রযুজ্য নহে এমন কথা গীতাতে খুব কমই আছে এবং যেখানে এরূপ কথা আছে সেগুলিও সহজেই সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালের করিয়া লওয়া যাইতে পারে অথচ তাহাতে অর্থের কোন হানি হয় না। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাউক।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। মানব হোমের দ্বারা দেবতাগণের তৃপ্তি সাধন করিবে, দেবতারা তুষ্ট হইয়া বৃষ্ট্যাদি দানে মানুষের পোষণ করিবে—এইরূপ পরস্পরের আদান প্রদানে সকলের অভীষ্ট লাভ হইবে। প্রাচীন ভারতে এইরূপ প্রথা, যজ্ঞ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল বটে কিন্তু এখন ভারত হইতেই ইহা একরকম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেবতারা ঘৃতাহুতিতে তুষ্ট হইয়া বৃষ্টি প্রদান করে, এই বিজ্ঞানের যুগে একথা সকলে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। কিন্তু, পুরাকালে

প্রচলিত যজ্ঞপ্রথা অবলম্বন করিয়া গীতায় এখানে যে সত্য উক্ত হইয়াছে তাহা সার্ব্বজনীন। পরস্পরের আদান প্রদানে শুধু মানব সমাজ নহে—এই বিশ্ব প্রকৃতিই যে টিকিয়া আছে তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাই স্বীকার করিবেন এবং গীতাকথিত যজ্ঞের অর্থ এইরূপ আদান প্রদান ধরিয়া লইলে গীতার বক্তব্যের কোন হানি হয় না। জননীর আত্মদানে সন্তানের সৃষ্টি হইতেছে। বৃক্ষলতা মাটি, জল, বায়ু হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া জীব জন্তুর আহার যোগাইতেছে, জীব জন্তু মরিয়া লতা বৃক্ষের সার হইতেছে। সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রকে আলো ও উত্তাপ প্রদান করিতেছে—গ্রহগণ পরস্পরের আকর্ষণের দ্বারা সৌর মণ্ডলকে ধরিয়া রাখিয়াছে। সমুদ্র হইতে মেঘ হইতেছে—মেঘ হইতে সমুদ্র হইতেছে ইহাই প্রবর্ত্তিত জগচ্চক্র। ইহাতেই সকলে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে। যে ব্যক্তি জীবের মঙ্গলের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য কিছু দান না করিয়া শুধু নিজের ইন্দ্রিয় সুখভোগ ও স্বার্থ লইয়া আছে—

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবিত।

পাপময় জীবন ইন্দ্রিয়পরায়ণ সে ব্যক্তি বৃথা জীবিত থাকে।—

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ

যাহারা কেবল আপনার জন্যই পাক করে সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে।

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের শেষে কথিত হইয়াছে "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ"—"অতএব ইহা কর্ত্তব্য, ইহা অকর্ত্তব্য, এই তত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ।" এখানে শাস্ত্র বলিতে যদি ভারতে তৎকালে প্রচলিত শ্রুতি স্মৃতি মাত্র ধরা যায় তাহা হইলে গীতাকে খুব সঙ্কীর্ণ করা হয়।—মানুষের মনে কত সময় কত কামনার উদ্রেক

হইতেছে, "লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে।" যাহা ইচ্ছা হইল তাহাই করিলে মানুষে আর পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। তাই মানুষ নিজেদের কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়ের জন্য বিচার যুক্তির দ্বারা কতকগুলি বিধি স্থির করিয়াছে। এই সকল বিধিনিষেধ দেশকালভেদে কিছু কিছু ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু কাম ক্রোধের বশে কার্য্য না করিয়া এই সকল বিধি নিষেধ মানিয়া কার্য্য করিলে পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি ক্রমেই সংযত হয় এবং সেই জন্যই এই সকল বিধি নিষেধকে শাস্ত্র বলা হইয়াছে। তাই, গীতা যখন বলিয়াছে শাস্ত্রই কার্য্যাকার্য্যের প্রমাণ, সেখানে প্রাচীন হিন্দু সমাজে যাহা শাস্ত্র বলিয়া প্রচলিত ছিল শুধু তাহাই বুঝিবার কোন প্রয়োজন নাই। খৃষ্টান যথেচ্ছাচারী না হইয়া খৃষ্টান শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করুক, মুসলমান কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে মুসলমান শাস্ত্রের অনুসরণ করুক, হিন্দু হিন্দুর শাস্ত্রবিধি মত কার্য্য করুক—মোটকথা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার পরিবর্ত্তে কোন নির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধকে কার্য্যাকার্য্যের মানদণ্ড ও প্রবর্ত্তক করুক তাহা হইলেই তাহাদের সদ্গতি লাভ হইবে।

গীতায় যে চারিবর্ণের বিভাগ দেওয়া আছে জগতে তাহা এখন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু, একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এই চারিবর্ণ বিভাগ একটি আধ্যাত্মিক সত্যের বাহ্যিক আকার মাত্র। সে সত্য এক যুগে এক আকার ধারণ করিয়াছিল। এখন অবস্থার পরিবর্ত্তনানুসারে অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের বিভাগানুসারে মনুষ্যেরা বিভিন্ন প্রকৃতিশালী হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক জাতির প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম ও কর্ম্মের ধারা আছে, প্রত্যেকেরই প্রকৃতিগত একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং কর্ম্মের দ্বারা সেই বৈশিষ্ট্যের বিকাশই ব্যক্তিগত বা জাতিগত

সার্থকতা। প্রাচীনকালে এইরূপ বৈশিষ্ট্যানুসারে সমাজকে চারি ভাগ করা চলিত। এখন সমাজের কর্ম্ম বাড়িয়া যাওয়ায় প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যও বাড়িয়া গিয়াছে—ফলে সে চারিবর্ণ বিভাগের আর কোনও সার্থকতা নাই। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক জাতির যে একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে এবং স্বভাব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের দ্বারা সেই বৈশিষ্ট্যের বিকাশ করিতে পারিলেই যে পরমার্থ লাভ হইতে পারে গীতাপ্রচারিত এই সত্য, সর্ব্ব কাল সর্ব্ব যুগেরই উপযোগী।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বুদ্ধি ও মানসিক অবস্থা হইতে আমাদের বুদ্ধি ও মানসিক অবস্থা ভিন্ন হইয়াছে। যে সত্য যে ভাবে তাঁহাদের নিকট প্রচারিত হইয়াছিল, উহা তাঁহারা যেমন বুঝিয়াছিলেন—আমাদের পক্ষে তাহা ঠিক সেই ভাবে বুঝা অসম্ভব।—অতএব, গীতার ন্যায় একখানি পুরাতন গ্রন্থের অর্থ লইয়া যে মতভেদ হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। গীতাকে লইয়া কত বিভিন্ন ভাষ্য, বিভিন্ন টীকা রচিত হইয়াছে এবং আজও হইতেছে ইহা হইতে বুঝা যায় যে গীতা কথিত দার্শনিক তথ্য সমূহের ঠিক অর্থ বোঝা এখন আর সম্ভব নহে।

তবে, কিসের জন্য আমরা গীতা পড়িব? দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা ও আলোচনা করিবার নিমিত্ত গীতা পাঠের কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই। যে সকল সত্য শুধু বুদ্ধিগম্য নহে—যোগলব্ধ দৃষ্টিতেই যেগুলি জানিতে পারা যায়—যাহা হইতে মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে অনেক সহায়তা পাইতে পারে—এইরূপ সত্যসমূহের সন্ধান গীতার ভিতর আছে এবং এই সকল সত্য বর্ত্তমান ভাব ও ভাষার ভিতর দিয়া প্রচার করাই গীতা-আলোচনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।—মানুষ বুদ্ধির চালনায় জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে যত প্রশ্ন, যত সমস্যা তুলিতে পারে গীতার মধ্যে সে সকলের

সমাধান নাই বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে, কর্ম্মক্ষেত্রে পথ দেখাইতে পারে, আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সহায়তা করিতে পারে, এরূপ যত সত্য গ্রহণ করিবার শক্তি আমাদের আছে সে সমুদায়ই গীতার ভিতর আছে এবং এইখানেই গীতাপাঠের সার্থকতা।

যোগলব্ধ, যোগজীবনের সহায় সার্ব্বজনীন সত্যসমূহ প্রচার করিতে হইলে, দেশকালোপযোগী ভাব ও ভাষা অবলম্বন করিতে হয় এবং প্রচলিত দার্শনিক পরিভাষা ও মতবাদসমূহেরও সাহায্য লইতে হয়। তবে কোন বিশেষ দেশ বা কালের বাহিরে প্রযুজ্য নহে, গীতাতে এমন কথা খুব কম আছে এবং গীতার ভাব এরূপ উদার ও গভীর যে এইগুলি সহজেই সর্ব্বযুগ সর্ব্বদেশের করিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। গীতায় যে সকল দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ আছে সেগুলিকেও আমাদিগকে এই ভাবেই লইতে হইবে। গীতা যেখানে যোগদর্শন বা সাংখ্যদর্শনের উল্লেখ করিয়াছে সেখানে পুরাকালে প্রচলিত সমগ্র যোগদর্শন বা সাংখ্যদর্শনের কথা ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই। বৈদান্তিক সত্যের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সাংখ্য ও যোগের মধ্যে সার বস্তু যতটা পাওয়া গিয়াছে, গীতায় তাহাই লওয়া হইয়াছে। গীতা সাংখ্য ও যোগকে একই বৈদান্তিক সত্যে পৌছিবার দুইটী পথ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে—জ্ঞানের পথই সাংখ্য, কর্ম্মের পথই যোগ।

টীকাকারেরা গীতাকে কোন এক বিশেষ দার্শনিক মতবাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সকল মতের লোকই যে নিজেদের মত সমর্থন করিতে গীতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদকে সমর্থন করিবার

জন্য গীতা লিখিত হয় নাই। তৎকালপ্রচলিত সমস্ত মতবাদের উদার সমন্বয় গীতার ভিতরে দেখা যায় এবং এই সমন্বয়ের সাহায্যে গীতা যে চিরন্তন সত্যসমূহ প্রকাশ করিয়াছে—তাহার প্রমাণ শুধু যুক্তি তর্ক নহে। গীতাপ্রদর্শিত পথে যাঁহারা অগ্রসর হইবেন তাঁহারাই ঐ সকল সত্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া নিজেদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আরও অগ্রসর হইতে পারিবেন।

গীতার ভাষা, গীতার চিন্তার ধারা, গীতার ভাব প্রকাশের রীতি পদ্ধতি এরূপ যে কোন বিশেষ মতবাদের ভিতর গীতা সীমাবদ্ধ নহে, কোন মতবাদকে গীতা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করে না। এক অনাদি ব্রহ্ম হইতে সমগ্র জগতের উৎপত্তি একথা গীতা স্বীকার করিলেও অদ্বৈতবাদ গীতার মত নহে এবং যদিও গীতা ত্রিগুণময়ী মায়ার কথা বলিয়াছে তথাপি গীতা মায়াবাদী নহে ; যদিও গীতার মত এই যে সেই এক ব্রহ্মের পরা প্রকৃতিই জীব হইয়াছে এবং ব্রহ্মে মিশিয়া এক হইয়া যাওয়ার উপরে জোর না দিয়া তাহাতে বাস করার কথাই গীতা বিশেষভাবে বলিয়াছে, তথাপি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও গীতার মত নহে। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইতেই যে সংসার হইয়াছে একথা স্বীকার করিলেও গীতা সাংখ্য নহে ; পুরাণে যাহাকে বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে সেই কৃষ্ণকেই গীতা পূর্ণ ভগবান বলিয়াছে এবং অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম হইতে কৃষ্ণকে ভিন্ন বা কোন অংশে ছোট বলে নাই—তথাপি গীতা বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থ নহে। দার্শনিক মতবাদের তর্কযুদ্ধে কোন পক্ষের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য গীতা লিখিত হয় নাই। ইহার ভিতর সকল মতবাদের অপূর্ব্ব সমন্বয় আছে এবং এমন তথ্যের সন্ধান আছে যাহার সাহায্যে সমস্ত আধ্যাত্মিক সত্যের জগতে প্রবেশ লাভ করা যাইতে পারে।

ভারতের চিন্তার ইতিহাসে এইরূপ সমন্বয় অন্য সময়েও হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণের আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে বাহ্যজগতের অন্তরালে যে দেবজগতের সন্ধান মিলিয়াছিল তাহাই তৎকালোচিত ভাব ও ভাষায় বেদে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল আধ্যাত্মিক সত্যের সংগ্রহ এবং তাহাদের মধ্যে গভীর সামঞ্জস্যের সমাধান করিয়া উপনিষদ্ বৃহত্তর সমন্বয় সৃষ্টি করিল। এই অপূর্ব্ব রত্নের আকর উপনিষদ্সমূহকে মন্থন করিয়া বিচার যুক্তির সাহায্যে গীতা পরমার্থ লাভের উপায় স্বরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন শক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে। তন্ত্র আবার আধ্যাত্মিক জীবনের বাধাসমূহকে ধরিয়া সেইগুলিকে পূর্ণতর জীবনের সহায়রূপে ব্যবহার করিবার পথ দেখাইয়াছে—সমগ্র জীবনকে ভগবানের লীলা স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সন্ধান দিয়াছে। মানুষ যে পূর্ণ দেবত্ব লাভ করিতে পারে বৈদিক ঋষিরা তাহা জানিতেন, তন্ত্র আবার এই সত্য ধরিয়াছে এবং অতঃপর মানবজাতির ভবিষ্যৎ গঠনে এই সত্য বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে।

যে যুগে মানুষ পূর্ণ দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইবে এখনই তাহার সূচনা হইয়াছে। বেদ বা উপনিষদ্, গীতা বা তন্ত্রের চতুঃসীমার মধ্যে আমাদিগকে বদ্ধ থাকিতে হইবে না। কত নূতন স্রোত আমাদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। শুধু ভারতের নহে, সমগ্র জগতের মহান্ ধর্ম্মনীতিগুলি আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। বর্ত্তমান যুগের অনুসন্ধিৎসার ফলে যে সকল শক্তিপূর্ণ তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে সেগুলিও আমরা অবহেলা করিতে পারি না; পুরাতন, অতি পুরাতন যুগের কত গুপ্ত রহস্য, নূতন আলোক আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতেছে। এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আবার আমরা আর এক মহান্—অতি মহান্ সমন্বয়ের

সম্মুখীন হইয়াছি। কিন্তু, পূর্ব্বপূর্ব্ব কালে যেমন শেষের সমন্বয়কে ভিত্তি করিয়াই নূতন বৃহত্তর সমন্বয় গড়িয়া উঠিয়াছে—এবারেও সেইরূপ আমাদিগকে ভবিষ্যৎ বিরাট সমন্বয়ের জন্য গীতাকেই ভিত্তি করিতে হইবে —গীতা হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে।

অতএব, পাণ্ডিত্যের সহিত দার্শনিক গূঢ়তত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনার নিমিত্ত আমরা গীতা পাঠ করিতে চাহি না। গীতার মধ্যে যে সার্ব্বজনীন চিরন্তন সার সত্য নিহিত রহিয়াছে, যাহার সাহায্যে মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিতে পারে, পূর্ণ দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারে—তাহার সন্ধান করাই আমাদের গীতা পাঠের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান গুরু

জগতের অন্য সমস্ত ধর্ম্ম পুস্তক হইতে গীতার বিশেষ তফাৎ এই যে গীতা বেদ, উপনিষদ্, কোরাণ বা বাইবেলের মত নিজেই একটি স্বতন্ত্র পুস্তক নহে—ইহা একটি জাতির জীবন ও যুদ্ধের ইতিহাস মহাকাব্য মহাভারতের অংশ। তৎকালীন এক মুখ্য ব্যক্তি তাহার জীবনের সর্ব্ব-প্রধান কর্ম্মের সম্মুখীন হইয়াছে, সে কর্ম্ম অতি ভীষণ, তাহাতে বিষম অনর্থ ও রক্তপাতের সম্ভাবনা, এমন সময় উপস্থিত যে—হয় তাহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে নতুবা অচল অটল ভাবে সেই কর্ম্ম শেষ পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইতে হইবে—এই সন্ধিক্ষণে গীতার উৎপত্তি।

কেহ কেহ বলেন গীতা স্বতন্ত্রভাবে রচিত হইয়াই প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিখ্যাত মহাকাব্য মহাভারতের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই মতের পক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু, যদিও একথা সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে গ্রন্থকার অতি যত্নের সহিত গীতাকে মহাভারতের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন এবং যে ঘটনা অবলম্বন করিয়া গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। "তুমি যুদ্ধ কর" একথা শুধু যে গীতায় প্রথমে বা শেষে আছে তাহা নহে—যখন গভীর দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা হইতেছে, তাহার মধ্যেও গ্রন্থকার অনেক সময় স্পষ্টভাবেই এই কথার উল্লেখ

করিয়াছেন। অতএব, গীতা বুঝিতে হইলে এই যে ঘটনা গুরু ও শিষ্য উভয়ে সকল সময়েই মনে রাখিয়াছিলেন—তাহার হিসাব আমাদিগকে করিতেই হইবে। গীতায় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তত্ত্বসমূহ সাধারণ ভাবে আলোচিত হয় নাই, জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানে ঐ সকল তত্ত্বের প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই সমস্যা কি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অর্থ কি, অর্জ্জুনের আভ্যন্তরিক জীবনের উপরেই বা ইহার প্রভাব কি—তাহা বুঝিতে না পারিলে গীতার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে।

জীবনের কোন সামান্য ব্যাপার লইয়া যে সকল প্রশ্ন বা সংশয় উঠে, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ ধারণার দ্বারাই সে সকলের সমাধান হইতে পারে। কিন্তু এরূপ সাধারণ ঘটনা প্রসঙ্গে জীবনের গূঢ় রহস্য সম্যক আলোচনা করা যায় না। বহুমুখী গভীরতম জ্ঞানের প্রচার করিতে হইলে এরূপ অসাধারণ ঘটনা প্রয়োজন, যে প্রসঙ্গে কঠিন প্রশ্ন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের জটীল সমস্যাসমূহ আপনিই উঠিতে পারে। গীতার গুরু এবং শিষ্য এবং যে অবস্থায় গীতার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এই তিনটির বিশেষ নিগূঢ় অর্থ আছে। মানবের জীবন ও আধ্যাত্মিকতার গূঢ় সমস্যাসমূহ এই তিনটির সাহায্যে কতকটা রূপকচ্ছলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মানবরূপে অবতীর্ণ ভগবানই গীতার গুরু। ভগবান তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যে বিরাট যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছেন এবং অলক্ষ্যে চালনা করিতেছেন—সেই কর্ম্মের নায়ক এবং সেই যুগের মুখ্য ব্যক্তি অর্জ্জুন হইতেছেন গীতার শিষ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ জ্ঞাতিহত্যার সম্ভাবনা দেখিয়া অর্জ্জুনের মনের ভিতর যখন তোলপাড় উপস্থিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার অভ্যস্ত ধারণাসমূহ ধাক্কা খাইয়া যখন ওলট পালট হইয়া গিয়াছে, জগৎ কি, ঈশ্বর কি, মানবের জীবনের, মানবের কর্ম্মের অর্থ কি,

উদ্দেশ্য কি—এই সমস্ত প্রশ্ন যখন স্বতঃই উঠিয়াছে সেই সন্ধিক্ষণ অবলম্বন করিয়া গীতার শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে।

ভগবানের অবতার সম্বন্ধে বিশ্বাস ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতেই সুপ্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য দেশে এ বিশ্বাস কখনই তেমন দৃঢ় হয় নাই, কারণ সেখানে লোকে অবতারের কথা শুধু ধর্ম্মগ্রন্থেই পড়িয়াছে, যুক্তির দ্বারা বা জীবনে তাহারা ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি করে নাই। ভারতবাসীর জীবনের উপর বেদান্তপ্রচারিত সত্যের প্রভাব অত্যন্ত বেশী এবং সেই সত্যের সহিত অবতার-বাদের বিশেষ সম্পর্ক থাকায় ইহা সহজেই ভারতবাসীর বুদ্ধিতে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। জগতে যাহা কিছু আছে সবই ভগবানের প্রকাশ। তিনিই একমাত্র সৎবস্তু এবং তাহার মূর্ত্তি বা অংশ ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তবে, ভগবানের প্রকাশেরও ক্রম আছে। ভগবান নিত্য, শুদ্ধ, পরব্রহ্ম। সাধারণ জীবে ভগবানের অংশ মায়ার আবরণে আবদ্ধ রহিয়াছে, অজ্ঞানান্ধ জীব তাহার দেবত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। স্থানে স্থানে ভগবানের বিশেষ শক্তির আবির্ভাব—সেগুলি বিভূতি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু, যখন সেই অজ অব্যয়াত্মা ভূতগণের ঈশ্বর জগতের কল্যাণের নিমিত্ত নিজ মায়াকে বশীভূত করিয়া (সাধারণ জীবের মত মায়ায় বশীভূত হইয়া নহে) মায়িক দেহ গ্রহণ করেন—মানব শরীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রতীত হন—সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও মানবোচিত শরীর মন বুদ্ধির ভিতর দিয়া কর্ম্ম করেন—তখনই তাহাকে অবতার বলা হয়।

মানুষের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন। মানুষ যেদিন তাহা সম্যকরূপ উপলব্ধি করে—সেই দিন হইতেই সে ভগবানের মধ্যে বাস করে। বেদান্তবাদীদের মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণব তাঁহারা নর-নারায়ণের রূপক

অবলম্বন করিয়া এই তত্ত্বটি বেশ পরিস্ফুট করিয়াছেন। নর নারায়ণের চির সাথী। নর অর্থাৎ জীবাত্মা যেদিন বুঝিতে পারে যে সে নারায়ণ অর্থাৎ পরমাত্মার সখা তখনই সে স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হইতেই সে ভগবানের নিকট বাস করে—"নিবসিষ্যসি ময্যেব।" সখারূপে ভগবান সকল সময়েই আমাদের কাছে কাছে রহিয়াছেন—আমাদের হৃদয়-রথে সর্ব্বদাই তিনি সারথিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে চালাইতেছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

—তিনি যে আমাদের কত আপনার, কত নিকট বন্ধু, আমাদের হাত ধরিয়া কেমন করিয়া তিনি আমাদিগকে চালাইতেছেন—তাহা আমরা বুঝি না। যেদিন এই মায়ার আবরণ, এই অজ্ঞানের অন্ধকার টুটিয়া যায়, মানুষ হৃদিস্থিত হৃষীকেশের সম্মুখীন হয়, তাহার বাণী শুনিয়া প্রমাদ ঘুচায়, তাহার শক্তিতে কর্ম্ম করে—তখনই সে তাহার মনবুদ্ধি ভগবানে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে এবং ভগবানের মধ্যে বাস করিতে সক্ষম হয় এবং ইহাকেই গীতা "উত্তম রহস্য" বলিয়াছেন। মানুষের মধ্যে হৃষীকেশ অন্তর্য্যামীরূপে চিরদিনের জন্যই অবতার—এই অন্তর্য্যামী ভগবান যখন মানব শরীর, মানব মন বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দেন, পথ দেখান, চালিত করেন তখন তিনি বাহ্যজগতে অবতাররূপে প্রকট হন।

অতএব অবতারবাদের দুইটী দিক আছে। সকল মানবের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন—যদি আমরা এই অন্তর্য্যামী ভগবানকে অবতার বলিয়া ধরিয়া লই তাহা হইলে ভগবান বাস্তবিকই স্বয়ং মানব শরীর গ্রহণ করেন, একথা না মানিলেও গীতার অর্থ বুঝিতে বিশেষ কোন অসুবিধা

হয় না। বাস্তবিক যীশুখৃষ্ট নামে কোন মানব পৃথিবীতে কখনও ছিলেন কি না ইহা লইয়া ইউরোপে যে বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে ভারতের পণ্ডিতেরা তাহাকে পণ্ডশ্রম বলিয়াই মনে করিবেন। আমাদের হৃদয়ের ভিতর যীশু রহিয়াছেন তাঁহাকে যদি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, তাঁহার শিক্ষার আলোকে নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারি, দেবভাব পাইবার জন্য মানুষভাব হইতে মুক্ত হইতে পারি তাহা হইলে যীশু বলিয়া কেহ মেরীর পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল কি না, রাজদ্রোহ অপরাধে তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারা হইয়াছিল কি না তাহাতে আমাদের কিছুই আসিয়া যাইবে না। সেইরূপ যে কৃষ্ণ চিরন্তন অবতাররূপে মানবমাত্রেরই হৃদয়ে বর্ত্তমান তাহাকেই আমাদের প্রয়োজন—বাস্তবিক জগতে কোন যুগে কৃষ্ণ বলিয়া কোন নেতা বা গুরু ছিলেন কি না তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন আবশ্যকতা নাই।

কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুনকে গীতা শিক্ষা দিয়াছিলেন—মহাভারতে ইহাই কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই নরদেবতা কৃষ্ণের কেবল আধ্যাত্মিক অর্থ ধরিলেই গীতা-প্রচারিত শিক্ষার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারা যায়। কৃষ্ণ যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদেই তাঁহার নামের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখান হইতে বুঝা যায় যে কৃষ্ণ একজন ব্রহ্মবেত্তা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বাস্তবিক তিনি এবং তাঁহার জীবনের কোন ব্যাপার লোকের নিকট এত পরিচিত ছিল যে শুধু দেবকীনন্দন বলিলেই লোকে তাঁহাকেই বুঝিত। ঐ উপনিষদেই বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্রেরও উল্লেখ আছে। দুইজনেই মহাভারতের প্রধান ব্যক্তি। অতএব, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে বাস্তবিকই ঘটিয়াছিল, মহাভারতের প্রধান নায়কেরা যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং

লোকের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত এই সকল ব্যক্তির জীবন ইতিহাস অবলম্বন করিয়াই যে মহাকাব্য মহাভারত রচিত তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। খ্রীষ্টিয় শতাব্দির পূর্ব্বে ভারতবাসী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত বলিয়া জানিতে পারা যায়। খুব সম্ভব কৃষ্ণ ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন এবং তিনি যেরূপ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন গীতাকার তাহা হইতেই গীতার অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। গীতাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের যে সমন্বয় করা হইয়াছে, বোধ হয় কৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম্মই তাহার ভিত্তি। গীতার বর্ত্তমান আকার যাহাই হউক না কেন, কৃষ্ণের শিক্ষা হইতেই ইহার উৎপত্তি এবং অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্যই কৃষ্ণ তাঁহার নিকট এই ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—এ কথাটা নিছক কবি কল্পনা নাও হইতে পারে। মহাভারতে কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিও বলা হইয়াছে, অবতারও বলা হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে যখন মহাভারত লিখিত হয় (খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম হইতে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে) তখন কৃষ্ণের পূজা ও তাঁহাকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের প্রথম জীবনেরও কিঞ্চিৎ আভাস ঐ কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। পৌরাণিকেরা কৃষ্ণের সেই বাল্যজীবন লইয়া যে গভীর আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ রূপকের সৃজন করিয়াছেন তাহা ভারতবাসীর ধর্ম্ম-জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। হরিবংশেও আমরা কৃষ্ণের জীবনের বর্ণনা পাই—সেখানে অনেক কল্পিত বিস্ময়কর ঘটনার সমাবেশ আছে; বোধ হয় সেইগুলিই পৌরাণিক বর্ণনাসমূহের ভিত্তি।

কিন্তু, ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য এ সকলের মূল্য অধিক হইলেও

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ সব তর্ক বিতর্কের কোন প্রয়োজন নাই। গুরুরূপী ভগবানকে গীতা যে ভাবে আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে এবং মানবজীবনকে আধ্যাত্মিক আলোকে উদ্ভাসিত করিবার যে শক্তি তাহার আছে—শুধু সেইটি বুঝিলেই চলিবে। গীতা অবতার স্বীকার করে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—বহুবার তাঁহার জন্ম হইয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্ম মরণ না থাকিলেও তিনি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ত্রিগুণময়ী মায়াকে স্বকীয় চিদাভাস যোগে আশ্রয় করিয়া দেহীর ন্যায় আবির্ভূত হন। এই অনাস্থা মায়া তাঁহার উপাধি মাত্র, ব্যবহার কাল পর্য্যন্ত উহা তাহাতে থাকিয়া জগতের কার্য্য সম্পাদন করে। কার্য্য শেষ হইলেই মায়া তিরোহিত হইয়া যায়। এই মায়িক আবির্ভাব ও তিরোভাবের নাম তাঁহার জন্ম মরণ। কিন্তু এই অবতারত্বের উপর গীতার ঝোঁক নাই। যাহা হইতে সর্ব্বভূতের আবির্ভাব, যিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, মনুষ্যের গোপন হৃদয়বিহারী সেই অতীন্দ্রিয়, অন্তর্য্যামী ভগবানই গীতা প্রচারিত শিক্ষার কেন্দ্র। এই অন্তর্য্যামী ভগবানকে নির্দ্দেশ করিয়াই গীতার সপ্তদশ অধ্যায়, ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"অত্যুগ্র আসুরিক তপস্যাকারীরা দেহমধ্যস্থিত আমাকে কৃশীকৃত করে।" এই অন্তর্য্যামিকে লক্ষ্য করিয়াই ষোড়শ অধ্যায় অষ্টাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"আসুর পুরুষগণ নিজ ও অন্যের দেহস্থিত আত্মারূপী আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে।" দশম অধ্যায় একাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে "আমি তাহাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার তত্ত্বজ্ঞানরূপ অত্যুজ্জ্বল প্রদীপ দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকি"—এখানে সেই মানুষের অন্তঃকরণে স্থিত ভগবানেরই কথা বলা হইয়াছে। এই চিরন্তন অবতার, মনুষ্যের ভিতরের ভগবান সর্ব্বকালে মানুষের মধ্যস্থিত এই দৈবচৈতন্য বাহ্য দৃশ্যরূপে গীতায় মানবাত্মার সহিত কথা কহিয়াছেন, জীবন ও দৈবকর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব বুঝাইয়া

ছেন, সংসারের বিষম রহস্যের সম্মুখীন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মানবকে ভগবদ্বাক্য, ভগবদ্জ্ঞানের আলোক দিয়াছেন, অভয় দিয়াছেন, সান্ত্বনা দিয়াছেন। ভগবান যে গুরু, সখা ও সহায় রূপে সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন ভারতের ধর্ম্ম তাহাই পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত কোথাও মন্দিরে ভগবানের মানবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে, কোথাও অবতারের পূজা করিতেছে, কোথাও মানবগুরুর মুখ দিয়া সেই এক জগৎগুরুর কথা শুনিবার জন্য শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গুরুর অর্চ্চনা করিতেছে। এই সকল আচরণের দ্বারা চেষ্টা হইতেছে যেন আমরা সেই হৃদিস্থিত ভগবানের ডাকে সাড়া দিতে পারি, মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া সেই অরূপের রূপ দর্শন করিতে পারি, সেই ভগবদ্ শক্তি, ভগবদ্ প্রেম, ভগবদ্ জ্ঞানের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ, নররূপী কৃষ্ণ যে মহাভারত বর্ণিত বৃহৎ কর্ম্মের গুপ্ত কেন্দ্র, তিনি নায়ক না হইয়াও অন্তরালে থাকিয়া যে সমস্তই পরিচালন করিতেছেন, ইহারও নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ রহিয়াছে। ঐ বৃহৎ কর্ম্মে বহু লোক, বহু জাতি জড়িত। কেহ নিজে কোন লাভের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া একটা কার্য্যোদ্ধারে সাহায্য করিতে আসিয়াছে, কৃষ্ণ এই দলের নেতা। কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আসিয়াছে, কৃষ্ণও তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তাহাদের কৌশল ব্যর্থ করিতেছেন, তাহাদের বিনাশ সাধন করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণকে সকল অন্যায়ের প্রবর্ত্তক এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও ধর্ম্মের ধ্বংসকর্ত্তা বলিয়া মনে করিতেছে। ঐ কর্ম্মের সাফল্যই যাহাদের উদ্দেশ্য, কৃষ্ণ তাহাদের উপদেষ্টা, সহায়, সুহৃদ। ঐ কর্ম্ম যখন স্বভাবনির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে, কর্ম্মের কর্ত্তাগণ যখন শত্রুহস্তে নির্য্যাতিত হইয়া এবং নানা সঙ্কটের মধ্য দিয়া ভবিষ্যৎ জয়ের জন্য তৈয়ারী হইতেছে—

অবতার তখন অদৃশ্য, কখনও কেবল সান্ত্বনা ও সাহায্যের জন্য দেখা দিয়াছেন। কিন্তু, প্রত্যেক সন্ধিক্ষণেই তিনি হস্তক্ষেপ করিতেছেন—তাহাও এরূপ অলক্ষ্যে যে সকলেই আপনাকেই সম্পূর্ণ কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতেছে। এমন কি তাঁহার প্রিয়তম সখা ও প্রধান যন্ত্র অর্জ্জুনও নিজেকে যন্ত্র মাত্র বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই এবং শেষে তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে এতকাল তিনি তাহার সখারূপী ভগবানকে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার উপদেশ হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার শক্তি হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন, তাঁহার ভালবাসা পাইয়াছেন, এমন কি তাঁহার ভগবদ্‌প্রকৃতি না বুঝিয়াও তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন। কিন্তু, তিনিও অপরের ন্যায় অহঙ্কারের বশেই চলিয়াছেন। অজ্ঞানীকে যে ভাবে উপদেশ দেওয়া হয়, সাহায্য দেওয়া হয়, পরিচালন করা হয়, অজ্ঞানী তাহা যে ভাবে গ্রহণ করে—অর্জ্জুনের পক্ষে তাহাই হইয়াছে। যতক্ষণ না সব আসিয়া কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর করিল, এবং ভগবান সারথি রূপে (তখনও যোদ্ধা রূপে নহে) ঐ যুদ্ধের নায়কের রথে না নামিলেন—ততক্ষণ তিনি তাঁহার প্রিয়তমদের নিকটও আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন নাই।

অতএব মানুষের সহিত ভগবান কিরূপ ব্যবহার করেন—নররূপী কৃষ্ণ যেন তাহারই রূপক, প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের অহঙ্কারের ও অজ্ঞানের বশেই আমরা চলি—ভাবি বুঝি আমরাই কর্ত্তা, আমরা সকল ফলের প্রকৃত কারণ। প্রকৃতপক্ষে যাহা আমাদিগকে চালিত করে, তাহাকে আমরা একটা অস্পষ্ট, এমন কি একটা মানুষিক ও পার্থিব জ্ঞান আকাঙ্ক্ষা বা শক্তির উৎস, কোন নীতি, জ্যোতিঃ বা তেজ বলিয়া মাঝে মাঝে দেখি, না জানিয়া, না বুঝিয়া পূজাও করি। শেষে এক দিন

আসে যখন এই রহস্যের সম্মুখে আমাদিগকে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতে হয়।

ভগবান শুধু মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবনেই নাই—সংসারের দুর্জ্জেয় বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র যাহা মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে অতি অল্পটুকুই অস্পষ্টভাবে বুঝিয়া প্রতিপদে সংশয়ের সহিত অগ্রসর হয়—ভগবান সমুদয়ই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। এইরূপ এক কর্ম্ম যখন বিষম সন্ধিক্ষণে উপস্থিত তখনই গীতার শিক্ষার উৎপত্তি এবং ইহাই গীতার বিশেষত্ব। গীতা যে কর্ম্মবাদ প্রচার করিয়াছে—এইরূপ ঘটনার সমাবেশে তাহা অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। ভারতের আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থে এরূপটী দেখিতে পাওয়া যায় না। শুধু গীতাতে নহে, মহাভারতের অন্যান্য স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায় যে কৃষ্ণ কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু, শুধু গীতাতেই তিনি কর্ম্মের গূঢ় রহস্য এবং আমাদের কর্ম্মের অন্তরালে যে ভগবদ্ শক্তি রহিয়াছে তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে ও অন্যান্য স্থানেও অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাহচর্য্য অন্যান্য রূপকের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। কোথাও ইন্দ্র ও কুৎস এক রথে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গের দিকে চলিয়াছেন, কোথাও এক বৃক্ষের উপরে দুইটি পক্ষী বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও যুগলরূপী নর ও নারায়ণ জ্ঞানের জন্য এক সঙ্গে তপস্যা করিতেছেন। এই সকল স্থানে লক্ষ্য হইতেছে জ্ঞান লাভ; কিন্তু গীতার অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের লক্ষ্য জ্ঞান নহে, যে কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানে পৌছান যায়, যে কর্ম্মের ভিতরে পরম জ্ঞানী স্বয়ং ভগবান রহিয়াছেন—সেই কর্ম্মই লক্ষ্য। অর্জ্জুন এবং কৃষ্ণ জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত ধ্যানের উপযোগী কোন নির্জ্জন শান্তিময় আশ্রমে উপস্থিত হন নাই, কিন্তু যোদ্ধা ও সারথিরূপে রণক্ষেত্রে শস্ত্র-সম্পাতের মধ্যে

উপবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব, যিনি গীতার গুরু, তিনি মানুষের অন্তর্যামী ভগবানরূপে শুধু জ্ঞানের জগতেই নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন না—সমগ্র কর্ম্মজগতও তিনিই চালনা করেন। তাঁহার দ্বারা এবং তাঁহার জন্যই আমরা সকলেই জীবিত রহিয়াছি, কর্ম্ম করিতেছি, যুদ্ধ করিতেছি—সকল মানব জীবন তাঁহারই অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তিনিই সকল কর্ম্মের, সকল যজ্ঞের অজ্ঞাত প্রভু—তিনি সকল মানবেরই সুহৃদ।

তৃতীয় অধ্যায়

মানব শিষ্য

গীতার গুরু কিরূপ তাহা দেখিলাম। তিনি চিরন্তন অবতার, মানব চৈতন্যে অবতীর্ণ ভগবান, সর্ব্বভূতের হৃদিস্থিত ঈশ্বর। দৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও শক্তিসমূহের অন্তরালে থাকিয়া তিনি যেমন বিরাট বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম পরিচালন করিতেছেন তেমনই আবরণের অন্তরালে থাকিয়া তিনি আমাদের সমস্ত চিন্তা, কর্ম্ম, বাসনা পরিচালিত করিতেছেন। যখন আমরা এই অন্তরাল—এই আবরণ ঘুচাইয়া আমাদের অপ্রকৃত "আমি"র পশ্চাতে প্রকৃত "আমি"র সন্ধান পাইব, আমাদের ব্যক্তিত্ব আমাদের জীবনের প্রকৃত অধীশ্বর সেই একমাত্র সত্য পুরুষের মধ্যে সমর্পণ করিতে পারিব, আমাদের চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মনকে তাঁহার পূর্ণজ্যোতিতে ডুবাইতে পারিব, আমাদের সকল ভ্রান্ত ইচ্ছা, সকল নিষ্ফল চেষ্টাকে তাঁহার বিরাট জ্যোতির্ম্ময় অখণ্ড ইচ্ছাশক্তির ভিতর ছাড়িয়া দিতে পারিব,—যখন তাঁহার অফুরন্ত আনন্দের মধ্যে আমাদের সকল আবেগের সকল বহির্মুখী বাসনার পরিতৃপ্তি হইবে—তখনই আমাদের ঊর্দ্ধগতি লাভের সকল চেষ্টা সফল ও সমাপ্ত হইবে। তিনি জগৎগুরু। অন্য সমস্ত শ্রেষ্ঠজ্ঞানই তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিচ্ছায়া এবং আংশিক বিকাশ। তাঁহারই বাণী শুনিবার জন্য আমাদের আত্মাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

একদিকে মানবের হৃদয়বিহারী ভগবান যেমন গীতাজ্ঞানের গুরু,

অন্যদিকে তেমনই মানবপ্রধান অর্জ্জুন গীতার শিষ্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলেই তাঁহার দীক্ষা হইয়াছে। যে সকল মানব এখনও জ্ঞান লাভ করে নাই কিন্তু হৃদিস্থিত ভগবানের সাহচর্য্যে সংসারে কর্ম্ম করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং জ্ঞানলাভের যোগ্য হইয়াছে, সন্দেহ ও সংশয়ে পীড়িত হইয়া প্রকৃত পথ ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে অর্জ্জুন তাহাদের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শুধু গীতাকে নহে, সমগ্র মহাভারতকেই মানবের আভ্যন্তরিক জীবনের রূপক ভাবে ব্যাখ্যা করিবার একটা রীতি আছে। এই মতানুসারে মহাভারত ও গীতা মানবের বাহ্য জীবন ও কর্ম্ম লইয়া লিখিত নহে— আধ্যাত্মিক জীবনে আমাদিগকে রিপুগণের সহিত যে সংগ্রাম করিতে হয় এখানে তাহাই বিস্তৃত রূপকের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের ভাষা ও সাধারণ ধরণ হইতে এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইলে সকল সময়ই টানিয়া অর্থ করিতে হয় এবং গীতার সহজ সরল দার্শনিক ভাষাকে অদ্ভুত ভাবে বিকৃত করিতে হয়। বেদের ভাষা এবং কতক অংশে পুরাণের ভাষা যে রূপক তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়—সেখানে অদৃশ্য জগতের বস্তু সমূহ বাহ্য মূর্ত্তি ও ঘটনার রূপকের ভিতর দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু গীতার শিক্ষা সোজা কথায় লিখিত হইয়াছে এবং মানুষের বাস্তব জীবনে যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উঠিতে পারে তৎসমূহের সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে। এই স্পষ্ট সহজ ভাষাকে নিজেদের খেয়াল মত টানিয়া রূপক বাহির করিলে চলিবে না। তবে যে অবস্থা অবলম্বন করিয়া গীতার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে সেটি আদর্শ অবস্থা। বাস্তবিক এরূপ একটা আদর্শ অবস্থা না ধরিলে তাহার সহিত গীতার শিক্ষার সামঞ্জস্য থাকে না। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, একটি বৃহৎ যুদ্ধের, জাতির জীবনে ভগবান কর্ত্তৃক চালিত এক বৃহৎ ব্যাপারের অর্জ্জুন প্রধান কর্ম্মী।

কর্ম্মের পথে মানুষ এমন ভীষণ সঙ্কটস্থলে উপস্থিত হয় যখন বিশ্ব সমস্যা, সুখ-দুঃখ সমস্যা, পাপ-পুণ্য সমস্যা লইয়া তাহাকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। গীতার শিষ্য অর্জ্জুন এরূপ অবস্থায় পতিত মানবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যে রথে ভগবান কৃষ্ণ সারথি, অর্জ্জুন সেই রথের যোদ্ধা। মানব এবং দেবতা এক রথে চড়িয়া গন্তব্যস্থানে যাইবার নিমিত্ত মহাযুদ্ধ করিতেছে—এরূপ ছবি বেদেও চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে ইহা নিছক রূপক। আলোক ও অমরত্বের দেশ স্বর্গের অধীশ্বর ইন্দ্রই দেবতা। মানব যখন উচ্চ জীবনের পরিপন্থী মিথ্যা, অন্ধকার, সঙ্কীর্ণতা, মৃত্যু প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করে তখন মানবের সাহায্যের নিমিত্ত সেই দিব্য জ্ঞানের মূর্ত্তি ইন্দ্র নামিয়া আসেন। ইন্দ্র যেখানকার অধীশ্বর সেই পরম জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত, অমরত্বের রাজ্য স্বর্গই গন্তব্য স্থান। কুৎস মানব। কুৎস নামের অর্থ এই যে, সে সর্ব্বদা প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করিতেছে। অর্জ্জুন অর্থাৎ শ্বেত পুরুষ তাঁহার পিতা, শ্বিত্রা অর্থাৎ শ্বেত জননী তাঁহার মাতা। অর্থাৎ সে সাত্ত্বিক, পবিত্র, জ্ঞানময় আত্মা—দৈবজ্ঞানের অখণ্ড ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। যাত্রাশেষে রথ যখন গন্তব্য স্থান ইন্দ্রের রাজত্বে উপস্থিত হইল, তখন মানব কুৎস তাহার দেব সঙ্গীর এরূপ সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে যে ইন্দ্রের স্ত্রী সত্যজ্ঞানী শচী ভিন্ন আর কেহ উভয়ের মধ্যে তফাৎ বুঝিতে পারিল না। এই গল্পটা যে মানুষের আভ্যন্তরিক জীবনের রূপক তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। জ্ঞানের আলোক যত বর্দ্ধিত হয় ততই যে মানব দেবতার সাদৃশ্য লাভ করে তাহাই এখানে রূপকের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু গীতার সূচনা কর্ম্ম হইতেই, এবং অর্জ্জুন জ্ঞানের লোক নহেন, কর্ম্মের লোক। তিনি মোটেই দ্রষ্টা বা জ্ঞানপিপাসু নহেন, তিনি যোদ্ধা।

শিষ্যের চরিত্রের এই বিশেষত্ব গীতার প্রথমেই পরিস্ফুট করা হইয়াছে এবং বরাবর এই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থানে সমবেত জ্ঞাতিগণকে দেখিয়া অর্জ্জুনের যে ভাব, যে বিকারের উদয় হয়, তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে অর্জ্জুনের প্রকৃতি জ্ঞানীর নহে, কর্ম্মীর। যে সকল ভাবপ্রবণ চরিত্রবান বুদ্ধিমান মনুষ্য সংসারের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করিতে অভ্যস্ত নহে—কিন্তু, উচ্চ আদর্শ মানিয়া লইয়া সমাজে প্রচলিত বিধি নিষেধ অনুসরণ করিয়া সকল পতন অভ্যুত্থানের মধ্যে নিশ্চিন্তমনে আপন আপন কর্ত্তব্য করিয়া যায়—অর্জ্জুনের প্রকৃতি তাহাদেরই মত।—এই সকল লোকের ধ্যান ধারণা আঘাত পাইয়া যখন ওলট পালট হইয়া যায়, এতদিন তাহারা যে বিধি নিষেধ, যে আদর্শ মানিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছিল তাহাতে যখন ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন কর্ম্মজীবনের সকল অবলম্বন হারাইয়া তাহারা যেমন বিমূঢ় হইয়া পড়ে অর্জ্জুনের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল।

গীতার ভাষায় অর্জ্জুন ত্রিগুণের অধীন। সাধারণ মনুষ্যের মত এই ক্ষেত্রেই তিনি এতদিন নিশ্চিন্তভাবে বিচরণ করিয়া আসিয়াছেন। অর্জ্জুন শুধু এতদূর পবিত্র ও সাত্ত্বিক যে জীবনে তিনি উচ্চ আদর্শ, উচ্চ নীতির বশে চলিয়াছেন এবং উচ্চ ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যতদূর তদনুসারে তিনি তাঁহার পাশবিক প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত রাখিতে অভ্যাস করিয়াছেন—এবং শুধু এইখানেই তাঁহার অর্জ্জুন নামের সার্থকতা। তিনি উগ্র অসুর প্রকৃতির লোক নহেন, রিপুর বশ নহেন। শান্ত, সংযত এবং অবিচলিত ভাবে কর্ত্তব্য সাধনে তিনি অভ্যস্ত। অন্যান্য মানবের মত তাঁহারও অহং জ্ঞান আছে—তবে তাহা সাত্ত্বিক অহঙ্কার। ইহার বশে তিনি নিজের স্বার্থ বা বৃত্তি চরিতার্থতার জন্য বিশেষ ব্যগ্র

না হইয়া—অপরের মঙ্গল সাধনে তৎপর হইয়াছেন—সামাজিক এবং নৈতিক বিধি নিষেধ অনুসরণ করিয়াছেন, শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে তিনি জীবন যাপন করিয়াছেন, নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মানব-জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক যে সকল আইনকানুন বিধিবদ্ধ আছে তাহাদের সমষ্টিকেই ভারতবর্ষে ধর্ম্ম বলা হয়। মানবের ধর্ম্ম কি, বিশেষতঃ উচ্চহৃদয় আত্মজয়ী, জননায়ক, যুদ্ধবিশারদ ক্ষত্রিয় বীরের ধর্ম্ম কি—অর্জ্জুনের প্রধান চিন্তা তাহাই এবং জীবনে তিনি সেই ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এই নীতির অনুসরণ করিয়া তিনি স্থিরনিশ্চয় ছিলেন যে যাহা ঠিক যাহা সৎ তিনি এতদিন তাহাই করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু, এই নীতি আজ তাহাকে এক ভীষণ অঘটিতপূর্ব্ব নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে—যে যুদ্ধের ফলে আর্য্য সভ্যতা, আর্য্য সমাজ ধ্বংস হইবে, ভারতের ক্ষত্রিয় বংশের যাহারা গৌরব তাহারা বিনষ্ট হইবে, অর্জ্জুনকে সেই সর্ব্বনাশকর যুদ্ধের নায়ক হইতে হইয়াছে।

অর্জ্জুন যে কর্ম্মী তাহার একটি প্রধান লক্ষণ এই যে যতক্ষণ না সমস্ত ব্যাপার তাঁহার চক্ষুর গোচর হইল, ততক্ষণ তিনি কি গুরুতর কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা উপলব্ধি হইল না। তিনি যখন তাঁহার সখা ও সারথিকে উভয় সৈন্যের মধ্যে রথস্থাপন করিতে বলিলেন, তখন তাঁহার অন্য কোন গভীর মৎলব ছিল না। তিনি গর্ব্বের ভরে দেখিতে চাহিলেন যে অধর্ম্মের পক্ষে কত সহস্র লোক যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে এবং কাহাদিগকে হেলায় পরাজয় করিয়া তাহাকে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যাহারা জ্ঞানীর প্রকৃতিসম্পন্ন, চিন্তাশীল—তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই চিন্তার দ্বারা সমস্ত অবস্থা

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। কিন্তু, কর্ম্মবীর অর্জ্জুন যখন চক্ষু চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, তখনই সেই ভীষণ গৃহবিবাদের প্রকৃত মর্ম্ম প্রথম তাঁহার উপলব্ধি হইল। তিনি দেখিলেন—সে যুদ্ধক্ষেত্রে শুধু একই দেশের একই জাতির লোক সমবেত হয় নাই, একই কুলের একই পরিবারের লোকই পরস্পরকে যুদ্ধে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। সামাজিক মনুষ্যের নিকট যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, শত্রুভাবে তাহাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে। আত্মীয়, গুরুজন, বন্ধু, বাল্যসহচর—সব ভালবাসা, স্নেহ, ভক্তির সম্বন্ধ অসির আঘাতে ছিন্ন করিতে হইবে। অর্জ্জুন যে পূর্ব্বে ইহা জানিতেন না, তাহা নহে—তবে, তিনি এতটা গুরুত্ব যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহার দাবীর ন্যায্যত্ব, ন্যায়ের রক্ষা, অন্যায়ের দমন, দুষ্টের শাসকরূপে তাঁহার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, ধর্ম্মপক্ষ সমর্থনরূপ তাঁহার জীবনের নীতি—এই সকলের চিন্তায় তিনি এমনই মগ্ন ছিলেন যে এই যুদ্ধের প্রকৃত মর্ম্ম তিনি গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখেন নাই, হৃদয়ে অনুভব করেন নাই, তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থলে উপলব্ধি করেন নাই। এখন সারথিরূপী ভগবান কর্ত্তৃক সেই দৃশ্য যখন তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ধরা হইল—তখন একটা মর্ম্মান্তিক আঘাতের মত সমস্ত ব্যাপারটা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল।

সেই আঘাতের প্রথম ফল হইল অর্জ্জুনের প্রবল শারীরিক ও মানসিক বিকার। এই বিকারের ফলে যুদ্ধের উপর, যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঐহিক লাভের উপর, এমন কি জীবনেরও উপর অর্জ্জুনের বিষম বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। ভোগসুখই সাধারণ (অহঙ্কৃত) মানবের জীবনের প্রধান লক্ষ্য—অর্জ্জুন তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। ক্ষত্রিয়ের প্রিয় রাজ্য, প্রভুত্ব, জয়—অর্জ্জুন

তাহাও বর্জ্জন করিলেন। এই যুদ্ধকে ন্যায় যুদ্ধ বলা যাইতেছে, কার্য্যতঃ ইহা কি স্বার্থের জন্যই যুদ্ধ নহে? তাঁহার নিজের স্বার্থের জন্য, তাঁহার ভ্রাতাগণের, তাঁহার দলের লোকের স্বার্থের জন্য, রাজ্যভোগ, আধিপত্যের জন্যই এই যুদ্ধ নহে কি? কিন্তু এই সকল বস্তুর জন্য এত অধিক মূল্য দেওয়া চলে না। কারণ সমাজ ও জাতিকে সুরক্ষিত করিবার জন্যই এই সব বস্তুর প্রয়োজন—ইহাদের অন্য প্রয়োজনীয়তা আর কিছুই নাই—অথচ, যুদ্ধে জ্ঞাতি ও কুল ধ্বংস করিয়া তিনি সেই সমাজ ও জাতিকেই নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

তাহার পর হৃদয়বৃত্তির কান্না আরম্ভ হইল। যাহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ, জীবন বাঞ্ছনীয় সেই "স্বজন"ই যুদ্ধার্থ উপস্থিত। পৃথিবীর আধিপত্য ত দূরের কথা ত্রিলোকরাজ্যের লোভেও এই সকল আপনার লোককে বধ কবিতে কে চায়? তাহার পর বিবেক জাগিয়া উঠিয়া যোগ দিয়া বলিল—এই সমস্ত ব্যাপারটাই একটা মহাপাপ! পরস্পরকে হত্যা করা পাপ—ইহাতে ন্যায়, ধর্ম্ম কিছুই নাই। বিশেষতঃ যাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে, তাহারা সকলে স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসার পাত্র। তাহাদিগকে ছাড়িলে জীবনেই কোন সুখ থাকে না। হৃদয়ের পবিত্র বৃত্তিগুলিকে দলিত করিয়া তাহাদিগকে বধ করা কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না—ইহা অতি ঘৃণ্য, জঘন্য পাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অপর পক্ষই দোষ করিয়াছে, অত্যাচার করিয়াছে, প্রথম পাপ তাহারাই করিয়াছে—তাহাদের লোভ ও স্বার্থপরতাই এই গৃহযুদ্ধ ঘটাইয়াছে—ইহা সত্য বটে। তথাপি এরূপ অবস্থায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করাই পাপ—এরূপ করিলে তাহাদের অপেক্ষাও অধিক পাপ করা হইবে। কারণ, তাহারা লোভে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া জ্ঞাতিবধরূপ মহাপাপ উপলব্ধি করিতেছে না—কিন্তু

পাণ্ডবগণ স্পষ্ট জানিয়া বুঝিয়াই সেই মহাপাপ করিবে! কিসের জন্য? কুলের ধর্ম্ম, সমাজের ধর্ম্ম, জাতির ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য? ঠিক এই সকল ধর্ম্মই—ভ্রাতৃবিরোধের ফলে বিনষ্ট হইবে। কুল ধ্বংসোন্মুখ হইবে, দুর্নীতি ইত্যাদি দোষ কুলে প্রবেশ করিবে, কুলের পবিত্রতা নষ্ট হইবে—সনাতন জাতিধর্ম্ম সকল ও কুলধর্ম্ম সকল উৎসন্ন যাইবে। এই নৃশংস গৃহবিবাদের ফল শুধু এই হইবে যে জাতি নষ্ট হইবে, জাতিধর্ম্ম নষ্ট হইবে এবং এই মহাপাপের কর্ত্তাগণকে নরকে যাইতে হইবে। অতএব অর্জ্জুন এই ভীষণ যুদ্ধের জন্য দেবতাগণ তাঁহাকে যে গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণ দিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া রথে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"যদি অশস্ত্র ও প্রতিকারের অনুদ্যোগী আমাকে সশস্ত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রণে সংহার করেন, তাহাও ইহা অপেক্ষা আমার মঙ্গল। আমি যুদ্ধ করিব না।"

অতএব অর্জ্জুনের ভিতর যে ভাবসঙ্কট উপস্থিত তাহা তত্ত্বজিজ্ঞাসুর অনুরূপ নহে। অর্জ্জুন সংসারকে অসার বা মিথ্যা বুঝিয়া প্রকৃত সত্যের সন্ধানে তাহার মন ও বুদ্ধিকে বাহ্যজগৎ ও কর্ম্ম হইতে ফিরাইয়া আনিয়া অন্তর্মুখী করেন নাই। জগতের গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া তিনি প্রকৃত সমাধানের নিমিত্ত গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়েন নাই। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রচলিত মানদণ্ডগুলি মানিয়া লইয়া তিনি এতদিন নিশ্চিন্ত মনে কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু এইগুলি শেষকালে তাঁহাকে এমন এক সঙ্কটস্থলে আনিয়া ফেলিয়াছে, যেখানে তাহার ধ্যানধারণা ধর্ম্ম-অধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জ্ঞান ভীষণ ভাবে গোলমাল হইয়া গিয়াছে, তাহার জানা বিভিন্ন কর্ত্তব্যের মধ্যে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। "ধর্ম্ম" শব্দের ধাতুগত অর্থ—যাহা বস্তু সকলকে ধরিয়া রাখে এবং যাহাকে, যে

নীতিকে ধরিয়া মানুষ কর্ম্মের পথে, সংসারের পথে অগ্রসর হইতে পারে। অর্জ্জুনের সঙ্কট এই যে, এতদিন যে সকল ধর্ম্ম, যে সকল নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে সংসারে কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন—এখন সেগুলিতে আর কুলাইয়া উঠিতেছে না, সব যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—তাই তাহার দেহ মন চিত্ত বিবেক এক সঙ্গে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। কর্ম্মীর জীবনে ইহা অপেক্ষা বড় সঙ্কট আর কিছুই নাই। এমনই করিয়া তাহার পরাজয় হয়। অর্জ্জুনের মধ্যে এই বিদ্রোহ খুবই সহজ ও স্বাভাবিক। আত্মীয়-বধের নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করিয়া কৃপার বশে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইল, মানুষ সংসারে সচরাচর ধন, মান, প্রতিপত্তি যাহা কিছু চায় তাহারই উপর তাহার বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। যাহাতে স্নেহ ভক্তি ভালবাসা পদদলিত করিতে হইবে সেই কঠোর কর্ত্তব্য করিতে তাহার প্রাণ চাহিল না। আত্মীয় ও গুরু বধ করিয়া রুধিরাক্ত ভোগ্য-বস্তু সকল উপভোগ করা যে পাপ সেই পাপভয়ে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। যে উদ্দেশ্যের জন্য এই নৃশংস যুদ্ধ, যুদ্ধের ফলে সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে—এই ব্যর্থতার আশঙ্কায় তিনি বিচলিত হইলেন। কিন্তু অর্জ্জুন তাঁহার সর্ব্বতোমুখী আন্তরিক অবসন্নতা সংক্ষেপে তখনই প্রকাশ করিলেন, যখন তিনি বলিলেন—,

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।

—"দীনতা দোষে আমার ক্ষত্রিয় স্বভাব অভিভূত হইয়াছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।"—তিনি ধর্ম্ম কি তাহা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, তাঁহার কর্ম্মের যথার্থ মানদণ্ড কি হইবে, কোন্ নীতির অনুসরণ করিলে তিনি নিশ্চিন্ত মনে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিবেন—তাহা স্থির

করিতে পারিতেছেন না। শুধু এই জন্যই তিনি শিষ্যভাবে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। কার্য্যতঃ তিনি ইহাই প্রার্থনা করিলেন—"কর্ম্মের একটা সত্য স্পষ্ট নীতি আমাকে দাও—আমি ইহাই হারাইয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। এমন পথ দেখাও, এমন নীতি শিক্ষা দেও যেন আমি নিশ্চিন্তমনে কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে পারি।" জীবনের গূঢ় রহস্য, সংসারের গূঢ় রহস্য—এই সকলের প্রকৃত মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য অর্জ্জুন জানিতে চাহিলেন না—তিনি কেবল চাহিলেন একটা "ধর্ম্ম"।

অথচ এই যে রহস্য অর্জ্জুন জানিতে চাহেন না, ভগবান অর্জ্জুনকে ঠিক সেইটিই জানাইতে চাহেন। অন্ততঃ উচ্চজীবন লাভের জন্য যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন, তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে সেই জ্ঞানটুকু দেওয়াই ভগবানের উদ্দেশ্য। কারণ, তিনি চান যে অর্জ্জুন সকল "ধর্ম্ম" পরিত্যাগ করিয়া—সজ্ঞানে ভগবানের মধ্যে বাস করা এবং সেই জ্ঞানের বশে কাজ করা—এই একমাত্র বিরাট ও উদার নীতি গ্রহণ করুক। অতএব, প্রথমে তিনি পরীক্ষা করিয়া লইলেন যে মানুষ সচরাচর যে সকল কর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের যে সকল মানদণ্ড অনুসরণ করে, অর্জ্জুন সেইগুলি সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন কি না। তাহার পর তিনি আত্মার অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এমন সব কথা বিশদভাবে বলিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কর্ম্মের বাহ্যিক আইনকানুনের কোন কথাই বলিলেন না। তাহাকে আত্মার সমত্ব লাভ করিতে হইবে অর্থাৎ সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় তুল্যজ্ঞান করিতে হইবে, ফলকামনা পরিত্যাগ করিতে হইবে, সাধারণ পাপপুণ্য-জ্ঞানের উপরে উঠিতে হইবে, বুদ্ধি একমাত্র পরমেশ্বরে নিশ্চলা ও স্থিরা রাখিতে হইবে, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম ও জীবনযাপন করিতে হইবে। অর্জ্জুন ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি জানিতে চাহিলেন যে এরূপ

অবস্থান্তর হইলে মানুষের বাহ্যিক কর্ম্মে কি পরিবর্ত্তন হইবে, তাহার কথাবার্ত্তা, তাহার কর্ম্ম, তাহার চালচলনের উপর এরূপ পরিবর্ত্তনের কি প্রভাব হইবে? কৃষ্ণ কিন্তু কর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া কর্ম্মের পশ্চাতে আত্মার অবস্থা (Soul state) কিরূপ থাকা উচিত সেই সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলেন শুধু বিস্তার করিয়া তাহাই বলিতে লাগিলেন। শুধু বুদ্ধিকে বাসনাশূন্য সমত্বের অবস্থায় স্থিরভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেই চলিবে। অর্জ্জুন চাহিয়াছিলেন কর্ম্মের একটা নিয়ম কিন্তু কৃষ্ণের কথায় তাহাত কিছু পাইলেন না বরং তাঁহার মনে হইল কৃষ্ণ যেন কর্ম্ম নিষেধই করিতেছেন। তাই তিনি অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"যদি তোমার অভিমত এই যে কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ তবে কেন ঘোর হিংসাত্মক কর্ম্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছ? কখনও কর্ম্ম-প্রশংসা, কখনও বা জ্ঞান-প্রশংসা এইরূপ বিমিশ্র বাক্যে আমার বুদ্ধিকে যেন মোহিত করিতেছ; এই দুইটীর যেটি ভাল তাহা নিশ্চয় করিয়া বল, যাহাতে আমি শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারি।" অর্জ্জুনের এই কথায় কর্ম্মীর প্রকৃতিই প্রকাশ পাইতেছে। সংসারে কর্ম্ম করিবার অথবা প্রয়োজন মত প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার একটা নিয়ম বা ধর্ম্ম যদি শিখিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কর্ম্মীর নিকট শুধু আধ্যাত্মিক আলোচনা বা আভ্যন্তরীণ জীবনের কথার কোন মূল্য নাই। কিন্তু সংসারে থাকিতে হইবে, কর্ম্ম করিতে হইবে অথচ সংসারের উপরে উঠিতে হইবে এরূপ বাক্য বিমিশ্র এবং এরূপ গোলমেলে কথা শুনিবার ও বুঝিবার মত ধৈর্য্য তাহার নাই।

অর্জ্জুনের বাকী যত প্রশ্ন সব তাঁহার এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তাঁহার কর্ম্মীর স্বভাব হইতেই উঠিয়াছে। যখন তাঁহাকে বলা হইল যে আত্মার সমত্ব হইলে কর্ম্মের বাহ্যতঃ কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় না—সকল

সময় নিজ প্রকৃতি অনুসারেই তাঁহার কর্ম্ম করা একান্ত কর্ত্তব্য, পরের ধর্ম্মের তুলনায় নিজের ধর্ম্ম সদোষ হইলেও আপন ধর্ম্ম অনুসারে কর্ম্ম করাই উত্তম—এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন বিচলিত হইয়া উঠিলেন। প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে? কিন্তু, তাহা হইলে এই যুদ্ধ করিতে তাঁহার মনে যে পাপের আশঙ্কা হইতেছে, তাহার কি? মানুষের এই প্রকৃতিই কি তাহাকে যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জোর করিয়া পাপাচরণ করায় না? কৃষ্ণ যখন বলিলেন যে তিনিই পুরাকালে বিবস্বানকে এই যোগ বলিয়াছিলেন তাহা কালে নষ্ট হয়, সেই জ্ঞান তিনি এখন অর্জ্জুনকে কহিতেছেন—এই কথা বুঝা অর্জ্জুনের ব্যবহারিক বুদ্ধিতে কুলাইল না। এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া অর্জ্জুন ভগবানের অবতারত্ব সম্বন্ধে সেই "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য" ইত্যাদি সুপরিচিত বাক্যটি বাহির করিলেন। কৃষ্ণ যখন কর্ম্মযোগ ও কর্ম্ম-সন্ন্যাসের সামঞ্জস্য করিতে লাগিলেন অর্জ্জুন তখনও আবার "গোলমেলে" কথা বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, নিশ্চয় করিয়া সেই একটি উপদেশ দাও।" অর্জ্জুনকে যে যোগ অবলম্বন করিতে বলা হইতেছে তাহার প্রকৃত স্বরূপ যখন তিনি উপলব্ধি করিলেন—মানসিক সঙ্কল্প, অনুরাগ ও বাসনার বশে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত কর্ম্মী-প্রকৃতি অর্জ্জুন সেই আধ্যাত্মিক সাধনার গুরুত্বে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—যে ব্যক্তি যোগে প্রবৃত্ত হইয়া পরে মন্দবৈরাগ্য বশতঃ অকৃতকার্য্য হয় তাহার কি গতি হয়?

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ় ব্রহ্মণঃ পথি ॥৬।৩৮

—সে এই সংসারের কর্ম্মের, চিন্তার, প্রেমের জীবন হারায়, দেব-

জীবনও লাভ করিতে পারে না, সুতরাং উভয় বিভ্রষ্ট হইয়া সেই ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হয় না কি ?

যখন অর্জ্জুনের সন্দেহ দূর হইল, তিনি জানিলেন যে ভগবানকেই তাঁহার ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—তখন তিনি স্পষ্ট জানিতে চাহিলেন যে, সকল কার্য্যের মূল, সকল কর্ম্মের মানদণ্ড এই ভগবানকে তিনি কার্য্যতঃ জানিবেন, বুঝিবেন কেমন করিয়া ? সংসারে সাধারণতঃ যে সকল পদার্থ দেখা যায় তাহাদের মধ্যে কোথায় ভগবানের অভিব্যক্তি তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে ? ভগবান যে দিব্য বিভূতি দ্বারা এই লোক সকল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই দিব্য বিভূতি সকল কি এবং সর্ব্বদা কিরূপ বিভূতিভেদ দ্বারা চিন্তা করিলে ভগবানকে জানিতে পারা যাইবে ? যিনি মানবোচিত শরীর ও মনের আড়ালে থাকিয়া অর্জ্জুনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন তাঁহার ঐশ্বরিক বিশ্বরূপ কি অর্জ্জুন এখনই একবার দেখিতে পান না ? অর্জ্জুনের শেষ প্রশ্নগুলিও কর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিয়া জানিবার উদ্দেশ্যেই জিজ্ঞাসিত। কর্ম্মত্যাগ করিতে না বলিয়া অর্জ্জুনকে কর্ম্মে আসক্তি এবং কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে—এই কর্ম্মসন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত প্রভেদটা অর্জ্জুন স্পষ্ট ভাবে জানিতে চাহিলেন। বাসনারহিত হইয়া ভগবদেচ্ছার প্রেরণার বশে কর্ম্ম করিতে হইলে—পুরুষ ও প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ইহাদের প্রকৃত প্রভেদটা জানা একান্ত আবশ্যক, তাই অর্জ্জুন এইগুলির সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিলেন। অর্জ্জুনকে যে ত্রিগুণের অতীত হইতে হইবে, সেই তিন গুণের ক্রিয়া কিরূপ তিনি সর্ব্বশেষে তাহাও বিশদভাবে জানিতে চাহিলেন।

এইরূপ একজন শিষ্যকে গীতায় গুরু ঐশ্বরিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন। অহংভাবের বশে কাজ করিতে করিতে শিষ্য যখন তাঁহার চরিত্র

বিকাশের এমন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন যখন সাধারণ সামাজিক মানবের অবলম্বন নীতি সমূহ সহসা দেউলিয়া হইয়া পড়ায় তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন এবং যখন এই নিম্নস্তরের অবস্থা হইতে তাহাকে উচ্চজ্ঞান, উচ্চজীবনের মধ্যে টানিয়া তুলিতে হইবে—ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে গুরু শিষ্যকে ধরিয়াছেন। সেই সঙ্গে শিষ্য স্বয়ং যাহা চাহিয়াছেন তাহাও দিতে হইবে অর্থাৎ এমন একটা কর্ম্মের নিয়ম দিতে হইবে, যাহা সাধারণ বিধিনিষেধের মত ভ্রমপ্রমাদ বিরোধপূর্ণ হইবে না—সে নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে আত্মা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে অথচ ঐশ্বরীয় জীবনের বিপুল স্বাধীনতার মধ্যে কর্ম্ম করিতে, জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কারণ, কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, জগতের যুগ পরিবর্ত্তন সুসম্পন্ন করিতে হইবে, মানবাত্মা যে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে আসিয়াছে অজ্ঞানের বশে তাহা না করিয়া যাহাতে পশ্চাৎপদ না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র গীতার শিক্ষা ঘুরিয়া ফিরিয়া এই তিনটি উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

গীতার মূলশিক্ষা

গীতার গুরু এবং শিষ্যের পরিচয় পাইলাম—এক্ষণে গীতাশিক্ষার মূল কথাটা স্পষ্টভাবে বুঝা প্রয়োজন। গীতার শিক্ষা নানা তথ্যপূর্ণ ও বহুমুখী। গীতায় আধ্যাত্মিক জীবনের নানা ভাবের সমন্বয় করা হইয়াছে। সেইজন্য বিশেষ বিশেষ মতাবলম্বীদের একদেশদর্শিতার ফলে গীতার অর্থ অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থাপেক্ষাও সহজে বিকৃত করিয়া কোন বিশেষ দার্শনিক মত বা দলের পোষণ করা যাইতে পারে। অতএব গীতার মূল শিক্ষা কি, প্রধান কথা কি, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা আবশ্যক। আমরা যে মত, নীতি বা ধারণার পক্ষপাতী তাহা অলক্ষ্যে আমাদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে সর্ব্বত্রই আমরা সেই মত বা নীতির পরিপোষক অর্থের সন্ধান করি ; ফলে অনেক সময়েই অনেক বিষয়ের আমরা প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি না। মানুষের বুদ্ধি বস্তুর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতে চায় না—ফলে সত্যটি হারাইয়া ফেলে। বিশেষ সাবধানী ব্যক্তিও এরূপ ভুল এড়াইতে পারেন না—কারণ, মানুষের বুদ্ধি সকল সময়েই নিজের এ সব ভুল ধরিতে সতর্ক থাকিতে পারে না। গীতাপাঠে এরূপ ভুল সহজেই হয়। কারণ গীতার কোন অংশের উপর, গীতাশিক্ষার কোন বিশেষ দিকে, এমন কি গীতার কোন বিশিষ্ট শ্লোকের উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়া এবং বাকী অষ্টাদশ অধ্যায়

অগ্রাহ্য করিয়া আমরা সহজেই নিজেদের মত—নিজেদের দার্শনিক বা নৈতিক বাদের পোষণ করিতে পারি।

এইরূপে কেহ কেহ বলেন যে গীতা মোটেই কর্ম্মশিক্ষা দেয় না—সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইলে কিরূপ সাধনার আবশ্যক গীতা শুধু তাহাই শিক্ষা দিয়াছে। শাস্ত্রবিহিত অথবা যে কোন কার্য্য হাতের নিকট উপস্থিত হয় যেমন তেমন ভাবে সম্পাদন করাই উপায়,—সাধনা। শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম ও সংসার পরিত্যাগ করাই একমাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য। গীতার এখান সেখান হইতে শ্লোক তুলিয়া সহজেই এই মতের সমর্থন করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ গীতা সন্ন্যাসের যে অভিনব অর্থ দিয়াছে তাহা যদি আমরা লক্ষ্য না করি তাহা হইলে এরূপ মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে গীতা পাঠ করিলে এরূপ মত সমর্থন করা সম্ভব নহে। কারণ গীতায় শেষ পর্য্যন্ত বার বার বলা হইয়াছে যে কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল, সমতার দ্বারা বাসনার ত্যাগ এবং সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করাই শ্রেষ্ঠ।

আবার কেহ কেহ বলেন যে ভক্তিতত্ত্বই গীতার সার কথা। গীতার মধ্যে অদ্বৈতবাদ এবং একব্রহ্মে শান্তিময় অবস্থানের যে সকল কথা আছে সেগুলি তাঁহারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন না। এ কথা সত্য বটে যে গীতাতে ভক্তির উপর খুবই জোর দেওয়া হইয়াছে। ক্ষর এবং অক্ষর হইতে পৃথক উত্তম পুরুষ—যিনি পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতিতে খ্যাত আছেন, তিনি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি, তিনি লোকত্রয় পালন করিতেছেন—এই সকল (ভক্তিমূলক) কথা গীতার অত্যাবশ্যকীয় অংশ স্বীকার করি। তথাপি গীতার মতে এই ঈশ্বর শুধু ভক্তির বস্তু নহেন—এই ঈশ্বরে সকল জ্ঞানেরও পরিসমাপ্তি, তিনি সকল যজ্ঞেরও অধীশ্বর এবং

সকল কর্ম্মেরও লক্ষ্য। গীতা যেখানে যেমন প্রয়োজন কোথাও কর্ম্মের উপর, কোথাও জ্ঞানের উপর, কোথাও ভক্তির উপর জোর দিয়া তিনের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য করিয়াছে—কোনটিকে অপর দুইটি হইতে পৃথক করিয়া উচ্চস্থান দেয় নাই। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি তিনে মিলিয়া যেখানে এক হইয়াছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম। কিন্তু যখন হইতে লোকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী মন লইয়া গীতার আদর, গীতার অর্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছে —তখন হইতেই গীতাকে কর্ম্মযোগের গ্রন্থ বলিয়া ধরাই রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গীতায় যে বার বার কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া লোকে গীতার জ্ঞান ও ভক্তির কথা উপেক্ষা করিতেছে এবং গীতাকে শুধু কর্ম্মবাদ, শুধু কর্ম্মের পথ দেখাইবার আলোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। গীতা যে কর্ম্মবাদের গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই তবে সে কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইতেছে জ্ঞানে—ভগবানে ভক্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই সে কর্ম্মের মূল। নিজের বা অপরের স্বার্থের জন্য যে কর্ম্ম—সংসারের, সমাজের, মানবজাতির মঙ্গলের জন্য যে কর্ম্ম, যে নীতি, যে আদর্শ বর্ত্তমান যুগে প্রশংসিত, গীতার কর্ম্ম বা আদর্শ তাহা হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। অথচ, গীতার আধুনিক ব্যাখ্যাকারেরা দেখাইতে চান যে গীতায় কর্ম্মের আধুনিক আদর্শই ধরা হইয়াছে। বিশিষ্ট পণ্ডিতগণও কেবলই বলিয়া থাকেন যে ভারতের দর্শনশাস্ত্রে, ধর্ম্মশাস্ত্রে সংসার ত্যাগ এবং সন্ন্যাসীর কঠোর জীবনের দিকে যে ঝোঁক আছে গীতা তাহারই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে এবং নিঃস্বার্থভাবে সামাজিক কর্ত্তব্য সমূহ সম্পাদন করা, এমন কি আধুনিক আদর্শানুযায়ী সমাজসেবা ও পরোপকার করাই শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু গীতার শিক্ষা যে মোটেই এরূপ নহে, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে।

আধুনিক মনোভাব লইয়া প্রাচীন গ্রন্থ গীতার আলোচনা করায় এইরূপ ভুল ব্যাখ্যা সম্ভব হইয়াছে। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বুদ্ধি গীতার সম্পূর্ণভাবে প্রাচ্য, ভারতীয় শিক্ষাকে বিকৃতভাবেই বুঝিয়াছে। গীতা যে কর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছে তাহা মানবীয় নহে, তাহা ঐশ্বরিক। সামাজিক কর্ত্তব্য সম্পাদন গীতার শিক্ষা নহে। কর্ম্মের, কর্ত্তব্যের অন্য সকল বিধিনিষেধ পরিত্যাগ করিয়া অহংভাবশূন্য হইয়া যন্ত্রস্বরূপ ভগবদেচ্ছা সম্পাদনই গীতার শিক্ষা। ঈশ্বরাশ্রিত, শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ অহংভাবশূন্য হইয়া জগতের হিতের জন্য এবং মানব ও জগতের অন্তরালে অবস্থিত ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞস্বরূপ যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন সেই কর্ম্মই গীতার আদর্শ।

এই কথাই অন্যভাবে বলা যায় যে গীতা ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র নহে—গীতা আধ্যাত্মিক জীবনের গ্রন্থ। ইউরোপীয় মনোভাবই আধুনিক মনোভাব। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার, দার্শনিক চিন্তার প্রভাবেই ইউরোপীয় মনোভাব প্রথম তৈয়ারী হয়। তাহার পর মধ্যযুগে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভক্তিপ্রবণতার প্রভাবে ইউরোপীয় মন পুষ্ট হয়। বর্ত্তমানে ইউরোপ এই দুয়েরই প্রভাব অতিক্রম করিয়াছে, ইহাদের পরিবর্ত্তে সমাজসেবা, দেশসেবা, মানবজাতির সেবাই ইউরোপে আদর্শ হইয়াছে। ইউরোপ ভগবানকে ছাড়িয়াছে—বড় জোর একবার কেবল রবিবারে ভগবানের খোঁজ পড়ে। ভগবানের পরিবর্ত্তে মানুষ হইয়াছে তাহাদের উপাস্য, মানব সমাজ হইয়াছে দৃশ্য বিগ্রহ। আধুনিক ইউরোপে নীতিপরায়ণতা, কার্য্যকুশলতা, পরোপকার, সমাজসেবা, মানবজাতির কল্যাণসাধন ইত্যাদিই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই সকলও যে ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে ইহাদের খুবই প্রয়োজন আছে—এইগুলি ভগবদিচ্ছারই বিকাশ নতুবা মানব সমাজে এখন ইহাদের প্রতিপত্তি কেন

হইবে? যিনি ঈশ্বরীয় মানব, দেবজীবন লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে বাস করিতেছেন—তিনিও যে কার্য্যতঃ এই সকল আদর্শই গ্রহণ করিবেন না তাহারও কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ ইহাই যদি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, যুগধর্ম্ম হয় এবং যতদিন কোন উচ্চতর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে না হয়—ততদিন এই আদর্শ তাঁহারও অবলম্বনীয়। কারণ, তিনি হইতেছেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—অপরে কিরূপ আচরণ করিবে, তিনি নিজে আচরণ করিয়া তাহা দেখাইয়া দিবেন। বাস্তবিক যে সকল আদর্শ সেই যুগের পক্ষে শ্রেষ্ঠ এবং তৎকালীন সভ্যতার উপযোগী অর্জ্জুনকে তদনুসারেই জীবন যাপন করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু, সাধারণ মানব যেমন কিছু না জানিয়া না বুঝিয়া একটা বাহ্য বিধিনিষেধ মানিয়া কার্য্য করে, সেরূপ ভাবে না করিয়া জ্ঞানের সহিত, ভিতরে যে সত্য রহিয়াছে তাহা সম্যক জানিয়াই অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে।

কিন্তু, প্রকৃত কথাটা হইতেছে এই যে বর্ত্তমান যুগে মানুষ ভগবান এবং আধ্যাত্মিকতাকে আর তাহার কর্ম্মের নিয়ামক করে না—তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে এ সকল ধারণার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করে না। অথচ ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক অবস্থা বা আধ্যাত্মিকতা—এই দুইটিই গীতার সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ব। বর্ত্তমান যুগের মানুষ মনুষ্যত্বের উপরে উঠিতে চায় না; কিন্তু গীতা চায় যে আমরা ভগবানের মধ্যেই বাস করি—জগতেরই কল্যাণ করিতে হউক, তথাপি ভগবানের মধ্যে থাকিয়াই তাহা করিতে হইবে। আধুনিক মানুষ প্রাণ, চিত্ত, মন, বুদ্ধি লইয়াই থাকিতে চায়—গীতা ইহাদের উপরে উঠিয়া আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিতে বলে। যে ক্ষর পুরুষ সর্ব্বভূত—ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি—আজকাল মানুষ তাহাতেই সীমাবদ্ধ থাকিতে চায়। গীতা বলে ইহা ছাড়া মানুষকে

অক্ষর এবং উত্তম পুরুষের মধ্যেও বাস করিতে হইবে। অথবা যদিও লোকে এই সকল তত্ত্ব এখন অস্পষ্টভাবে একটুকু আধটুকু বুঝিতে আরম্ভ করিতেছে, তথাপি ইহাদের প্রকৃত মূল্য তাহারা উপলব্ধি করে না। মানুষ ও সমাজের কাজে লাগিতে পারে এইরূপ ভাবেই এই সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা হয়। কিন্তু, ঈশ্বর ও আধ্যাত্মিকতার মূল্য শুধু মানুষ ও সমাজের জন্যই নহে—এই সকল তত্ত্বের নিজস্ব মূল্য আছে। আমাদের মধ্যে উচ্চ নীচ দুইই রহিয়াছে; কার্য্যতঃ নীচকে উচ্চের জন্য রাখিতে হইবে—তবেই উচ্চও নীচকে টানিয়া উচ্চে তুলিয়া লইবে।

অতএব আধুনিক মনোভাবের বশে গীতার ব্যাখ্যা করিয়া গীতা নিঃস্বার্থভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদনকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়াছে জোর করিয়া এরূপ বুঝাইলে ভুলই করা হইবে। যে অবস্থা অবলম্বন করিয়া গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে—তাহা একটু অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে এরূপ অর্থ ঠিক হইতে পারে না। কারণ, বিভিন্ন কর্ত্তব্যের মধ্যে ঘোর বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সাধারণ বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞানের দ্বারা যখন কর্ত্তব্য নির্ণীত হওয়া অসম্ভব বোধ হইয়াছিল সেই অবস্থা হইতেই গীতাশিক্ষার উৎপত্তি এবং সেই জন্যই অর্জ্জুন শিষ্যরূপে কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানবজীবনের কিছু বিরোধ অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকে—যেমন, সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য এবং দেশের প্রতি কর্ত্তব্য এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটিতে পারে, অথবা দেশের প্রতি কর্ত্তব্য এবং সমগ্র মানব জাতির প্রতি কর্ত্তব্য বা অন্য কোন উচ্চ ধর্ম্ম বা নীতি সম্বন্ধীয় আদর্শের মধ্যে বিরোধ ঘটিতে পারে। প্রাণের ভিতর ভগবানের ডাক এরূপভাবে আসিতে পারে যে সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া, পদদলিত করিয়াই

বাহির হইয়া পড়িতে হয়। বুদ্ধের এই অবস্থা হইয়াছিল। আমরা ধারণাই করিতে পারি না যে গীতা এই অবস্থায় বুদ্ধকে গৃহে যাইয়া তাহার স্ত্রী ও পিতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে এবং শাক্যরাজ্য শাসন করিতে বলিয়া বুদ্ধের আন্তরিক সমস্যার মীমাংসা করিত। গীতার মতে কখনই এরূপ মীমাংসা হইতে পারে না যে রামকৃষ্ণের মত লোককে কোন পাঠশালার পণ্ডিত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে ছোট ছোট ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইতে হইবে অথবা বিবেকানন্দর মত লোককে সংসারে বদ্ধ থাকিয়া পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিতে হইবে এবং তজ্জন্য তাহার অতুল প্রতিভা লইয়া নির্ব্বিকার ভাবে আইন, ডাক্তারি বা সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইবে। নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ত্তব্যের পালন গীতার শিক্ষা নহে। দেবজীবন অনুসরণ করা, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করা, কেবলমাত্র পরাৎপরের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা—ইহাই গীতার শিক্ষা। বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের মত লোকের ঐশ্বরীয় জীবন ও কর্ম্মের সহিত গীতার এই শিক্ষার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। এমন কি, যদিও গীতা কর্ম্মহীনতা অপেক্ষা কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে—তথাপি গীতা কর্ম্ম পরিত্যাগকে একেবারে অকরণীয় বলে নাই। বরং কর্ম্ম পরিত্যাগ যে ভাগবৎ জীবন লাভের একটা পথ তাহা স্বীকার করিয়াছে। যদি সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে ভগবানকে পাওয়া সম্ভব না হয় এবং তাহা পরিত্যাগ করিতে ভিতরে যদি তীব্র ডাক আসে—তখন আর উপায় কি? সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে। ভগবানের ডাক সকলের উপরে—অন্য কোনরূপ যুক্তি তর্কের দ্বারা সে ডাক অবহেলা করা চলে না।

কিন্তু, অর্জ্জুনের যে অবস্থা তাহাতে আর একটা বিষম বাধা এই যে

অর্জ্জুনকে ভগবান যে কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন—সেই কর্ম্মটাকে একটা মহাপাপ বলিয়াই অর্জ্জুনের ধারণা হইয়াছে। যুদ্ধ করা তাহার কর্ত্তব্য বলিতেছেন? কিন্তু, সেই কর্ত্তব্যটা এখন তাঁহার মনে একটা মহাপাপ বলিয়াই ধারণা হইয়াছে। এখন তাঁহাকে এই কর্ত্তব্য নিঃস্বার্থভাবে নির্ব্বিকারচিত্তে করিতে বলিলে কি লাভ? তাঁহার সন্দেহের কি মীমাংসা হইবে? তিনি জানিতে চাহিবেন তাঁহার কর্ত্তব্য কি? ভীষণ রক্তপাতের দ্বারা আত্মীয় স্বজন, কুল ও দেশকে ধ্বংস করা কেমন করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য হইতে পারে? তাঁহাকে বলা হইল যে তাঁহার পক্ষই ন্যায় পক্ষ, কিন্তু এ কথা অর্জ্জুনকে সন্তুষ্ট করিল না, করিতে পারে না। কারণ তাঁহার যুক্তিই এই যে তাঁহার পক্ষ ন্যায়ের পক্ষ হইলেও—নিষ্ঠুর হত্যা-কাণ্ডের দ্বারা জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া সেই ন্যায্য দাবী সমর্থন করা কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। তাহা হইলে অর্জ্জুন এখন আর কি করিবেন? তাঁহার কর্ম্মের ফলাফল কি হইবে, পাপ হইবে কি পুণ্য হইবে সে সব সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা না করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে শুধু সৈনিকের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে? এরূপ শিক্ষা কোন রাজতন্ত্রের শিক্ষা হইতে পারে—উকীল, রাজনৈতিক, তার্কিকেরা এইরূপ শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু দার্শনিকতাপূর্ণ যে মহৎ ধর্ম্মগ্রন্থ সংসার ও কর্ম্মের সমস্যার আমূল সমাধান করিতে প্রবৃত্ত, সে গ্রন্থের যোগ্য শিক্ষা এরূপ হইতেই পারে না। বাস্তবিক একটি তীব্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যা সম্বন্ধে ইহাই যদি গীতার বক্তব্য হয় তাহা হইলে গীতাকে জগতের ধর্ম্মগ্রন্থের তালিকা হইতে তুলিয়া দিয়া—রাজনীতি, কূটনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তকালয়ের তালিকা ভুক্ত করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

এ কথা সত্য যে উপনিষদের ন্যায় গীতাও পাপ পুণ্যের উপর উঠিয়া

শুভাশুভের উপর উঠিয়া, সমতালাভ করিতে শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু, সে সমতা ব্রহ্মজ্ঞানেরই অংশ—যাঁহারা সাধন পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষেই এরূপ সমতা লাভ সম্ভব। সাধারণ মানব-জীবনে শুভাশুভ পাপপুণ্যের প্রতি উদাসীনতা গীতার শিক্ষা নহে—কারণ সাধারণ মানব পাপপুণ্য শুভাশুভের বিচার করিয়া কার্য্য না করিলে নিরতিশয় অনর্থই হইবে। বরং গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে যাহারা মন্দকারী পাপী তাহারা ভগবানকে পাইবে না। অতএব অর্জ্জুন যদি সাধারণ মানব জীবনের ধর্ম্মই ভালরূপে পালন করিতে চান তাহা হইলে যেটাকে তিনি পাপ, নরকের পথ বলিয়া উপলব্ধি করিতেছেন সেটা সৈনিক হিসাবে তাঁহার কর্ত্তব্য হইলেও তাঁহার পক্ষে নিঃস্বার্থ ভাবেও সে কর্ত্তব্য পালন করা চলে না। তাঁহার অন্তরাত্মা, তাঁহার বিবেক যেটাকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করিতেছে—সহস্র কর্ত্তব্য চুরমার হইয়া যাইলেও সেটা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতেই হইবে।

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে কর্ত্তব্যের (duty) * ধারণা বস্তুতঃ সামাজিক সম্বন্ধেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। "কর্ত্তব্য" কথাটার প্রকৃত অর্থ ছাড়িয়া দিয়া ব্যাপকভাবে আমরা "নিজেদের প্রতি কর্ত্তব্যের" কথা বলিতে পারি—বলিতে পারি যে গৃহত্যাগ করাই বুদ্ধের কর্ত্তব্য ছিল অথবা গুহার ভিতর নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাই তপস্বীর কর্ত্তব্য। কিন্তু, স্পষ্টতঃ ইহা শুধু শব্দের অর্থ লইয়া খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কর্ত্তব্য (duty) সম্বন্ধবাচক শব্দ—অন্যের সহিত আমার যাহা সামাজিক সম্বন্ধ

* এখানে ইংরাজী duty "কর্ত্তব্য" বলিয়াই অনুবাদ করা হইয়াছে—কারণ ইহাই প্রচলিত প্রথা। কিন্তু "কর্ত্তব্য" শব্দের প্রকৃত অর্থ "যাহা করিতে হইবে"—ইহা duty না হইতেও পারে। কাহারও প্রতি আমার যাহা সামাজিক সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধের জন্য তাহার প্রতি আমাকে যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহার প্রতি শুধু সেইটিই আমার duty.

শুধু তাহার দ্বারাই তাঁহার প্রতি আমার কর্ত্তব্য নির্ণীত হয়। পিতা হিসাবে পিতার কর্ত্তব্য সন্তানকে লালনপালন করা, শিক্ষা দেওয়া। মক্কেল দোষী জানিলেও উকীলের কর্ত্তব্য তাহার পক্ষসমর্থন করা, তাহাকে খালাস করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। সৈনিকের কর্ত্তব্য হুকুমমত গুলি চালান—এমন কি তাহার স্বদেশবাসী তাহার আত্মীয় স্বজনকেও হত্যা করা। বিচারকের কর্ত্তব্য দোষীকে জেলে দেওয়া, হত্যাকারীকে ফাঁসী দেওয়া। যতক্ষণ লোক এই সকল পদে থাকিতে স্বীকৃত ততক্ষণ তাহাদের কর্ত্তব্য অতি স্পষ্ট—ততক্ষণ ধর্ম্ম বা নীতির আর কোন কথাই উঠে না। কিন্তু, যদি ভিতরের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়, উকীলের যদি ধর্ম্মজ্ঞান জাগিয়া উঠিয়া ধারণা হয় যে, যে কোন অবস্থাতেই হউক মিথ্যার সমর্থন করা ঘোরতর পাপ, বিচারকের যদি বিশ্বাস হয় যে মানুষের প্রাণদণ্ড দেওয়া পাপ, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সৈনিক যদি টলষ্টয়ের মত উপলব্ধি করে যে সকল অবস্থাতেই যেমন নরমাংস ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ তেমনই মানুষকে বধ করাও নিষিদ্ধ—তখন তাহারা কি করিবে? এরূপ অবস্থায় কর্ত্তব্যের অবহেলা করিয়াও যে পাপ হইতে নিজকে বাঁচাইতে হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। এরূপ অবস্থায় পাপপুণ্যের বোধ কোন সামাজিক সম্বন্ধ বা কর্ত্তব্যের কোন ধারণার উপর নির্ভর করে না—মানুষের ভিতরে ধর্ম্মজ্ঞান জাগিয়া উঠিলে সে বোধ আপনা হইতেই আইসে।

বাস্তবিক পক্ষে জগতে কর্ম্মের দুইটি বিভিন্ন নিয়ম আছে—এবং স্তর ভেদে দুইটাই ঠিক। একটি নিয়ম প্রধানতঃ আমাদের বাহ্যিক সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত; আর একটি নিয়ম বাহ্যিক সম্বন্ধের কোন ধার ধারে না—তাহা সম্পূর্ণভাবে বিবেক ও ধর্ম্মজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। গীতা আমাদিগকে এমন শিক্ষা দেয় না যে উচ্চস্তরকে

নিম্নস্তরের অধীন করিয়া রাখিতে হইবে। যখন মানুষের ভিতর ধর্ম্মজ্ঞান জাগিয়া উঠে তখন সামাজিক কর্ত্তব্যের সম্মুখে সেই ধর্ম্মজ্ঞান, পাপপুণ্য-বোধকে বলি দিতে হইবে গীতা এমন কথা কখনই বলে না। সাংসারিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞান এই দুইয়ের বিরোধ ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে হইবে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, ইহাই গীতার উপদেশ। গীতা সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যের পরিবর্ত্তে ভগবানের প্রতি দায়িত্ব শিক্ষা দিয়াছে। কর্ম্মের জন্য কোন বাহ্যিক আইন কানুনের বশবর্ত্তী না হইয়া অন্তরের মধ্যে ভগবদ্‌ প্রেরণার বশে কর্ম্মই গীতার উপদেশ—আমরা পরে দেখিব যে এই ব্রহ্মজ্ঞান, কর্ম্মবন্ধন হইতে আত্মার মুক্তি এবং আমাদের অন্তরস্থিত এবং ঊর্দ্ধস্থিত ভগবানের প্রেরণায় কর্ম্ম—ইহাই গীতাশিক্ষার সার কথা।

গীতার ন্যায় মহৎগ্রন্থ খণ্ডভাবে লইলে বুঝা যায় না—গীতায় কেমন করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহার শিক্ষার ক্রমবিকাশ হইয়াছে তাহা সমগ্রভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। প্রসিদ্ধ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র গীতাকে কর্ত্তব্য পালনের শাস্ত্র (Gospel of Duty) বলিয়া প্রথম এই নূতন ব্যাখ্যা করেন। বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁহারা গীতাকে কর্ত্তব্য পালনের গ্রন্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন গীতার সেই আধুনিক ব্যাখ্যা-কারেরা গীতার প্রথম তিন চারিটী অধ্যায়ের উপরই সব ঝোঁকটুকু দিয়াছেন। আবার এই সকল অধ্যায়ে যেখানে ফলাফলের দিকে না তাকাইয়া কর্ত্তব্য পালনের কথা আছে সেইখানটিকেই গীতাশিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া ধরিয়াছেন। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—"তোমার কর্ম্মেই অধিকার কর্ম্মফলে যেন কদাচ তোমার অধিকার না হয়"—এই কথাটিই আজকাল গীতার মহাবাক্য বলিয়া সুপ্রচলিত। শুধু বিশ্বরূপ দর্শন ছাড়া গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বাকী

অধ্যায়গুলির বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তাই তাঁহারা উপলব্ধি করেন না। তবে এরূপ ব্যাখ্যা খুবই স্বাভাবিক। কারণ আধুনিক যুগে মানুষ দার্শনিক তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার লইয়া মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিতে চায় না। তাহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেই ব্যগ্র এবং অর্জ্জুনের মতই এমন একটা কাজ চলা নিয়ম বা ধর্ম্ম চায় যাহাতে তাহাদের কাজ করিবার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু গীতার ব্যাখ্যা এরূপ ভাবে করিলে উল্টা বুঝা হইবে।

গীতা যে সমতার শিক্ষা দেয় তাহা নিঃস্বার্থপরতা নহে। গীতা-শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিবার পর, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মহা আদেশ দিলেন—"উঠ, শত্রুগণকে বিনাশ কর, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন রাজ্য ভোগ কর।" এই আদেশে খাঁটি নিঃস্বার্থ পরোপকার বা নির্ব্বিকার বৈরাগ্যের প্রশংসা নাই। ইহা অভ্যন্তরীণ সাম্য ও উদারতার অবস্থা, ইহাই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ভিত্তি। "যে কর্ম্ম করিতে হইবে"—এইরূপ স্বাধীনতা ও সমতার সহিতই করিতে হইবে। কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম—"যে কর্ম্ম করিতে হইবে" এই বাক্যের দ্বারা গীতায় শুধু সামাজিক বা নৈতিক কর্ম্ম বুঝায় না—গীতাতে ইহা অতিবিস্তৃত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহার মধ্যে সর্ব্ব কর্ম্মানি—মানুষ যাহা কিছু করে সবই পড়িবে। কোন কর্ম্ম করিতে হইবে—তাহা ব্যক্তিগত মতামতের দ্বারা নির্দ্ধারণ করা চলিবে না। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—"কর্ম্মেই তোমার অধিকার ফলে যেন কদাচ তোমার অধিকার না হয়"—ইহাও গীতার মহাবাক্য নহে। যাহারা যোগমার্গে আরোহণ করিতে উদ্যত সেই সকল শিষ্যের ইহা কেবল প্রথমাবস্থার উপযোগী শিক্ষা। পরবর্ত্তী অবস্থায় এই শিক্ষা একরকম পরিত্যাগই করিতে হয়। কারণ পরে গীতা খুব জোরের সহিত বলিয়াছে যে মানুষ কর্ম্ম করে না, প্রকৃতিই কর্ম্ম করে। ত্রিগুণময়ী

মহাশক্তিই মানুষের ভিতর দিয়া কর্ম্ম করে—মানুষকে শিখিতেই হইবে যে সে কর্ম্ম করে না। অতএব, "কর্ম্মে অধিকার" এ কথাটা শুধু ততক্ষণই খাটিতে পারে, যতক্ষণ অজ্ঞানের বশে আমরা আমাদিগকেই কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করি। যখন আমরা বুঝিতে পারিব যে আমরা আমাদের কর্ম্মের কর্ত্তা নই—তখনই ফলের অধিকারের মত আমাদের কর্ম্মেরও অধিকার ঘুচিয়া যাইবে। তখন কর্ম্মীর অহঙ্কার—ফলে দাবী বা কর্ম্মে অধিকার, সমস্ত দূর হইয়া যাইবে।

কিন্তু প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বই গীতার শেষ কথা নহে। ইচ্ছার সমতা এবং কর্ম্মফল পরিত্যাগ, চিত্ত মন বুদ্ধির দ্বারা ভগবদ্ চৈতন্যে প্রবেশ করিবার এবং তন্মধ্যে বাস করিবার উপায় মাত্র। গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে যতদিন শিষ্য এই উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে না পারিতেছে ততদিনই এইগুলিকে উপায় রূপে ব্যবহার করিতে হইবে। (দ্বাদশ অধ্যায়ে ৮, ৯, ১০ ও ১১ শ্লোক দেখ)। আরও কথা, কৃষ্ণ যে নিজেকে ভগবান বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, ইনি কে? ইনি পুরুষোত্তম—যে পুরুষ কর্ম্ম করে না তাহার উপরে, যে প্রকৃতি কর্ম্ম করে তাহারও উপরে। তিনি একটিব ভিত্তি, অপরটির প্রভু। নিখিল সংসার যাহার প্রকাশ তিনি সেই ঈশ্বর—যিনি আমাদের মত মায়াবদ্ধ জীবেরও হৃদয়ে বসিয়া প্রকৃতির কর্ম্ম পরিচালন করিতেছেন। কুরুক্ষেত্রের সৈন্য বাহিনী বাঁচিয়া থাকিলেও তাঁহার দ্বারাই ইতিপূর্ব্বে নিহত হইয়াছে, তিনিই এই মহা হত্যাকাণ্ডে অর্জ্জুনকে যন্ত্র বা নিমিত্তের মত ব্যবহার করিতেছেন। প্রকৃতি কেবল তাঁহারই কার্য্যকারিণী শক্তি (executive force)। শিষ্যকে এই শক্তির, এবং ইহার তিনগুণের উপরে উঠিতে হইবে, তাঁহাকে ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে; তাঁহাকে প্রকৃতির নিকট কর্ম্ম

সমর্পণ করিতে হইবে না—সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ কারতে হইবে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, ইচ্ছা সমস্ত তাঁহাতে নিবিষ্ট করিয়া আত্মা সম্বন্ধে, ঈশ্বর সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানযুক্ত হইয়া, পূর্ণ সমতা, পূর্ণ ভক্তি, পূর্ণ আত্মদান সহ—সকল কর্ম্মের, সকল যজ্ঞের ঈশ্বরের পূজা স্বরূপ তাঁহাকে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে। সেই ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিলাইতে হইবে, সেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞান মিলাইতে হইবে—তাহা হইতেই কর্ম্মাকর্ম্ম স্থির করিতে হইবে, কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবে। শিষ্যের সকল সন্দেহের মীমাংসা ভগবান এইরূপেই করিয়াছেন।

গীতার শ্রেষ্ঠ কথা কি, মহাবাক্য কি তাহা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে না। কারণ শেষে গীতাই ইহা ঘোষণা করিয়া দিয়াছে—ইহাই গীতা শিক্ষার চরম কথা—"হে ভারত, সর্ব্বান্তঃকরণে হৃদিস্থিত ঈশ্বরের শরণ লও; তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি এবং পরমেশ্বরের সম্বন্ধীয় নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে গোপনীয় হইতেও গোপনীয় জ্ঞান আমি তোমাকে বলিলাম। সর্ব্ববিধ গোপনীয় হইতেও গোপনীয়, পরম পুরুষার্থ সাধন, আমার বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর—

> মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
> মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
> সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—তুমি মদেকচিত্ত হইয়া একমাত্র আমারই উপাসক হও, একমাত্র আমাকেই নমস্কার কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে। তুমি আমার প্রিয়; অতএব তোমাকে সত্যই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি।

সমুদয় ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, আমি তোমাকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।”

কর্ম্মকে মানবীয় স্তর হইতে ঐশ্বরীয় স্তরে তুলিবার, গীতা তিনটি ধাপ দেখাইয়া দিয়াছে। এইরূপেই কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য জীবনের স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে। প্রথম, সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ সমতার সহিত পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হিসাবে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে। এই অবস্থায় মানুষ নিজেকেই কর্ম্মী বলিয়া মনে করে, পরমেশ্বরের সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করে না। ইহাই প্রথম ধাপ। দ্বিতীয়তঃ, শুধু কর্ম্মফলে নহে, কর্ম্মেও যে অধিকার নাই তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, আত্মা স্বয়ং কিছু করেন না—যিনি ইহা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা অবলোকন করেন, তিনিই এই দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন। শেষে প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত পুরুষোত্তমকে চিনিতে হইবে। প্রকৃতি সেই পুরুষোত্তমের দাসী মাত্র, প্রকৃতিস্থ পুরুষ তাঁহার অংশ বিশেষ। তিনি সকলের অতীত হইয়াও প্রকৃতির দ্বারাই সর্ব্বকর্ম্ম পরিচালন করিতেছেন। তাঁহাকেই ভক্তি করিতে হইবে, স্তুতি করিতে হইবে, সর্ব্বকর্ম্ম যজ্ঞরূপে তাঁহাকেই সমর্পণ করিতে হইবে। সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহারই শরণ লইতে হইবে—সমগ্র চৈতন্যকে তুলিয়া সেই দেব চৈতন্যের মধ্যে বাস করিতে হইবে—যেন মানবাত্মা সেই পুরুষোত্তমের সহিত প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারে এবং তাঁহারই সহচর হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত কর্ম্ম করিতে পারে।

কর্ম্মযোগই প্রথম ধাপ।—এই অবস্থায় স্বার্থশূন্য হইয়া ভগবানে ফলাফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।—গীতা যে বারবার কর্ম্ম

করিবার কথা বলিয়াছে, তাহা এই অবস্থারই উপযোগী কথা। জ্ঞানযোগ দ্বিতীয় ধাপ। এই অবস্থায় আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইবে এবং এই অবস্থায় গীতা বার বার জ্ঞানলাভের কথাই বলিয়াছে। কিন্তু, এখানেও যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে—এখানে কর্ম্মের পথ শেষ হয় না, জ্ঞানের পথের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়।—ভক্তি-যোগই শেষ ধাপ। এই অবস্থায় ভগবানকে লাভ করিবার জন্য ব্যগ্রতার উদয় হয় এবং এই অবস্থায় গীতা বার বার ভক্তির কথাই বলিয়াছে। কিন্তু, এখানেও জ্ঞান বা কর্ম্মের শেষ হয় না।—তবে তাহাদের উন্নতি ও চরম পরিণতি হয়। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি এই তিনটি পথ মিলিয়া এক হয়। যে ফলের আকাঙ্ক্ষা সকল সময়েই সাধকের মধ্যে থাকে তখন সেই ফল লাভ হয়—ভগবানের সহিত মিলন হয়, এবং ঐশ্বরীয় প্রকৃতির সহিত একাত্মতা প্রাপ্তি হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

কুরুক্ষেত্র

গীতায় কিরূপে ক্রমশঃ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পথ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে যে অবস্থা অবলম্বন করিয়া গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে আর একবার সেই অবস্থাটি অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক। সেই অবস্থাটি শুধু মানবজীবনের নহে—সমস্ত বিশ্ব-প্রপঞ্চেরই নমুনা স্বরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ, যদিও অর্জ্জুন শুধু নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেই চাহেন—তথাপি তিনি যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, যে ভাবে সে প্রশ্ন তুলিয়াছেন—তাহাতে মানবজীবনের ও কর্ম্মের গূঢ় রহস্য কি, জগৎ কি, মানুষ জগতে থাকিলেও কেমন করিয়া আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে পারে—সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গীতার গুরু অর্জ্জুনকে কোন আদেশ দিবার পূর্ব্বে এই সকল কঠিন ও গূঢ় তত্ত্বেরই মীমাংসা করিতে চান।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যে ব্যক্তি সংসারেও থাকিতে চায়, কর্ম্ম করিতেও চায় অথচ ভিতরে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে চায়—তাহার প্রতিবন্ধক কি? সৃষ্টির কোন্ দিকটা প্রত্যক্ষ করিয়া অর্জ্জুনের বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল? সাধারণ পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্মের মিথ্যা অবরণে বিশ্বজগতের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের নিকটে লুক্কায়িত থাকে। যখন সেই আবরণ খুলিয়া পড়ে, প্রকৃত জগৎ যাহা যখন আমরা তাহার সম্মুখীন

হই—অথচ উচ্চ জ্ঞানের আলোকে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া উঠিতে পারি না—তখন নিদারুণ আঘাতে জাগিয়া জগতের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। অর্জ্জুন সহসা এইরূপ জগতের প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই প্রকৃত স্বরূপ কি? বাহ্যতঃ এই স্বরূপ কুরুক্ষেত্রের হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতে প্রকট হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ভাবে জগতের এই স্বরূপ অর্জ্জুন দেখিলেন ভগবানের বিশ্বরূপে—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো।
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

কালরূপী ভগবান নিজের সৃষ্ট জীবগণকেই সংহার করিতেছেন, গ্রাস করিতেছেন। সর্ব্বভূতের যিনি ঈশ্বর, তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই আবার সকলের সংহারকর্ত্তা। প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁহারই নির্ম্মম ছবি অঙ্কিত করা হইয়াছে—পণ্ডিত ও বীরগণ তাঁহার খাদ্য, মৃত্যু তাঁহার ভোজের চাটনি! ইহা সেই একই সত্য যাহা প্রথমে পরোক্ষ ভাবে সংসারের ব্যাপারে দৃষ্ট হয় এবং পরে অপরোক্ষ ভাবে সাক্ষাৎ ও স্পষ্ট আত্মার দর্শনে প্রতিভাত হয়। জগৎ ও মানবজীবন যুদ্ধ, বিরোধ, হত্যার ভিতর দিয়া চলিতেছে—ইহাই বিশ্বের বাহ্য স্বরূপ। বিশ্ব সত্তা বিরাট সৃষ্টি এবং বিরাট ধ্বংসের ভিতর দিয়া নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে—ইহাই ভিতরের দিক।—জীবন একটি বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র এবং মৃত্যুভূমি—ইহাই কুরুক্ষেত্র। সেই হত্যাভূমিতে অর্জ্জুন ভগবানের ভীষণরূপ দর্শন করিলেন।

গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস বলিয়াছেন যে যুদ্ধই সকল বস্তুর জন্মদাতা, যুদ্ধই সকলের রাজা। গ্রীক পণ্ডিতদের অন্যান্য বচনের ন্যায় এই কথাটির ভিতরেও গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। জড় বা অন্যান্য শক্তির সংঘাতেই

জগতের সমস্ত বস্তুর, এমন কি জগতেরও উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। শক্তি ও বস্তুনিচয়ের পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাত বিরোধের দ্বারাই জগৎ চলিতেছে, নূতন সৃষ্টি হইতেছে পুরাতন ধ্বংস হইতেছে—এই সকলের উদ্দেশ্য কি, লক্ষ্য কি তাহা কেহ জানে না। কেহ বলে শেষে আপনা আপনি সমস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে—কেহ বলে ধ্বংসের পর সৃষ্টি আবার সৃষ্টির পর ধ্বংস—অনন্তকাল ধরিয়া এইরূপে অর্থহীন বৃথা চক্র ঘুরিতেছে। যাহারা আশাবাদী তাহারা বলে—সমস্ত বাধা বিপত্তি ধ্বংসের ভিতর দিয়া জগৎ ক্রমশঃই উন্নতির পথে, ভগবানের কোন অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে। তবে যাহাই হউক এটা ঠিক যে এ জগতে ধ্বংস ছাড়া কোন কিছুরই সৃষ্টি হইতে পারে না, বিভিন্ন শক্তির বিরোধ ছাড়া কোন সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, সর্ব্বদা অন্যের জীবন গ্রাস না করিলে কাহারও পক্ষে জীবন ধারণই সম্ভব নহে। শারীরিক জীবন ধারণ করিতে প্রতি মূহূর্ত্তে আমাদিগকে মরিতে হইতেছে—এবং নবজন্ম গ্রহণ করিতে হইতেছে। আমাদের শরীর একটি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত নগরের ন্যায়। একদল ইহাকে আক্রমণ করিতেছে, আর একদল ইহাকে রক্ষা করিতেছে—পরস্পরকে বিনাশ করা গ্রাস করাই পরস্পরের কাজ। সমস্ত জগৎই এইরূপ। সৃষ্টির প্রথম হইতেই যেন এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে—"তোমার সহচর, তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত যুদ্ধ না করিলে তুমি জয়লাভ করিতে পারিবে না। এমন কি যুদ্ধ না করিলে, অপরের জীবন গ্রাস না করিলে তুমি বাঁচিতেই পারিবে না। জগতের প্রথম বিধান আমি এই করিয়াছি যে ধ্বংসের দ্বারাই সৃষ্টি রক্ষা হইবে।"

প্রাচীন মনীষিগণ জগৎতত্ত্ব আলোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তেই

উপনীত হইয়াছিলেন। প্রাচীন উপনিষদসমূহে ইহা স্পষ্ট ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে—সেখানে এই কঠোর সত্যকে মিষ্ট কথায় ঢাকিবার কোনরূপ চেষ্টাই করা হয় নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন যে ক্ষুধারূপী মৃত্যুই জগতের প্রভু ও সৃষ্টিকর্ত্তা। যজ্ঞের অশ্বকে তাঁহারা প্রাণী মাত্রের রূপক করিয়াছিলেন।—জড় পদার্থের তাঁহারা যে নাম দিয়াছিলেন তাহার সাধারণ অর্থ হইতেছে খাদ্য। তাঁহারা জড়কে খাদ্য বলিয়াছেন—কারণ ইহা জীবকে খায় এবং জীব ইহাকে খায়। ভক্ষক মাত্রই ভুক্ত হয়—ইহাকেই তাঁহারা জড় জগতের মূল সত্য বলিয়া ধরিয়াছেন। ডারউইনের মতাবলম্বিগণ এই সত্যকে পুনরাবিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে বাঁচিবার জন্য যুদ্ধই বিবর্ত্তনের বিধান। হিরাক্লিটাসের বচন এবং উপনিষদের রূপকের দ্বারা যে সত্য স্পষ্ট নির্ভুল ভাবে তেজের সহিত প্রকাশিত হইয়াছিল—বর্ত্তমান বিজ্ঞান এখন তাহাই অস্পষ্ট ভাবে প্রচার করিতেছে।

বিখ্যাত জর্ম্মণ দার্শনিক নীট্শে যুদ্ধকেই সৃষ্টির নীতি এবং যোদ্ধাকে, ক্ষত্রিয়কেই আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছেন। মনুষ্য প্রথম ও চরম অবস্থায় যাহাই হউক—সম্পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে তাহাকে মধ্য-জীবনে যোদ্ধা হইতেই হইবে। নীট্শের এই সকল মতকে আমরা এখন যতই গালি দিই না কেন, ইহাদের ন্যায্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই মতের অনুসরণ করিয়া নীট্শে মানুষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আমরা মানিয়া লইতে না পারি—কিন্তু, জগতের যে ধ্বংসলীলার দিকে আমরা চক্ষু বুজিয়া থাকিতে চাই—নীট্শে তাহা অতি স্পষ্টভাবে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। আমাদিগকে এই কঠোর সত্য যে মনে পড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—ইহাতে ভালই

হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহা আমাদের ক্লৈব্য ও দুর্ব্বলতা দূর করিবে। যাহারা জগতে দেখে শুধু প্রেম, শুধু জীবন, সত্য ও সৌন্দর্য্য—কিন্তু প্রকৃতির করাল রূপ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লয়, যাহারা ভগবানের শুধু শিবমূর্ত্তির পূজা করে কিন্তু তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তিকে অস্বীকার করে—তাহাদের স্বভাবতঃই দুর্ব্বলতা ও জড়তা আসিয়া থাকে। ভগবানের রুদ্রমূর্ত্তির পূজা করিলে হৃদয়ে বলের সঞ্চার হয়। দ্বিতীয়তঃ, জগৎ যে প্রকৃত কি তাহা সোজাসুজি দেখিবার ও বুঝিবার মত সততা ও সাহস যদি আমাদের না থাকে তাহা হইলে জগতের ভিতর যে অনৈক্য ও বিরোধ রহিয়াছে আমরা কখনই তাহার সমাধান করিতে পারিব না। প্রথমে আমাদের দেখিতেই হইবে যে জীবন কি, জগৎ কি। তাহার পর সেগুলির যেরূপ হওয়া উচিত তাহাতে তাহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করা সহজ হইবে। জগতের এই যে অপ্রীতিকর দিকটা আমরা লক্ষ্য করিতে চাহি না, হয়ত ইহারই ভিতর এমন রহস্য লুক্কায়িত আছে—চরম সামঞ্জস্য স্থাপনে যাহার একান্ত প্রয়োজন। আমরা যদি এই দিকে লক্ষ্য না করি—তাহা হইলে সেই রহস্য হারাইয়া ফেলিতে পারি এবং তাহার অভাবে জীবন-তত্ত্ব সমাধানের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে পারে। যদি ইহা শত্রু হয়, যদি ইহাকে জয় করিতে হয়, দূর করিতে হয়, বিনাশ করিতে হয়—তাহা হইলেও ইহাকে অবহেলা করা চলে না। অতীতে এবং বর্ত্তমানে ইহা কিরূপে জীবনের সহিত গভীর ভাবে জড়িত তাহার হিসাব আমাদিগকে লইতেই হইবে।

যুদ্ধ এবং ধ্বংস যে শুধু জড়জগতেরই সনাতন নীতি তাহা নহে, ইহা আমাদের মানসিক ও ধর্ম্ম জীবনেরও নীতি। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে মানুষ ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, জ্ঞানচর্চ্চা—কোন ক্ষেত্রেই বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ

ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। অহিংসাকেই এখনও মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও নীতি বলিয়া ধরা হয়—কিন্তু, অন্ততঃপক্ষে এখন পর্য্যন্ত মানুষ এবং জগতের অবস্থা যেরূপ তাহাতে প্রকৃত ভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে অহিংসনীতি অবলম্বন করিলে এক পদও অগ্রসর হওয়া, উন্নতি করা সম্ভব নহে। আমরা কি শুধু আধ্যাত্মিক শক্তির (Soul force) ব্যবহার করিব—কোনরূপ শারীরিক বলপ্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ বা ধ্বংস করিব না, এমন কি আত্মরক্ষার জন্যও বলপ্রয়োগ করিব না? কিন্তু বর্ত্তমানে কত মানুষ, কত জাতি আসুরিক শক্তির প্রয়োগ করিয়া কত অত্যাচার করিতেছে, দলন করিতেছে, ধ্বংস করিতেছে, কলুষিত করিতেছে। যতদিন আত্মিক শক্তি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য না হইতেছে ততদিন শারীরিক বল প্রয়োগ করিয়া যদি এই আসুরিক শক্তিকে বাধা না দেওয়া যায় তাহা হইলে সেই আসুরিক শক্তি অপ্রতিহত ভাবে সহজেই ধ্বংস ও অত্যাচারের লীলা করিবে—এবং অপরে বলপ্রয়োগ করিয়া যত ধ্বংস সাধন করিতে পারে, আমরা বলপ্রয়োগে বিরত থাকিয়াই হয়ত তদপেক্ষা অধিকমাত্রায় ধ্বংস ও অত্যাচারের সহায়ক হইব। শুধু তাহাই নহে—আত্মিক শক্তি কার্য্যকরী হইলেও ধ্বংস সাধন করে। যাহারা চক্ষু মুদ্রিত না রাখিয়া এই শক্তির ব্যবহার করিয়াছেন তাহারাই জানেন যে এই আত্মিক শক্তি তরবারি ও কামান অপেক্ষা কত অধিক ভীষণ ও ধ্বংসকারী। যাহারা শুধু কর্ম্ম এবং কর্ম্মের অনতিপরিবর্ত্তী ফলের উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়া দূর পর্য্যন্ত দেখেন তাহারাই জানেন যে আত্মিক শক্তিপ্রয়োগের পরিণাম ফল কি ভীষণ—কত অধিক ধ্বংসসাধন হয়। শুধু পাপকে নষ্ট করা সম্ভব নয়—সেই পাপের দ্বারা যাহা কিছু বাঁচিয়া আছে, টিকিয়া আছে, পাপের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও বিনাশ সাধন হয়। আমরা

নিজের হাতে করিয়া ধ্বংস না করিলেও ধ্বংস হিসাবে তাহা কিছুই কম নহে।

আরও কথা এই যে, আমরা যখনই কাহারও বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তি প্রয়োগ করি, তখনই তাহার বিরুদ্ধে যে প্রবল "কর্ম্ম" শক্তি (Force of Karma) উদ্বুদ্ধ হয় সেটিকে নিয়ন্ত্রিত করা আমাদের সাধ্যাতীত। বিশ্বামিত্র ক্ষাত্রশক্তি (Military violence) লইয়া বশিষ্ঠকে আক্রমণ করায় বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তি (Soul force) প্রয়োগ করিলেন, ফলে হুন, শক ও পল্লব সৈন্যগণ আক্রমণকারীর উপর পড়িল। আক্রান্ত ও অত্যাচারিত হইয়া আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সম্পন্ন মনুষ্য যখন নীরবে সকল সহ্য করে, তখন জগতের ভীষণ শক্তিসমূহ তাহার প্রতিশোধ লইতে জাগিয়া উঠে। যাহারা পাপ করিতেছে, অন্যায় অত্যাচার করিতেছে, বলপ্রয়োগ করিয়াও যদি তাহাদিগকে বন্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহারই করা হয়—নতুবা, তাহাদের অপ্রতিহত অন্যায় অত্যাচারের ফলে তাহারা নিজেদের উপর ভীষণতর শাস্তি ও ধ্বংস আনয়ন করিবে। শুধু আমরা যদি আমাদের হস্তকে কলুষিত না করি এবং আত্মাকে হিংসভাবাপন্ন না করি তাহা হইলেই জগৎ হইতে যুদ্ধ ও ধ্বংস উঠিয়া যাইবে না। মানবজাতির মধ্যে ইহার যে মূল রহিয়াছে তাহা উৎপাটিত করিতে হইবে। নিজেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেই এবং অন্যায় অত্যাচারকে বাধা না দিলেই—যুদ্ধ ও হিংসা লোপ পাইবে না। অকর্ম্ম, তামসিকতা, জড়তা দ্বারা জগতে যত অনিষ্ট হয়, রাজসিকতা ও যুদ্ধ দ্বারা ততটা হয় না। অন্ততঃপক্ষে রাজসিকতার দ্বারা যত ধ্বংস হয় তদপেক্ষা অধিক সৃষ্টি হয়। অতএব কোন ব্যক্তি যদি যুদ্ধ ও ধ্বংস হইতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তাহারই

নৈতিক উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু তাহার দ্বারা জগৎ হইতে যুদ্ধ ও ধ্বংসের নীতি উঠিয়া যাইবে না।

জগতে যুদ্ধনীতির প্রভাব কিরূপ অদম্য, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সৃষ্টির এই ভীষণ দিকটা যে আমরা একটু কোমল করিয়া দেখিতে চাই, অন্য দিকে ঝোঁক দিতে চাই, ইহা খুবই স্বাভাবিক। যুদ্ধ এবং ধ্বংসই সব নহে; একদিকে যেমন বিচ্ছেদ ও বিরোধ অন্যদিকে তেমনি পরস্পরের সহিত মিলন ও সহযোগিতাও রহিয়াছে। প্রেমের শক্তি স্বার্থপরতা অপেক্ষা ন্যূন নহে। নিজের জন্য অপরকে নাশ করিবার যেমন প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তেমনই অপরের জন্য মরিবার প্রবৃত্তিও আমাদের মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু, এই সকল শক্তি কেমন ভাবে কার্য্য করিয়াছে তাহা যদি আমরা লক্ষ্য করি তখন আর তাহাদের বিপরীত গুলিকে উপেক্ষা করিতে বা সেগুলিকে তেমন ভাবে দেখিতে পারিব না। মানুষ যে শুধু পরস্পরকে সাহায্য করিবার নিমিত্তই সহযোগিতা করে তাহা নহে—শত্রুর বিনাশ সাধন করিতেও লোকে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করে। সহযোগিতা অনেক সময় যুদ্ধ, অহঙ্কার প্রতিষ্ঠারই সহায়ক হইয়াছে। এমন কি প্রেমই সর্ব্বদা ধ্বংসের শক্তিরূপে ক্রীড়া করিয়াছে। বিশেষতঃ শুভের প্রতি প্রেম, ভগবানের প্রতি প্রেম জগতে বহু যুদ্ধ, হত্যা ও ধ্বংস ঘটাইয়াছে। আত্মবলিদান খুবই মহান, কিন্তু চরম আত্মবলিদানের দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে কোন কার্য্য উদ্ধার করিতে হইলে কোন শক্তির নিকট কাহাকেও বলিদান দেওয়া আবশ্যক, মরণের ভিতর দিয়া জীবনই সৃষ্টির নীতি? শাবককে রক্ষা করিতে পক্ষীমাতা আততায়ী জন্তুর সম্মুখীন হইতেছে, দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশভক্ত প্রাণ বিসর্জ্জন

দিতেছে, ধর্ম্মের জন্য, আদর্শের জন্য লোকে কত দুঃখ, কত নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে—জীবজগতের নিম্ন ও উচ্চস্তরে এই সকলই আত্মবলিদানের দৃষ্টান্ত এবং এই সকল হইতে কি প্রমাণিত হয় তাহা সহজেই বোধগম্য।

কিন্তু, আবার এই সকলের পরিণামের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে জগৎকে সুখময় বলিয়া ভাবা আরও কঠিন হইয়া পড়িবে। দেখুন, যে দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য শত শত দেশভক্ত একদিন প্রাণ দিয়াছে কিছুদিন পর যখন তাহাদের কর্ম্মের ফল ফুরাইয়া গেল তখন সেই দেশই অপর দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া নিজেকে বড় করিতে ব্যস্ত! সহস্র সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ খৃষ্টান প্রাণবিসর্জ্জন দিলেন, পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যের শক্তির বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তির (soul force) প্রয়োগ করিলেন যেন খৃষ্টের জয় হয়, খৃষ্টধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মিক শক্তির জয় বাস্তবিকই হইল, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইল কিন্তু খৃষ্টের জয় ত হইল না। যে সাম্রাজ্যকে বিনষ্ট করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সাম্রাজ্য অপেক্ষাও খৃষ্টধর্ম্ম এখন অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে। জগতের ধর্ম্মগুলিই এখন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে পরস্পরের সহিত লড়িতেছে, জগতে আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করিতেছে।

এই সকল হইতেই বেশ বোধ হয় যে জগতে এই যে একটা জিনিষ রহিয়াছে, সেটিকে কেমন করিয়া জয় করিতে হইবে তাহা আমরা জানি না। হয়ত ইহাকে জয় করা সম্ভব নয়, নয় আমরা নিরপেক্ষ ভাবে দৃঢ়তার সহিত এই জিনিষটাকে তাকাইয়া দেখি নাই, এটাকে ভালরূপে জানিবার চেষ্টা করি নাই, তাই এপর্য্যন্ত জয় করিতে পারি নাই। জগৎ সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে জগৎটা বাস্তবিক যাহা তাহা আমাদিগকে ভাল করিয়া দেখিতেই হইবে। জগৎকে দেখা আর

ভগবানকে দেখা এক—কারণ, দুইটিকে পৃথক করা চলে না। যিনি জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও এই জগতের আইনকানুন, নীতির জন্য দায়ী করা চলে না। কিন্তু এখানেও আমরা ইতস্ততঃ করি, সত্যকে চাপা দিবার চেষ্টা করি। আমরা বলি ভগবান দয়া, প্রেম ও ন্যায়ের আধার—জগতে যাহা কিছু অশুভ আছে, পাপ আছে, নিষ্ঠুরতা আছে সে সকল তাঁহার কৃত নহে, সয়তানের কৃত। ভগবান কোন কারণে এই সয়তানকে মন্দ করিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন অথবা ভগবান প্রথমে সবই শুভ ও পুণ্যময় করিয়া গড়িয়াছিলেন কিন্তু মানুষ তাহার পাপের দ্বারা জগতে অমঙ্গলের সূচনা করিয়াছে। যেন মানুষই মৃত্যুর সৃষ্টি করিয়াছে, জীব-জগতে গ্রাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতি সৃষ্টি করিতেছে এবং সেই সঙ্গে ধ্বংস করিতেছে—ইহাও যেন মানুষেরই বিধান! জগতের অতি অল্প ধর্ম্মই ভারতের মত খোলাখুলি ভাবে বলিতে সাহস করিয়াছে যে এই রহস্যময় জগতের একটিই কর্ত্তা—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই তিনই এক ভগবানের কার্য্য, বিশ্বশক্তি শুধু সর্ব্বমঙ্গলা দুর্গা নহে, করালী কালীও বটে। রুধিরাক্তকলেবরা ধ্বংস-নৃত্য-পরায়ণা কালীমূর্ত্তিকে দেখাইয়া হিন্দুই বলিতে পারিয়াছে—"ইনিও মা, ইহাকে ভগবান বলিয়া জান—যদি সাধ্য থাকে ইহার পূজা কর।" যে ধর্ম্মে এইরূপ অবিচলিত সততা এবং অসীম সাহস, সেই ধর্ম্মই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা গভীর ও বিস্তৃত আধ্যাত্মিকতার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। কারণ, সত্যই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি এবং সাহস তাহার প্রাণ।

তবে আমরা একথা বলিতে চাই না যে যুদ্ধ এবং ধ্বংসই সৃষ্টির মূল কথা, সামঞ্জস্য যুদ্ধ অপেক্ষা বড় নহে, মৃত্যু অপেক্ষা প্রেমেই ভগবানের অধিক প্রকাশ নহে। পাশবিক বলের পরিবর্ত্তে আত্মিক শক্তির প্রতিষ্ঠা

করিতে, যুদ্ধ উঠাইয়া শান্তি স্থাপন করিতে, বিরোধের স্থানে মিলনের প্রতিষ্ঠা করিতে, গ্রাসের বদলে প্রেমের প্রতিষ্ঠা করিতে, স্বার্থপরতার স্থানে সার্ব্বজনীনতা স্থাপন করিতে, মৃত্যুর বদলে অমরত্ব লাভ করিতে যে চেষ্টা করিতে হইবে না তাহাও আমরা বলি না। ভগবান শুধু ধ্বংস-কর্ত্তা নহেন, তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃদও বটেন। ভীষণা কালীই সর্ব্বমঙ্গলা মা। কুরুক্ষেত্রের কর্ত্তাই আবার অর্জ্জুনের সখা ও সারথি, জীবের প্রাণারাম, অবতার কৃষ্ণ। সমস্ত বিরোধ, যুদ্ধ, গোলমালের ভিতর দিয়া তিনি যে আমাদিগকে কোন শুভের দিকে, দেবত্বের দিকে লইয়া যাইতেছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে এটা ঠিক যে আমরা যে যুদ্ধ ও বিরোধের কথা এত করিয়া বলিতেছি—এসবের উপরেই লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু, কোথায় কেমন করিয়া, কিরূপে তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। এবং বুঝিতে হইলে জগৎটা এখন বাস্তবিক কিরূপ তাহা আমাদিগকে জানিতেই হইবে—ভগবানের কর্ম্ম এখন কিরূপ তাহা বুঝিতেই হইবে—তাহার পর আমাদের লক্ষ্য, আমাদের পথ আমাদের সম্মুখে ভাল করিয়া প্রতিভাত হইবে। আমাদিগকে কুরুক্ষেত্র স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। অমরত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বে—মৃত্যুর দ্বারাই জীবন, এই নীতি আমাদিগকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। কাল ও মৃত্যুর কর্ত্তার সম্মুখে চক্ষু খুলিয়া আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে—অর্জ্জুনের মত অত ভয় খাইলে চলিবে না। বিশ্বসংহারকর্ত্তাকে অস্বীকার করিলে, ঘৃণা করিলে, প্রত্যাখ্যান করিলে চলিবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মনুষ্য ও জীবন-যুদ্ধ

অতএব গীতার সর্ব্বব্যাপী শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, গীতা জগতের প্রকাশ্য স্বরূপ ও পদ্ধতি যেরূপ নির্ভয়ে অবলোকন করিয়াছে তাহা বুঝিতে হইবে। কুরুক্ষেত্রের দেব সারথি একদিকে সকল জগতের ঈশ্বর, সর্ব্বজীবের বন্ধু ও সর্ব্বজ্ঞ গুরু রূপে প্রতীয়মান, অন্যদিকে তিনিই আবার জনগণের ক্ষয়সাধনকারী ভীষণ কাল—লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ। গীতা এবিষয়ে সার্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া ইহাকেও ভগবান বলিয়াছে, জগৎরহস্যের এই দিকটা চাপা দিবার চেষ্টা করে নাই। কেহ বলে এই জগৎ জড়শক্তির অন্ধ ক্রিয়া মাত্র। কেহ বলে এই দৃশ্যমান জগৎ সত্য নহে, ইহা মিথ্যা—সনাতন, অক্ষর অদ্বিতীয় আত্মার মধ্যে স্বপ্নের ন্যায় ভাসমান মায়া মাত্র। কিন্তু গীতা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং বলে যে তিনি স্বকৃত মহাশক্তি চালিত বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন; তিনি মায়া, প্রকৃতি বা শক্তির দাস নহেন—প্রভু; তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জগতে কিছুই সংঘটিত হইতে পারে না—অতএব, জগৎ পদ্ধতির কোন বিশেষ অংশের জন্য তিনি ভিন্ন আর কেহ দায়ী নহেন। যাহারা গীতার এই মত স্বীকার করেন তাহাদের পক্ষে বিশ্বাস রক্ষা করা বড় কঠিন। জগতে দেখিতে পাওয়া যায় অসীম অজ্ঞাত শক্তি সমূহ পরস্পরের সহিত বিরোধ করিয়া দৃশ্যতঃ অশেষ গোলমালের সৃষ্টি

করিতেছে, এখানে কোন জীবন অনবরত পরিবর্ত্তন ও মৃত্যু ভিন্ন টিকিতে পারে না, চতুর্দ্দিকে ব্যথা, যন্ত্রণা, অমঙ্গল ও ধ্বংসের ভয়—এই সকলের ভিতর সর্ব্বব্যাপী ভগবানকে দেখিতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে যে এই রহস্যের নিশ্চয়ই কোন সমাধান আছে, এই অজ্ঞানের উপর নিশ্চয়ই এমন জ্ঞান আছে যাহার দ্বারা সকলের সামঞ্জস্য বুঝিতে পারা যায়, এই বিশ্বাসের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে—"তুমি যদি মৃত্যুরূপে এস, তথাপি তোমারই উপর আমি নির্ভর করিব।" জগতের যত ধর্ম্মমতের দ্বারা মানুষ চালিত হয় তাহাদের ভিতরে কম বা বেশী স্পষ্টভাবে এই বিশ্বাসই নিহিত রহিয়াছে।

অতএব মানব জীবনে যে বিরোধ ও যুদ্ধ আছে এবং তাহা যে সময়ে সময়ে কুরুক্ষেত্রের ন্যায় মহা সন্ধিক্ষণে পরিণত হয় ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। মানবজাতির ইতিহাসে মাঝে মাঝে এরূপ যুগান্তর ও সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয় যখন ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বিরাট ধ্বংস ও পুনর্গঠনের জন্য মহাশক্তিসমূহের সংঘাত উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ এরূপ যুগান্তর ভীষণ যুদ্ধ ও রক্তপাতের ভিতর দিয়া সংঘটিত হয়। এইরূপ যুগসন্ধিকে গীতা-শিক্ষার কাঠামো করা হইয়াছে। জগতে এরূপ ভীষণ যুগপরিবর্ত্তনের যে প্রয়োজন আছে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াই গীতা অগ্রসর হইয়াছে। গীতা নৈতিক জগতে পাপ ও পুণ্যের বিরোধ, শুভ ও অশুভের বিরোধ যেমন স্বীকার করিয়াছে, তেমনি সাধু ও দুষ্কৃতের মধ্যে শারীরিক যুদ্ধও স্বীকার করিয়াছে। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে গীতা যখন রচিত হয়, এখন অপেক্ষা তখন মানব-জীবনে যুদ্ধ আরও অধিক প্রয়োজনীয় ছিল এবং জীবন হইতে যে যুদ্ধ কখনও উঠিতে পারে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। সকল মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণ সদ্ভাব না হইলে স্থায়ী ও প্রকৃত

শান্তি কখনও সম্ভব নহে। এরূপ সদ্ভাব ও সর্ব্বব্যাপী শান্তির আদর্শ মনুষ্য তখন মুহূর্ত্তের জন্যও গ্রহণ করিতে পারে নাই; কারণ সমাজে, ধর্ম্মে আধ্যাত্মিকতায় মানবজাতি তখন ইহার জন্য প্রস্তুত হয় নাই—প্রকৃতিও এরূপ বিধান বরদাস্ত করিবার মত অবস্থায় উপনীত হয় নাই। এমন কি এখনও আমরা যতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহাতে পরস্পরের স্বার্থের মধ্যে কতকটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া নিকৃষ্ট রকমের যুদ্ধ ও বিরোধের হাত এড়ান ভিন্ন আর কিছুই করা সম্ভবপর হয় নাই। এইটুকুই করিবার নিমিত্ত স্বভাবের বশে মানবজাতিকে যে নৃশংস যুদ্ধ ও রক্তপাতের অবতারণা করিতে হইয়াছে ইতিহাসে তাহার তুলনা আর কোথাও নাই। এই যে শান্তি—ইহারও ভিত্তি মানবচরিত্রের কোন গভীর পরিবর্ত্তনের উপর স্থাপিত হয় নাই। অর্থনৈতিক অসুবিধা, প্রাণহানি করিতে বিতৃষ্ণা, যুদ্ধের বিপদ ও ভীষণতা এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজনৈতিক বন্দোবস্তের দ্বারা শান্তি রক্ষার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার ভিত্তি যে খুব দৃঢ় এবং তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয় না। এমন এক দিন আসিবে, নিশ্চয়ই আসিবে যখন মানবজাতির আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক অবস্থা সর্ব্বব্যাপী শান্তির অনুকূল হইবে। কিন্তু যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন ধর্ম্মকেই যুদ্ধ এবং যোদ্ধারূপে মানুষের কর্ত্তব্যের মীমাংসা করিয়া দিতেই হইবে। ভবিষ্যতে মানবজীবন কিরূপ হইতে পারে শুধু তাহাই না ধরিয়া, উহা এখন বাস্তবিক যেরূপ, গীতা তাহাই ধরিয়াছে এবং প্রশ্ন তুলিয়াছে যে যুদ্ধের সহিত আধ্যাত্মিক জীবনের সামঞ্জস্য কেমন করিয়া রক্ষা করা যাইতে পারে?

সেইজন্যই গীতার শিক্ষা একজন ক্ষত্রিয়ের নিকট কথিত হইয়াছে। যুদ্ধ ও দেশরক্ষাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। সমাজে অন্য কার্য্য করিতে হয় বলিয়া

যাহারা নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না, তাহাদিগকে আক্রমণকারীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা দুর্ব্বল ও নির্য্যাতিত তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এবং জগতে ন্যায় ও ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হয়।—ভারতে ক্ষত্রিয় শুধু সৈনিক নহেন—ধর্ম্ম ও সমাজের রক্ষা তাহার ধর্ম্ম, স্বভাবতঃ তিনি আর্ত্তের রক্ষক এবং দেশের পালনকর্ত্তা ও রাজা।—যদিও গীতার সার্ব্বজনীন সাধারণ ভাব ও কথাগুলিই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান তথাপি যে বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার মাঝে ইহার উৎপত্তি তাহারও হিসাব লওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সমাজতন্ত্র হইতে তাহা বিভিন্ন। এখন আমরা মানুষকে একাধারে জ্ঞানী, ব্যবসায়ী এবং যোদ্ধা বলিয়াই দেখি। বর্ত্তমান সমাজে এই সকল কর্ম্মের তেমন বিভাগ নাই—আমরা চাই প্রত্যেক লোকই সমাজকে কিছু জ্ঞান দিক, কিছু অর্থসঞ্চয় করুক, দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধও করুক—কোন ব্যক্তির প্রকৃতি কোন রকম কার্য্যের অনুকূল আমরা তাহার হিসাব লইতে চাই না। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ব্যক্তির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ ঝোঁক দিত এবং তদনুসারে সমাজে তাহার স্থান ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিত। সামাজিক কর্ত্তব্য পালনই তখন মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইত না—সমাজে কর্ত্তব্য পালন করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধন করাই তখন ছিল শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ধ্যান ও জ্ঞান, যুদ্ধ ও দেশশাসন, ধনোৎপাদন ও আদান প্রদান, শ্রম ও সেবা—সমাজের কর্ত্তব্য এই চারিভাগে স্পষ্টভাবে বিভক্ত ছিল। যেরূপ কার্য্য যাহার স্বভাবের অনুযায়ী এবং যেরূপ কার্য্যের দ্বারা যাহার আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমোন্নতির সুবিধা সেইরূপ কার্য্যেই সেইরূপ লোককে নিযুক্ত করা হইত।

বর্ত্তমান যুগের যে ব্যবস্থা অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নির্ব্বিশেষে সর্ব্ববিধ কর্ম্মের জন্য সকল মানুষেরই সাধারণ ভাবে দায়িত্ব রহিয়াছে সে ব্যবস্থারও কতক সুবিধা আছে। এরূপ ব্যবস্থার গুণে সামাজিক জীবনে অধিকতর দৃঢ়তা, একতা, পূর্ণতার সুবিধা হয়। অন্যদিকে প্রাচীন প্রথামত কর্ম্ম অনুসারে জাতি বিভাগ করিতে যাইয়া ঘটনাচক্রে ভারতবর্ষে ক্রমে অসংখ্য জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, সামাজিক জীবনে সঙ্কীর্ণতা, অনৈক্য আসিয়াছে, জাতিগত ব্যবসায় অবলম্বন করিতে অনেককে স্বভাবের বিরুদ্ধেও কার্য্য করিতে হইতেছে। তবে আধুনিক প্রথারও অসুবিধা রহিয়াছে। অনেক সময় এই প্রথার ফল এতদূর গড়াইয়াছে যে সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধন হইয়াছে। আধুনিক যুদ্ধের স্বরূপ বিবেচনা করিলেই ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক প্রথা অনুসারে স্বদেশের' রক্ষা ও কল্যাণের জন্য যুদ্ধ করিতে সকল মনুষ্যই সাধারণ ভাবে বাধ্য। ইহার ফল হইয়াছে এই যে এখন কোথাও যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পণ্ডিত, কবি, দার্শনিক, পুরোহিত, ব্যবসাদার, শিল্পী, সকলকেই আপন আপন স্বাভাবিক কর্ম্ম হইতে ছিন্ন করিয়া মরিতে ও মারিতে, পরিখার ভিতর পাঠাইয়া দেওয়া হয়, সমগ্র সমাজ-জীবনে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়,লোকের জ্ঞান ও বিবেককে অমান্য করা হয়। এমন কি যে ধর্ম্মযাজক শান্তি ও প্রেমের বাণী প্রচার করিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাকেও বাধ্য হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয় এবং কসাইয়ের মত মানুষ মারিতে হয়। এইরূপে সামরিক ষ্টেটের আদেশে শুধুই যে মানুষের বিবেক ও স্বধর্ম্মকেই বলি দেওয়া হয় তাহা নহে, জাতি রক্ষার অত্যধিক আগ্রহে জাতীয় আত্মহত্যারই পথ সুন্দররূপে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়।

অন্যদিকে যুদ্ধের উৎপাত ও অনর্থ যতদূর সম্ভব কমানই ভারতীয় সভ্যতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যেই যুদ্ধকার্য্যটার ভার এক শ্রেণীর লোকের উপরই দেওয়া ছিল। এই শ্রেণীর লোক জন্ম, স্বভাব ও বংশগৌরবের দ্বারা এই কার্য্যের প্রকৃত ভাবে উপযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতেন। যুদ্ধ কার্য্যের দ্বারাই স্বাভাবিক ভাবে তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইত। একটা উচ্চ আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া যাহারা যোদ্ধার জীবন যাপন করেন তাহাদের সাহস, শক্তি, নিয়মানুবর্ত্তিতা, সহযোগিতা, শৌর্য্য প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়া তাহাদের আত্মার উন্নতি হইবার বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা হয়। সমাজের অন্য শ্রেণীর লোক উক্ত শ্রেণীর দ্বারা সর্ব্বদা বিপদ ও অত্যাচার হইতে রক্ষিত থাকিয়া নিশ্চিন্ত মনে আপন আপন কার্য্য করিতেন। নিজ নিজ কার্য্য ও ব্যবসায়ে ক্ষতি করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে যাইতে হইত না। যুদ্ধ অল্প লোকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকায় যুদ্ধের দ্বারা সমাজের সাধারণ জীবনে ক্ষতি খুব কমই হইত। উচ্চ নৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ায় এবং যতদূর সম্ভব দয়া সৌজন্য প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় যুদ্ধ মানুষকে নিষ্ঠুর না করিয়া উচ্চহৃদয় ও উন্নতই করিত। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে গীতা এইরূপ যুদ্ধের কথাই বলিয়াছে—জীবন হইতে যুদ্ধকে যখন বাদ দেওয়া চলে না, তখন এরূপ ভাবে যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যেন তাহা অন্যান্য কর্ম্মেরই ন্যায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হয়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিই তখন জীবনের একমাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত সীমাবদ্ধ যুদ্ধের দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের শরীর ধ্বংস হইত

বটে কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীণ জীবন এবং জাতির নৈতিক জীবন সুগঠিত হইত। উচ্চ আদর্শের দ্বারায় অনুপ্রাণিত হওয়ায় প্রাচীনকালে যুদ্ধ যে শৌর্য্য ও সৌজন্য বিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, অতি বড় গোঁড়া অহিংসবাদী ভিন্ন সকলেই সে কথা স্বীকার করিবেন। ইউরোপের নাইট্,ভারতের ক্ষত্রিয় এবং জাপানের সামুরাই জাতি ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যুদ্ধের দ্বারা মানবজাতির যে কল্যাণ হইতে পারে তাহা যদি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে যুদ্ধ উঠিয়া যাউক; গঠন শক্তি ও আদর্শ হইতে বিচ্যুত যুদ্ধ নিষ্ঠুর হিংসাকাণ্ড মাত্র এবং এরূপ যুদ্ধ মানব সমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যক্ত হইবে বটে কিন্তু আমাদের বিবর্ত্তনের যুক্তিসঙ্গত বিচার করিতে হইলে, যুদ্ধের দ্বারা অতীতে জাতির যে কল্যাণ হইয়াছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে যাহাই হউক শারীরিক যুদ্ধ জীবনের এক সাধারণ নীতির এক বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। মানবজাতিকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে যে সকল সাধারণ গুণের প্রয়োজন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম তাহার একটির বাহ্য নিদর্শন মাত্র। এই জগতে আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য জীবনে সর্ব্বত্রই যুদ্ধ ও বিরোধের যে একটা দিক আছে, শারীরিক যুদ্ধ তাহার বাহ্যিক দৃষ্টান্ত। জগতের ধারাই এই যে শক্তিসমূহ পরস্পরের সহিত বিরোধ করিতেছে, যুদ্ধ করিতেছে, পরস্পরকে ধ্বংস করিয়াই নিত্য নূতন মিটমাটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আশা হয় এমনই করিয়া একদিন সকল বিরোধের অবসান হইবে, পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে, কিন্তু কোন্ একত্বের উপর এই সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এ পর্য্যন্ত তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে না। মানুষের মধ্যে যে ক্ষত্রিয়ত্ব রহিয়াছে তাহা জীবনের এই নীতি স্বীকার করে এবং ইহাকে জয় করিতে যোদ্ধারূপে ইহার সম্মুখীন

হয়, শরীর বা বাহ্য আকারকে ধ্বংস করিতে কুণ্ঠিত হয় না কিন্তু এই সকল দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া এমন এক নীতি, এক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সেই শেষ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে, সকল দ্বন্দ্বের অবসান হইবে। বিশ্বশক্তির এই দিকটাকে এবং ইহার বাহ্য নিদর্শন শারীরিক যুদ্ধকে গীতা স্বীকার করিয়াছে এবং ইহার শিক্ষা একজন কর্ম্মী, যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়কে বিবৃত করিয়াছে। ভিতরে শান্তি, বাহিরে অহিংসা— এই যে আত্মার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যুদ্ধ তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। যোদ্ধার, ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্বকোলাহলময় জীবন নীরব আত্মজয় ও শান্তিপূর্ণ আদর্শ জীবনের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়াই মনে হয়। এই বিরোধের মধ্যে কোথায় সামঞ্জস্যের সূত্র রহিয়াছে গীতা তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে চায়, সেই সূত্র অবলম্বন করিয়াই সকল দ্বন্দ্ব বিরোধের অতীত শেষ সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

যে মানুষের প্রকৃতিতে যে গুণের প্রভাব অধিক সেই গুণ অনুসারেই সেই মনুষ্য জীবন যুদ্ধের সম্মুখীন হয়। সাংখ্যমতে জগৎ ত্রিগুণাত্মক। জগতের প্রত্যেক বস্তু ত্রিগুণের সমবায়ে গঠিত। গীতা এ মতের অনুমোদন করিয়াছে। গীতা বলে,—

"ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃস্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ। ১৮।৪০

"পৃথিবীতে কিংবা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কোনই বস্তু নাই যাহা প্রকৃতিসম্ভূত এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত।"

অতএব মানব প্রকৃতিরও তিন প্রধান গুণ আছে। শান্তি, জ্ঞান, সুখ সত্ত্বগুণের লক্ষণ। তৃষ্ণা, আসক্তি, কর্ম্ম রজোগুণের স্বরূপ।—অজ্ঞান ও আলস্য তমোগুণের লক্ষণ। যাহাদের প্রকৃতিতে তমোগুণের প্রাধান্য

তাহারা জগতের শক্তিসমূহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে না, সহজেই অভিভূত, নিপীড়িত হয়, তাহাদের অধীন হইয়া পড়ে।—তামসিক মনুষ্যেরা অন্য গুণের কিছু সহায়তা পাইলে কোনরূপে যতদিন সম্ভব টিকিয়া থাকিতে চায়, বাঁধা বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া জীবনযুদ্ধ হইতে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, কোন উচ্চ আদর্শের ডাকে চেষ্টা করিয়া জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিবার কোন প্রয়োজনই উপলব্ধি করে না। যাহাদের প্রকৃতিতে রজোগুণের প্রাধান্য তাহারা উৎসাহের সহিত জীবনযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং জগতে শক্তিসমূহের দ্বন্দ্বকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কার্য্যে লাগাইতে চেষ্টা করে—তাহারা চায় জয় করিতে, প্রভুত্ব করিতে, ভোগ করিতে। রাজসিক মনুষ্যেরা যদি কতকটা সত্ত্বগুণের সাহায্য পায় তাহা হইলে তাহারা এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া আন্তরিক রিপুগণকে জয় করিতে চায়, হর্ষ চায়, শক্তি চায়। জীবনযুদ্ধে তাহারা বেশ আনন্দ পায়, এটা তাহাদের একটা নেশার মত হয়, কারণ প্রথমতঃ জীবনযুদ্ধে তাহারা কর্ম্মের যে আনন্দ, সবলতার যে সুখ তাহা উপভোগ করিবার সুযোগ পায়; দ্বিতীয়তঃ ইহার দ্বারা তাহাদের উন্নতি, তাহাদের স্বাভাবিক আত্মবিকাশের সুবিধা হয়। যাহাদের উপর সত্ত্বগুণের প্রভাব অধিক তাহারা এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই ধর্ম্ম, নীতি, সামঞ্জস্য, শান্তি, সুখের সন্ধান করে। যে সকল মনুষ্য খাঁটি সাত্ত্বিক তাহারা অন্তরের ভিতরেই এই শান্তির সন্ধান করে। তাহারা হয় শুধু নিজেদের জন্যই এই শান্তি চায় অথবা এই আভ্যন্তরীণ শান্তির বার্ত্তা অপরকেও জানাইয়া দেয় কিন্তু বাহ্যজগতের যুদ্ধ দ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া বা তাহার প্রতি উদাসীন থাকিয়াই তাহারা শান্তি লাভ করিতে চায়। কিন্তু যে সকল সাত্ত্বিক প্রকৃতিতে রজোগুণেরও কিছু প্রভাব আছে তাহারা বাহিরে

যুদ্ধ দ্বন্দ্বের উপরই শান্তি ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চায়—যুদ্ধ বিরোধ দ্বন্দ্বকে পরাজিত করিয়া জগতে শান্তি প্রেম সামঞ্জস্যের রাজত্ব স্থাপন করিতে চায়। এই তিনটি গুণের প্রভাব যাহার প্রকৃতিতে যেরূপ সে সেই ভাবেই জীবন সমস্যার সম্মুখীন হয়।

কিন্তু এরূপ অবস্থাও আসিতে পারে যখন মানুষ প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের খেলায় তৃপ্ত হইতে পারে না—হয় ইহার বাহিরে যাইতে চায় অথবা ইহার উপরে উঠিতে চায়। মানুষ এমন কোন অবস্থা চায় যাহা ত্রিগুণের বাহিরে, গুণশূন্য বা নির্গুণ। অথবা এমন অবস্থায় উঠিতে চায় যাহা সকল গুণের উপরে, যেখানে সকল গুণের প্রভু হওয়া যায়, কর্ম্ম করা যায় অথচ কর্ম্মের অধীন হইতে হয় না—মানুষ নির্গুণ অবস্থা চায় অথবা ত্রিগুণাতীত অবস্থা চায়। পূর্ব্বোক্ত ভাব মানুষকে সন্ন্যাসের দিকে লইয়া যায়। শেষোক্ত ভাবের বশে মানুষ পাশবিক প্রবৃত্তিগুলিকে জয় করিতে চায়, অপরা প্রকৃতির দ্বারা ইতস্ততঃ চালিত হয় না—কামনা ও বাসনাকে বর্জ্জন করিয়া আভ্যন্তরীণ সমতা লাভই এইরূপ ভাবের মূল নীতি। প্রথমে সন্ন্যাসের দিকে অর্জ্জুনের ঝোঁক হইয়াছিল। তাহার বীরজীবনের পরিণাম কুরুক্ষেত্রের বিরাট হত্যাকাণ্ড হইতে প্রথমে তিনি পিছাইয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছিলেন। এতদিন তিনি যে নীতির বশে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন সেই নীতি হারাইয়া কর্ম্ম ত্যাগ, সংসার ত্যাগ ভিন্ন অন্য কোন পথই তিনি খুঁজিয়া পান নাই!—কিন্তু তাহার উপর ভগবানের আদেশ হইল বাহ্যতঃ সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে না, ভিতরে প্রাধান্য লাভ করিতে হইবে, আত্মজয় করিতে হইবে।

অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, রাজসিক মনুষ্য—তিনি সাত্ত্বিক আদর্শ অনুসারে তাঁহার রাজসিক কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করেন। যুদ্ধে যে আনন্দ আছে তাহা

সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াই তিনি অসীম উল্লাসের সহিত কুরুক্ষেত্রের বিরাট যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে ধর্ম্মের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন—এই গৌরবে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ। তাঁহার দ্রুতগামী রথে তিনি শঙ্খনিনাদে শত্রুগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি অবলোকন করিতে চান যে এই যুদ্ধে কাহারা দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের পক্ষ সমর্থন করিয়া, ধর্ম্ম, ন্যায়, সত্যের পরিবর্ত্তে স্বার্থপরতা ও অহঙ্কারের প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছে, কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম, ন্যায়, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাঁহার ভিতরে এই আত্মবিশ্বাস যখন চূর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার সুঅভ্যস্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম তাঁহাকে মহা পাপের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে বলিয়া যখন তাঁহার ধারণা হইল, তখন তমোগুণ জাগিয়া উঠিয়া সেই রাজসিক মনুষ্যকে ঘিরিয়া ধরিল—বিস্ময়, শোক, ভয়, অবসাদ, মোহে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বুদ্ধি ভ্রংশ হইল, তিনি অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তির বশীভূত হইলেন। ফলে সন্ন্যাসের দিকেই তাঁহার ঝোঁক হইল। এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করা শ্রেয়ঃ। রক্তপাত করিয়া যে ভোগের বস্তু সংগ্রহ করা হয় তাহাও রুধিরাক্ত। ধর্ম্ম ও নীতির নামে যে যুদ্ধ, ধর্ম্ম নীতি, সমাজ সকলের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সেই যুদ্ধ চালাইতে হইবে।

কর্ম্ম ও সংসার পরিত্যাগ, ত্রৈগুণ্য পরিত্যাগ—ইহাই সন্ন্যাস। কিন্তু সন্ন্যাস অবস্থায় উপস্থিত হইতে হইলে তিন গুণের কোনটির ভিতর দিয়াই যাইতে হয়। তামসিকতার বশে মানুষ সন্ন্যাসের দিকে যাইতে পারে—সংসার ও জীবনের প্রতি তাহাদের বিতৃষ্ণা, ঘৃণার উদয় হয়, অক্ষমতা বোধ ও ভয়ে অভিভূত হইয়া তাহারা সংসার ছাড়িয়া পালাইতে চায়; অথবা রজোগুণ তমোর দিকে যাইতে পারে, তখন সংসারের শোক দুঃখ দ্বন্দ্ব

নিরাশায় পরিশ্রান্ত হইয়া মানুষ আর কর্ম্মের কোলাহল, জীবনের যন্ত্রণা ভোগ করিতে চায় না। সত্ত্বমুখী রজগুণের বশেও মানুষ সন্ন্যাসের দিকে যাইতে পারে—সংসার যাহা দিতে পারে তাহা অপেক্ষা তাহারা উচ্চ বস্তু লাভ করিতে চায়। শুধু সত্ত্বগুণের বশে মানুষ বুদ্ধির দ্বারা সংসারের অসত্যতা উপলব্ধি করিয়া সন্ন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে—অথবা কালাতীত, অনন্ত, নীরব, নামরূপহীন শান্তির অনুভূতি লাভ করিয়াও মানুষ সংসার ছাড়িতে পারে। অর্জ্জুনের যে সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেটা হইতেছে সত্ত্বরাজসিক মনুষ্যের তামসিক বিরাগ। ভগবান গুরুরূপে অর্জ্জুনকে এই অন্ধকারময় পথের ভিতর দিয়াই তপস্বী জীবনের পবিত্রতা ও শান্তির মধ্যে লইয়া যাইতে পারিতেন। অথবা এখনই তাঁহার তামসিক বিরাগকে পবিত্র করিয়া সাত্ত্বিক সন্ন্যাসের অসাধারণ উচ্চতার দিকে লইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু, বাস্তবিক তিনি এই দুইটির কোনটিই করিলেন না। তিনি তামসিক বিরাগ এবং সন্ন্যাসের প্রতি ঝোঁককে নিন্দা করিলেন এবং অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিতে, এমন কি সেই ভীষণ নৃশংস যুদ্ধ করিতেই উপদেশ দিলেন। কিন্তু, তিনি তাঁহার শিষ্যকে আর এক সন্ন্যাস, আভ্যন্তরীণ ত্যাগের পথ দেখাইয়া দিলেন। অর্জ্জুনের যে সমস্যা তাহার ইহাই প্রকৃত মীমাংসা। এই রূপেই বিশ্বশক্তির উপর আত্মা প্রাধান্য লাভ করিবে অথচ সংসারে স্বাধীন ও শান্ত ভাবে কর্ম্মও করিতে পারিবে। বাহ্যিক সন্ন্যাস নহে আভ্যন্তরীণ ত্যাগ—কামনা, বাসনা, আসক্তির ত্যাগই গীতার শিক্ষা।

সপ্তম অধ্যায়

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম *

শোকে, দুঃখে, সন্দেহে অভিভূত হইয়া অর্জ্জুন যখন এই সংসারকে শূন্য ও অসার দেখিলেন, হত্যাকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত হইলেন, পাপ কর্ম্মের পাপ পরিণামের কথা বলিতে লাগিলেন তখন তাহার উত্তর স্বরূপ ভগবান তাহাকে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করিয়া উঠিলেন। ভগবান উত্তর করিলেন যে অর্জ্জুনের এই ভাব বুদ্ধির গোলমাল ও ভ্রম হইতে উৎপন্ন—ইহা হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য, ক্লৈব্য,—ক্ষত্রিয়োচিত, বীরোচিত ধর্ম্ম হইতে পতন। পৃথার পুত্রে ইহা শোভা পায় না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে তিনিই নায়ক, তিনিই ভরসা—এ হেন সঙ্কট সময়ে সেই ধর্ম্মপক্ষ পরিত্যাগ করা তাহার উচিত হয় না, মোহবশে দেবদত্ত গাণ্ডীব পরিত্যাগ করা, ভগবান কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কখনই উচিত হয় না। আর্য্যগণের অনুমোদিত ও অনুসৃত পথ ইহা নহে। এ ভাব স্বর্গের নহে, এ পথে স্বর্গে যাওয়া যায় না। ইহ জগতে মহৎ কর্ম্ম ও বীরত্বের দ্বারা যে কীর্ত্তি লাভ করা যায় এরূপ ব্যবহারে তাহা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। অর্জ্জুন এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, কার্পণ্য পরিত্যাগ করুক, উঠিয়া শত্রুগণের বিনাশ সাধন করুক।

কিন্তু, ইহা কি একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা দেবগুরুর উপযুক্ত উত্তর হইল? একজন ক্ষত্রিয় বীর আর একজন বীরকে এইরূপ উত্তর দিতে পারে।

* গীতা—দ্বিতীয় অধ্যায় ১-৩৮।

কিন্তু, ধর্ম্মগুরুর নিকট হইতে আমরা কি চাই না যে তিনি সর্ব্বদা কোমলতা, সাধুতা এবং আত্মত্যাগের উপদেশ দিবেন, সংসারের কাম্য, সাংসারিক চালচলন বর্জ্জন করিতে উৎসাহ দিবেন? গীতায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে অর্জ্জুন বীরের অনুচিত দুর্ব্বলতায় পতিত হইয়াছিলেন, তিনি অশ্রুপূর্ণাকুল-লোচন এবং বিষাদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ তিনি কৃপয়াবিষ্ট, কৃপা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু, এই দুর্ব্বলতা কি দেবোচিত নহে? কৃপা কি দেবোচিত ভাব নহে যে ইহাকে এরূপ তীব্র তিরস্কার করিয়া দমাইয়া দিতে হইবে? জার্ম্মাণ দার্শনিক নীট্‌শে বীরত্ব এবং গর্ব্বিত শক্তির নীতি প্রচার করিয়াছিলেন, হিব্রু ও টিউটনিকগণ দয়া মায়াকে বীর হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করিতেন—আমরা কি তবে সেইরূপ যুদ্ধনীতি এবং কঠোর বীরোচিত কার্য্যেরই উপদেশ শুনিতেছি? কিন্তু, গীতার শিক্ষা ভারতীয় সভ্যতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষে দয়া চিরকালই দেবচরিত্রের একটি প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। গীতারই গুরু শেষের এক অধ্যায়ে মানুষের মধ্যে দেবোচিত গুণের বর্ণনা করিতে যেমন নির্ভীকতা ও তেজের উল্লেখ করিয়াছেন তেমনি সর্ব্বজীবে দয়া, কোমলতা, অক্রোধ, অহিংসা এবং অদ্রোহেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ক্রূরতা, কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, শত্রুবধে আনন্দ, ধনসঞ্চয়ে আনন্দ, অন্যায় ভোগ্য বস্তু সংগ্রহে আনন্দ—এই সকল আসুরিক গুণ। যে সকল দুর্দ্দান্ত চরিত্র ব্যক্তি জগৎকে ঈশ্বরবিহীন বলে, মানুষের মধ্যে দেবত্ব অস্বীকার করে এবং কামনাকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া পূজা করে তাহাদের চরিত্রতেই উল্লিখিত লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়।—অতএব অর্জ্জুন এইরূপ অসুরোচিত গুণ-সম্পন্ন নহে বলিয়া ভগবান তাঁহাকে তীব্র ভৎর্সনা করিতে পারেন না।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে

সমুপস্থিতম্।"—হে অৰ্জ্জুন, এ বিষম সঙ্কট সময়ে এই মোহ কেন তোমায় আক্রমণ করিল? অৰ্জ্জুন তাঁহার বীরোচিত গুণ হইতে কিরূপ স্খলিত হইয়াছেন এই প্রশ্ন হইতেই তাহার স্বরূপ বুঝা যায়। দয়া একটি দেবোচিত গুণ—ইহা স্বর্গ হইতে আমাদের নিকট নামিয়া আসে। যাহার চরিত্রে এই গুণ নাই, যে এইরূপ ধাতে তৈয়ার নয়, সে যদি নিজেকে বড় বলে, আদর্শ মনুষ্য বলে, অতি-মানব বলে—তাহা হইলে সেটা তাহার পক্ষে মূর্খতা, ধৃষ্টতা হইবে। কারণ, কেবলমাত্র তিনিই অতি-মানব, যাহার চরিত্রে ভগবদ্‌গুণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ হইয়াছে। মানুষের যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব, সবলতা ও দুর্ব্বলতা, তাহার পাপ পুণ্য, তাহার সুখ দুঃখ, তাহার জ্ঞান অজ্ঞান, তাহার বিজ্ঞতা মূর্খতা, তাহার আশা নিরাশা এই সকল ব্যাপারকেই দয়াবান প্রেম, জ্ঞান ও শান্ত শক্তির চক্ষুতে দেখেন এবং সকল অবস্থাতেই সাহায্য করিতে চান, সান্ত্বনা দিতে চান। সাধু ও পরোপকারী-দের হৃদয়ে এই দেবোচিত দয়া যথেষ্ট প্রেম ও বদান্যের মূর্ত্তি ধারণ করে। পণ্ডিত ও বীরের হৃদয়ে এই দয়া কল্যাণকর জ্ঞান ও শক্তিরূপে প্রকট হয়। এই দয়াই আর্য্য ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্যের প্রাণ স্বরূপ—এই দয়ার বশেই ক্ষত্রিয়-বীর ছিন্ন লতাগুল্মকেও আঘাত করিতে চায় না, কিন্তু দুর্ব্বলকে, দলিতকে, আহতকে, পতিতকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু আবার এই দেবোচিত দয়াই দুর্দ্দান্ত অত্যাচারীকে ধরাশায়ী করে, তবে তাহা ক্রোধ বা ঘৃণার বশে করে না, কারণ ক্রোধ বা ঘৃণা দেবোচিত উচ্চ গুণ নহে। পাপীর প্রতি ভগবানের ক্রোধ, দুষ্টের প্রতি তাঁহার ঘৃণা, এ সকল মিথ্যা গল্প নরকের যন্ত্রণার গল্পের মতই অৰ্দ্ধ শিক্ষিত ধৰ্ম্ম সমূহ কর্তৃক রচিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন ধৰ্ম্ম স্পষ্টই দেখিয়াছিল যে দেবোচিত দয়ার বশে যে সকল ব্যথিত ও অত্যাচারিতকে অন্যায় ও উপদ্রব হইতে রক্ষা

করা হয় তাহাদের প্রতি যেরূপ প্রেম ও করুণা থাকে—যে সকল ভ্রমান্ধ দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী অসুরকে তাহাদের পাপের জন্য নিধন সাধন করিতে হয় তাহাদের প্রতিও সেইরূপই প্রেম ও করুণা থাকে।

কিন্তু যে ভাবের বশে অর্জ্জুন তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিতে উদ্যত, তাহা সেই দেবোচিত করুণা নহে। অর্জ্জুন নিজের দুর্ব্বলতায়, নিজের কষ্টে পীড়িত, কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে তাঁহার নিজের যে মানসিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে তাহা সহ্য করিতে অর্জ্জুন নারাজ। তিনি স্পষ্টই বলিলেন—"আমি এমন কিছুই দেখিতেছি না, যাহা আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষক এই শোক অপনোদন করিতে পারে।" এরূপ দীনতা ও আত্ম-দৌর্ব্বল্যের ভাব আর্য্যগণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা হীন ও অনার্য্যোচিত বলিয়া পরিগণিত হইত। অর্জ্জুনের যে কৃপা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাও এক রকমের স্বার্থপরতা। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ অর্জ্জুনের "বান্ধব" "স্বজন"—তাই তাহাদিগকে বধ করিতে অর্জ্জুনের প্রাণ চাহিতেছিল না। এইরূপ কৃপা মনের দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ কৃপা নিম্ন অবস্থায় লোকের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে—তাহাদের হৃদয় কিছু দুর্ব্বল হওয়াই উচিত নতুবা তাহারা কঠিন ও নিষ্ঠুর হইয়া পড়িবে। কারণ তাহাদিগকে কোমল স্বার্থপরতার দ্বারা নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা দূর করিতে হইবে, তাহাদের দুর্দ্দান্ত রাজসিক রিপুগণকে দমন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে অবসাদক তমগুণের দ্বারা সত্ত্বকে সাহায্য করিতে হইবে। কিন্তু, অর্জ্জুনের পক্ষে এ পথ নহে, তিনি উন্নত চরিত্র আর্য্য। দুর্ব্বলতার সাহায্যে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে না—ক্রমশঃ তাঁহার শক্তি বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। অর্জ্জুন দেবধর্ম্মী মানব—তিনি শ্রেষ্ঠ মনুষ্য তৈয়ারী হইতেছিলেন, দেবতারা তাঁহাকেই ইহার জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন! তাঁহাকে একটি কার্য্যের

ভার দেওয়া হইয়াছে, ভগবান তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার রথেই রহিয়াছেন, তাঁহার হস্তে দৈবাস্ত্র গাণ্ডীব, তাঁহার সম্মুখে ধর্ম্মদ্রোহী, দেবদ্রোহী, প্রতিদ্বন্দ্বিগণ! এখন তিনি কি করিবেন না করিবেন—নিজের খেয়াল বা হৃদয়াবেগের বশে তাহা স্থির করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। তাঁহার স্বার্থপর হৃদয় ও বুদ্ধির বশে একটা আবশ্যকীয় ধ্বংসকাণ্ড হইতে বিরত হইবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিনষ্ট হইয়া নিজের জীবন শূন্য ও দুঃখময় হইয়া যাইবে, এই ধ্বংসের দ্বারা তাঁহার নিজের পার্থিব কোন ফল লাভই হইবে না—এইরূপ স্বার্থপর চিন্তার বশে কর্ম্ম হইতে বিরত হইবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। এইরূপ মনোভাব তাঁহার উচ্চ প্রকৃতি হইতে দুর্ব্বল অধঃপতন ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন্‌টা কর্ত্তব্য কর্ম্ম শুধু ইহাই অর্জ্জুনকে বুঝিতে হইবে, তাঁহার ক্ষত্রিয় স্বভাবের মধ্য দিয়া ভগবান কি আদেশ দিতেছেন, শুধু তাহাই শুনিতে হইবে, মানবজাতির ভবিষ্যৎ তাঁহার কর্ম্মের উপর নির্ভর করিতেছে—সকল বাধা দূর করিয়া, সকল শত্রু বিনাশ করিয়া মানবজাতির উন্নতির পথ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত ভগবান তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন—ইহাই উপলব্ধি করিতে হইবে।

কৃষ্ণের ভর্ৎসনা অর্জ্জুন স্বীকার করিলেন, তথাপি তিনি কৃষ্ণের আদেশ পালন করিলেন না—বরং আরও তর্ক করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার দুর্ব্বলতা বুঝিলেন কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। তিনি স্বীকার করিলেন যে তাঁহার চিত্তের দীনতাই তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত বীর স্বভাবকে অভিভূত করিয়াছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিমূঢ় চিত্ত হইয়াই তিনি কৃষ্ণের নিকট শ্রেয়ঃ কি জানিতে চাহিলেন, (কৃষ্ণকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন) কিন্তু যে সকল

হৃদয়ভাব, যে সকল ধ্যান ধারণা অনুসারে এত দিন তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা ওলট পালট হইয়া যাওয়ায় এবং নূতন কিছু ধরিবার না পাওয়ায় অর্জ্জুন তাঁহার পুরাণো জীবনের উপযোগী একটা আদেশ মাথা পাতিয়া লইতে পারিলেন না। তিনি এখনও তর্ক করিতে লাগিলেন যে যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়াই তাঁহার পক্ষে ঠিক হইবে। এই হত্যাকাণ্ড করিতে এবং ইহার ফলস্বরূপ রুধিরাক্ত ভোগ্যসমূহ উপভোগ করিতে তাঁহার প্রাণ চাহিতেছে না। এই কর্ম্মের ফলে স্বজনগণকে হারাইয়া তাঁহার জীবন কিরূপ শূন্য ও দুঃখময় হইয়া উঠিবে তাহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় শিহরিয়া উঠিতেছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে এতদিন যে ধারণা তাঁহার অভ্যস্ত ছিল তাহাতে তিনি ভীষ্ম দ্রোণের ন্যায় গুরুজনকে কেমন করিয়া বধ করিবেন? এই যে ভীষণ নৃশংসকর্ম্মের ভার তাঁহার উপর দেওয়া হইয়াছে—ইহার যে কি সুফল হইতে পারে তাহা তাঁহার বুদ্ধিতে কুলাইতেছে না। তিনি যতদূর বুঝিতেছেন—এই ভীষণ কর্ম্মের ফল অতি অশুভই হইবে। এতদিন তিনি যে ধারণার বশে যে উদ্দেশ্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন এখন আর সে ধারণায়, সে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ না করিতে তিনি সঙ্কল্প করিলেন এবং ভগবান তাঁহার অকাট্য যুক্তিগুলি কেমন করিয়া খণ্ডন করেন, নীরবে তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগবান প্রথমেই অর্জ্জুনের অহঙ্কৃত ও মমতাপন্ন স্বভাবের এই দাবীগুলি নষ্ট করিতে অগ্রসর হইলেন। সকল অহঙ্কার ও মমতার উপরে যে ধর্ম্ম ইহার পর তাহা বিবৃত করিবেন।

ভগবান দুইটী বিভিন্ন পথ ধরিয়া অর্জ্জুনের প্রশ্নের জবাব দিলেন। অর্জ্জুন যে আর্য্যশিক্ষায় শিক্ষিত তাহারই সর্ব্বোচ্চ ভাবগুলিকে ভিত্তি করিয়া ভগবান সংক্ষেপে প্রথম উত্তর দিলেন। দ্বিতীয় যে উত্তর আরও

গভীরতর জ্ঞানের উপর তাহার ভিত্তি; এই উত্তর হইতে আমাদের জীবনের অনেক গুহ্য কথা বুঝিতে পারা যায়—ইহাই গীতা শিক্ষার প্রকৃত আরম্ভ। বেদান্ত দর্শনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তত্ত্ব এবং আর্য্য সমাজের নৈতিক ভিত্তি স্বরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, সম্মান অসম্মান সম্বন্ধে সামাজিক ধারণাকে অবলম্বন করিয়াই ভগবানের প্রথম উত্তর কথিত হইয়াছে। অর্জ্জুন ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ ফল সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহার যুদ্ধে পরাঙ্মুখতাকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে অর্জ্জুন তাঁহার অজ্ঞান, অশুদ্ধ চিত্তের বিদ্রোহকেই মিথ্যা পাণ্ডিত্যের দ্বারা ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি শরীর ও শরীরের মৃত্যু সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিয়াছেন যেন এইগুলিই চরম সত্য। কিন্তু জ্ঞানী বা পণ্ডিতেরা কখনই এরূপ মনে করেন না। বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে শোক প্রকৃত জ্ঞানানুমোদিত নহে। পণ্ডিতেরা মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না, কারণ তাঁহারা জানেন যে যন্ত্রণা ও মৃত্যু আত্মার জীবনের বিভিন্ন অস্থায়ী অবস্থা মাত্র। শরীর নহে, আত্মাই সত্য বস্তু। এই যে রাজগণের আসন্ন মৃত্যুর জন্য তিনি শোক করিতেছেন—ইহারা যে পূর্ব্বে কখন জীবন ধারণ করেন নাই তাহা নহে, ভবিষ্যতে যে আর কখনও জন্ম গ্রহণ করিবেন না, তাহাও নহে। কারণ যেমন এই দেহে দেহোপাধি বিশিষ্ট জীবের কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থাগুলির প্রাপ্তি হয়, দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও সেইরূপ। যাহারা শান্ত ও জ্ঞানী, যাহারা ধীর, যাহারা স্থির চিত্তে সংসারের ব্যাপার অবলোকন করিতে পারেন এবং ইন্দ্রিয় ও চিত্তের আবেগে বিচলিত ও মোহিত না হন, তাহারা জড় জগতের বাহ্যিক দৃশ্যে প্রতারিত হন না। তাঁহারা শরীরের স্নায়ুর, চিত্তের গোলমালে তাঁহাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানকে

মোহগ্রস্ত হইতে দেন না। তাঁহারা দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের অতীত জীবনের প্রকৃত সত্য দেখিতে পান এবং চিত্তাবেগ ও অজ্ঞান স্বভাবের শারীরিক বাসনা অতিক্রম করিয়া মানবজীবনের প্রকৃত ও একমাত্র উদ্দেশ্য অবলম্বন করিতে পারেন।

সেই প্রকৃত সত্য কি? সেই উচ্চতম উদ্দেশ্য কি? তাহা এই,—যুগে যুগে মানুষ জন্ম মৃত্যুর ভিতর দিয়া যাইয়া অমরত্ব লাভের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। এই যোগ্যতা কিরূপে আসিবে? কোন্ মনুষ্য প্রকৃত যোগ্য? যিনি নিজেকে শুধু শরীর ও প্রাণ বলিয়াই মনে করেন না, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াই যিনি জাগতিক সত্যাসত্য নির্ণয় করেন না, যিনি নিজকে এবং সকলকেই আত্মা বলিয়া জানেন, যিনি আত্মার মধ্যেই বাস করিতে শিখিয়াছেন, যিনি অপরের সহিত শারীরিক জীব ভাবে নহে, আত্মা ভাবেই ব্যবহার করেন—তিনি অমরত্ব লাভের প্রকৃত যোগ্য; কারণ মৃত্যুর পরও থাকাই অমরত্ব নহে—কারণ মন লইয়া যাহারা জন্ম গ্রহণ করে তাহারা সকলেই মৃত্যুর পরও থাকে। জন্ম মৃত্যুর উপরে উঠাই প্রকৃত অমরত্ব। মনোময় দেহ ছাড়াইয়া মানুষ যখন আত্মারূপে আত্মার মধ্যেই বাস করে তখনই তাহার প্রকৃত অমরত্ব লাভ হয়। যাহারা শোক দুঃখের অধীন, চিত্তাবেগ ও ইন্দ্রিয়ের দাস, অনিত্য বিষয় সমূহের স্পর্শ লইয়াই যাহারা ব্যস্ত তাহারা অমরত্ব লাভের যোগ্য হইতে পারে না। যতদিন এই সকলকে জয় করিতে পারা না যাইতেছে, ততদিন ইহাদিগকে সহ্য করিতেই হইবে—শেষে এমন একদিন আসিবে যখন ইহারা মুক্ত পুরুষকে আর ব্যথা দিতে পারিবে না। যে অনন্ত শান্ত আত্মা গুপ্তভাবে আমাদের অন্তরের মধ্যে রহিয়াছেন, তিনি যেমন জ্ঞান, সমতা ও শান্তির সহিত সংসারের সমস্ত ঘটনা গ্রহণ করেন—মুক্ত পুরুষও তেমনই

শান্তভাবে সংসারের সুখ দুঃখ গ্রহণ করিতে পারিবেন। অর্জ্জুনের মত দুঃখ ও ভয়ে বিচলিত হওয়া, তাহাদের দ্বারা কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া, আত্মকৃপা এবং অসহ্যবোধে দুঃখ দ্বারা অভিভূত হওয়া, অবশ্যম্ভাবী তুচ্ছ শারীরিক মৃত্যুর সম্মুখে শিহরিয়া উঠা—ইহা অনার্য্যোচিত অজ্ঞান। যে আর্য্য শান্ত শক্তির সহিত অমরত্বে উঠিতে চাহিবে—এপথ তাহার নহে।

মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই। কারণ শরীরই মরে, কিন্তু শরীর মানব নহে। যাহা নিত্য বস্তু তাহা কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না—তবে তাহা ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইতে পারে, শুধু আকারের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। তেমনই যাহা অনিত্য তাহার কোন সত্ত্বা থাকিতে পারে না। এই সৎ ও অসতের তফাৎ উপলব্ধি হইলে বুঝা যায় যে আত্মা নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে—কেহই এই অব্যয় আত্মার বিনাশ সাধন করিতে পারে না। দেহের বিনাশ আছে, কিন্তু যাঁহার এই দেহ, যিনি এই দেহকে ব্যবহার করেন, সেই আত্মা অনন্ত, অপ্রেমেয়, নিত্য, অবিনাশী। যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে—ইহাতে শোক করিবার কি আছে? পশ্চাৎপদ হইবার বা শিহরিয়া উঠিবার কি আছে? ইহা জন্মায় না, মরেও না। ইহা এরূপ বস্তু নহে যে, উৎপন্ন হইয়া লোপ পাইয়া আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। ইহা অজ, শাশ্বত, পুরাণ—শরীরের বিনাশ হইলেও ইহা হত হয় না। অমর আত্মার বিনাশ সাধন করিতে কে পারে? শস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে সিক্ত করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইহা স্থাণু, অচল, সর্ব্বব্যাপী, সনাতন। ইহা শরীরাদির ন্যায় ব্যক্ত নহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর

নহে—তবে ইহা সকল ব্যক্ত বস্তু অপেক্ষা বড়। চিন্তার দ্বারা ইহাকে ধরা যায় না—তবে ইহা সকল মন অপেক্ষা বড়। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ইহার বিকার হয় না, পরিবর্ত্তন হয় না—ইহা দেহ, মন, প্রাণের পরিবর্ত্তনের অতীত—তবে ইহা সেই **সত্য** বস্তু, এই সকল যাহাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

যদিই ইহা সত্য হয় যে আমাদের সত্ত্বা তত মহান্ নহে, তত বিরাট নহে, যদি মনে করা যায় যে আত্মা নিত্য দেহের সহিত জন্মগ্রহণ করে ও দেহের সহিত মরে—তথাপি জীবের মৃত্যুতে শোক করা উচিত নহে। কারণ আত্মার স্বপ্রকাশের জন্য জন্ম মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্মের পূর্ব্বে যে আত্মা থাকে না, তাহা নহে। জন্মের পূর্ব্বে আত্মা এরূপ অবস্থায় থাকে যাহা আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের অগোচর, অব্যক্ত—এই অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত হওয়া, ইন্দ্রিয়ের গোচর হওয়াই আত্মার জন্ম। মৃতুকালে আত্মা আবার সেই অব্যক্তাবস্থায় ফিরিয়া যায়, এই অবস্থা হইতে আবার তাহা ব্যক্ত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয়ের গোচর হয়। রোগেই মৃত্যু হউক আর যুদ্ধেই মৃত্যু হউক—মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের জড় ইন্দ্রিয় মনের যে শোক তাহা নিতান্ত অজ্ঞান, স্নায়বিক আর্ত্তনাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যখন মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করি তখন অজ্ঞানের বশে এমন লোকের জন্য শোক করি যাহাদের জন্য শোক করিবার কোন কারণই নাই—কারণ তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যায় না, তাহাদিগকে কোন ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে হয় না, বরং মৃত্যুর পরেও তাহারা থাকে এবং জীবিতাবস্থার অপেক্ষা কম সুখে থাকে না।

কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের সত্ত্বা খুবই মহান্। সকলেই সেই আত্মা, এক ব্রহ্ম—যাঁহাকে কেহ কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় বোধ করেন, কেহ

আশ্চর্য্যবৎ বলেন বা আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন। কারণ তিনি আমাদের জ্ঞানের অতীত—আমাদের সকল জ্ঞানচর্চ্চা এবং জ্ঞানীদের নিকট তত্ত্বকথা শ্রবণ সত্ত্বেও সেই পরব্রহ্মকে এ পর্য্যন্ত কোন মানব মনই স্বরূপতঃ জানিতে পারে নাই। ইনিই জগতের আবরণের আড়ালে লুক্কায়িত রহিয়াছেন, ইনিই শরীরের প্রভু—সমস্ত জীবন ইহারই ছায়া মাত্র। আত্মার শারীরিক মূর্ত্তি গ্রহণ এবং মৃত্যুর দ্বারা এই অবস্থা পরিত্যাগ—এ সকল তাঁহারই একটি সামান্য লীলা। যখন আমরা নিজদিগকে এই ভাবে জানিব তখন নিজদিগকে হন্তা বা হত বলার কোন অর্থই থাকিবে না। মানব-আত্মা জন্ম ও মৃত্যুরূপ অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। মাঝে মাঝে পরলোকে বিশ্রাম করিতেছে, আবার ইহলোকের সুখ দুঃখ, যুদ্ধ দ্বন্দ্ব, জয় পরাজয়কে উন্নতিরই সহায় করিয়া ক্রমশঃ অমরত্বের দিকেই অগ্রসর হইতেছে—ইহা সেই পরব্রহ্মেরই লীলা, তাঁহারই অভিব্যক্তি। ইহাই একমাত্র প্রকৃত সত্য, জীবনে আমাদিগকে এই সত্য উপলব্ধি করিতে হইবে, এই পরম সত্যের আলোকেই আমাদের জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

তাই গুরু বলিলেন—হে ভারত, এই বৃথা শোক ও ক্লৈব্য পরিহার করিয়া যুদ্ধ কর। কিন্তু যুদ্ধ করিবার কথা কেমন করিয়া আসিল? আমরা যদি এই উচ্চ, মহান্ জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, মন ও আত্মার কঠোর সংযমের দ্বারা চিত্তের আবেগ ও ইন্দ্রিয়ের প্রতারণার উপরে উঠিয়া প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি—তাহা হইলে অবশ্য আমরা শোক ও মোহ হইতে মুক্ত হইতে পারি। তাহা হইলে আমাদের মৃত্যুভয় এবং মৃত ব্যক্তির জন্য শোক দূর হইতে পারে। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে যাহাদিগকে আমরা মৃত বলি তাহারা বাস্তবিক মরে নাই

এবং তাহাদের জন্য শোক করিবার কিছু নাই কারণ তাহারা কেবল ইহলোকই ছাড়িয়া গিয়াছে। উক্ত জ্ঞানের অধিকারী হইলে আমরা জীবনের ভীষণ দ্বন্দ্বে অবিচলিত থাকিতে পারি এবং দেহের মৃত্যুকে তুচ্ছ বলিয়া বুঝিতে পারি। জীবনের সমস্ত ঘটনাই সেই এক ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি এবং সেই এক ব্রহ্মের সহিত আমাদের একত্ব অনুভব করিবারই উপায় মাত্র বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু তাই বলিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকাণ্ড করিতে বলা হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে অর্জ্জুনকে যে পথে চলিতে হইবে তাহাতে এই যুদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করাই আবশ্যক। তাঁহার স্বধর্ম্ম, তাঁহার সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করিতে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে। এই সংসার জড়-জগতে ব্রহ্মেরই আত্মপ্রকাশ—ইহা শুধু আভ্যন্তরীণ ক্রমবিকাশেরই ব্যাপার নহে, এখানে জীবনের বাহ্যিক ঘটনাগুলিকেও উক্ত ক্রমবিকাশের সহায় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্য পরস্পরকে সাহায্যও করিতে হইবে; আবার পরস্পরের সহিত যুদ্ধও করিতে হইবে। এখানে নিশ্চিন্ত মনে শান্তির সহিত, সহজ সুখ ও সোয়াস্তির ভিতর দিয়া কেহই অগ্রসর হইতে পারে না—এখানে একটি পদ অগ্রসর হইতে হইলেও বীরের মত চেষ্টা করিতে হয়, বাধা বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। যাহারা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়বিধ দ্বন্দ্বেই প্রবৃত্ত হয়—এমন কি বাহ্যিক দ্বন্দ্বের চরম স্বরূপ যুদ্ধ কার্য্যেও প্রবৃত্ত হয়—তাহারাই ক্ষত্রিয়, তাহারাই বীরপুরুষ; যুদ্ধ, বল, উচ্চহৃদয়তা, সাহস তাহাদের স্বভাব; ন্যায়ের রক্ষা এবং যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, নিশ্চিত মরণ জানিয়াও পলায়ন না করাই তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের কর্ত্তব্য। কারণ এই সংসারে ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের, ন্যায়ের সহিত অন্যায়ের, আততায়ী ও অত্যাচারীর সহিত রক্ষাকর্ত্তার দ্বন্দ্ব

অনবরতই চলিতেছে এবং এই দ্বন্দ্ব পরিণামে যখন বাহ্য যুদ্ধে আসিয়া দাঁড়ায় তখন যিনি ধর্ম্মপক্ষের নায়ক হইয়া ধর্ম্মের ধ্বজা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন তাঁহার ভীষণ ও কঠোর কর্ত্তব্যের সম্মুখে কম্পিত হওয়া চলিবেই না। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার অনুচর ও সঙ্গীগণকে পরিত্যাগ করা, নিজপক্ষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, যুদ্ধের ভীষণতা ও নৃশংসতার জন্য ক্ষুদ্র দৌর্ব্বল্য, কার্পণ্যের বশে ধর্ম্ম ও ন্যায়ের ধ্বজা ধুল্যবলুণ্ঠিত হইতে দেওয়া, আততায়ীর রক্তমাখা পদে দলিত হইতে দেওয়া কিছুতেই চলিবে না। যুদ্ধ পরিত্যাগ নহে, যুদ্ধ করাই তাঁহার ধর্ম্ম, তাঁহার কর্ত্তব্য। হত্যা করিলে নহে, হত্যা না করিলেই এখানে পাপ হইবে।

অর্জ্জুন দুঃখ করিতেছিলেন যে মানুষ যাহার জন্য, যে সকল উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করে, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে সে সকল ব্যর্থ হইবে, তাঁহার জীবন বাস্তবিক শূন্য হইয়া যাইবে। ভগবান ক্ষণিকের জন্য আর এক দিক দিয়া এই দুঃখের উত্তর দিলেন। ক্ষত্রিয় জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, প্রকৃত সুখ কি? নিজের ও পরিবারবর্গের সুখ স্বচ্ছন্দতা নহে, আত্মীয়বন্ধু সহ আরাম ও শান্তিসুখময় জীবনযাপন নহে—ক্ষত্রিয় জীবনের প্রধান সুখ হইতেছে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত জীবন দেওয়া অথবা যুদ্ধ জয় করিয়া বীরের মুকুট অর্জ্জন করা এবং বীরোচিত গৌরবের সহিত জীবন যাপন করা। "ধর্ম্ম যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর কিছুতেই শ্রেয়ঃ নাই, স্বর্গের মুক্ত দ্বার স্বরূপ এইরূপ যুদ্ধ আপনা হইতেই যে সকল ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হয় তাহারাই সুখী। যদ্যপি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে তোমার কর্ত্তব্য, স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি ত্যাগ করা হইবে এবং তোমার পাপ সঞ্চয় করা হইবে। এইরূপ যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলে যাহারা তোমার সম্মান

করিতেন ও তোমার বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন, তাঁহারা সকলে তোমাকে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা ও উপহাস করিবেন।" ক্ষত্রিয় জীবনে ইহা অপেক্ষা বড় দুঃখ আর কিছু নাই—ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও অনেক শ্রেয়ঃ। যুদ্ধ, সাহস, শক্তি, প্রভুত্ব, বীরের গৌরব, সম্মুখ যুদ্ধে মরিয়া স্বর্গলাভ—ইহাই ক্ষত্রিয়ের আদর্শ। এই আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা, এই গৌরবকে কলঙ্কিত করা, বীরশ্রেষ্ঠের জীবনে এরূপ কাপুরুষতা ও দুর্ব্বলতার দৃষ্টান্ত দেখান এবং এইরূপে মানুষের নৈতিক জীবনের আদর্শকে ছোট করা—ইহাতে নিজের অকল্যাণ করা হয়, জগতেরও অকল্যাণ করা হয়। "যদি হত হও, স্বর্গে যাইবে, যদি জয়ী হও, পৃথিবী ভোগ করিবে—অতএব, হে কুন্তিপুত্র! যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হও, উঠ।"

পূর্ব্বে যে সুখদুঃখে অবিচলিত থাকার কথা, ধীরতার কথা বলা হইয়াছে এবং পরেও যে গভীরতর আধ্যাত্মিকতার কথা বলা হইবে, সেই দুইয়ের তুলনায় ভগবানের এই বীরোচিত অভিভাষণ খুব নিম্নস্তরের বলিযাই মনে হয়। কারণ পরের শ্লোকেই ভগবান অর্জ্জুনকে আদেশ করিলেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥২।৩৮

—"সুখ দুঃখ, লাভালাভ এবং জয় পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থে উদ্‌যুক্ত হও, তাহা হইলে পাপ প্রাপ্ত হইবে না।" ইহাই গীতার প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল সময়েই অধিকারী ভেদ স্বীকার করিয়াছে—মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ কার্য্যতঃ আবশ্যক। ক্ষত্রিয়ের আদর্শ, চারিবর্ণের আদর্শ—ভগবান ইহার সামাজিক দিকটাই

এইখানে বুঝাইয়াছেন—ইহার ভিতরে যে গূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ আছে তাহা পরে দেখাইবেন। ভগবান বলিলেন, যদি তুমি সুখ দুঃখের হিসাব করিয়া, কর্ম্মের ফলাফল হিসাব করিয়াই কর্ম্ম করিতে চাও তাহা হইলে মোটের উপর তোমার প্রতি ইহাই আমার উত্তর—মরিলে স্বর্গে যাইবে ইত্যাদি। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে উচ্চজ্ঞান কোন্ পথ দেখায়। এখন তোমাকে বুঝাইলাম যে তোমার সামাজিক কর্ত্তব্য, তোমার বর্ণের নৈতিক আদর্শ তোমাকে কি পথ দেখায়—স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য। তুমি যে দিক দিয়াই আলোচনা কর, ফল একই হইবে। কিন্তু, যদি তোমার সামাজিক কর্ত্তব্যে, তোমার বর্ণের ধর্ম্মে তুমি তৃপ্ত না হও, যদি তোমার মনে হয় যে ইহা তোমাকে দুঃখে ফেলিবে, পাপে ফেলিবে তাহা হইলে তুমি আরও উচ্চ আদর্শ অবলম্বন কর, নিম্নে নামিও না। তোমার ভিতর হইতে সমস্ত অহমিকা দূর করিয়া দাও, সুখ দুঃখ তুচ্ছ কর, লাভ অলাভ ও সমস্ত পার্থিব ফলাফল তুচ্ছ কর। তোমাকে কোন্ পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে, ভগবানের আদেশে কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে শুধু তাহাই দেখ—"নৈবং পাপমবাপ্স্যসি" তাহা হইলে পাপ প্রাপ্ত হইবে না। এইরূপে অর্জ্জুনের দুঃখের যুক্তি, হত্যা-বিমুখতার যুক্তি, পাপবোধের যুক্তি, তাহার কর্ম্মের অশুভ ফলের যুক্তি—সকল যুক্তিরই তৎকালীন আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও নৈতিক আদর্শ অনুসারেই উত্তর দেওয়া হইল।

ইহাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বলে—"ভগবানকে জান, নিজেকে জান, মানুষকে সাহায্য কর। ধর্ম্মকে, ন্যায়কে রক্ষা কর, ভয় ও দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া অবিচলিত ভাবে সংসারে তোমার যুদ্ধের কার্য্য সম্পন্ন কর। তুমিই সেই অনন্ত অবিনাশী আত্মা, তোমার আত্মা

অমরত্ব লাভের পথেই সংসারে আসিয়াছে ; জীবন মৃত্যু কিছু নয়, দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা কিছু নয়, কারণ এই সকলকে জয় করিতে হইবে, ইহাদের উপরে উঠিতে হইবে। তোমার নিজের সুখ, নিজের লাভের দিকে তাকাইও না, কিন্তু, উপর দিকে এবং চারিদিকে চাহিয়া দেখ—উপরে ঐ যে উজ্জ্বল চূড়ার দিকে তুমি উঠিতেছ ঐদিকে দৃষ্টি রাখ, তোমার চারিদিকে এই যুদ্ধ ও পরীক্ষার ক্ষেত্র, সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ কেমন সেখানে শুভ অশুভ, উন্নতি অবনতি পরস্পরের সহিত নির্ম্মম ভাবে দ্বন্দ্ব করিতেছে। মানুষ তোমাকে সাহায্যের জন্য ডাকিতেছে—বলিতেছে তুমি তাহাদের শক্তিমান পুরুষ, তুমি তাহাদের সহায়, অতএব, তাহা-দিগকে সাহায্য কর, যুদ্ধ কর। যদি জগতের উন্নতির জন্যই ধ্বংসকার্য্য আবশ্যক হয় তবে ধ্বংস কর—কিন্তু যাহাদিগকে ধ্বংস করিবে তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না, যাহারা ধ্বংস হইবে তাহাদের জন্য শোক করিও না। সকল স্থানেই সেই এক সত্য বস্তুকে জানিও—জানিও সকল আত্মাই অমর এবং এই দেহ শুধু ধূলা। শান্তি, শক্তি, সমতার সহিত তোমার কার্য্য কর। যুদ্ধ কর, বীরের মত পতিত হও কিম্বা বীরের মত জয়লাভ কর। কারণ, ভগবান এবং তোমার প্রকৃতি তোমাকে এই কার্য্যই সম্পাদন করিতে দিয়াছেন।”

অষ্টম অধ্যায়

সাংখ্য ও যোগ

ভগবান অর্জ্জুনের সমস্যার এই প্রথম সংক্ষিপ্ত উত্তর সারিয়া প্রথমেই সাংখ্য ও যোগের প্রভেদ করিলেন—

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥২।৩৯

—"সাংখ্যে তোমাকে এই জ্ঞান কথিত হইয়াছে। এখন যোগে এই জ্ঞান কিরূপ তাহা শ্রবণ কর। হে পার্থ, এই জ্ঞান সহকারে যদি তুমি যোগে থাক তাহা হইলে তুমি কর্ম্মবন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে।"

যে পরমার্থদর্শন গীতা শাস্ত্রের প্রকৃত প্রতিপাদ্য এই শ্লোকোক্ত প্রভেদে তাহার মূলসূত্র নিহত রহিয়াছে এবং গীতার্থ বুঝিতে হইলে এইরূপ প্রভেদ একান্ত প্রয়োজন।

গীতা মূলতঃ বৈদান্তিক গ্রন্থ। বেদান্ত জ্ঞান সম্বন্ধে যে তিনটি গ্রন্থ প্রামাণ্য বলিয়া পরিচিত, গীতা তাহার মধ্যে একটি। সত্যের উপর গীতা শিক্ষার ভিত্তি হইলেও—গীতা আপ্তবাক্য নহে, অর্থাৎ ঋষিগণের যোগদৃষ্টিতে সত্য যেরূপ প্রতিভাত—গীতায় তাহা ঠিক সাক্ষাৎভাবে ব্যক্ত হয় নাই, গীতার শিক্ষা বিচার, বুদ্ধি, তর্ক, যুক্তির ভিতর দিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথাপি, গীতার উপর লোকের এরূপ শ্রদ্ধা যে ইহা প্রায় ত্রয়োদশ উপনিষদ বলিয়া গণ্য হয়। তবে গীতার বৈদান্তিক

ভাবগুলি সর্ব্বত্র বিশেষভাবে সাংখ্য ও যোগের ভাবে রঞ্জিত এবং এইরূপ সমন্বয়ই দর্শনশাস্ত্র হিসাবে গীতার বিশেষত্ব। বাস্তবিক পক্ষে গীতায় প্রধানতঃ যোগেরই ব্যবহারিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং কেবল এই ব্যবহারিক প্রণালী বুঝাইবার নিমিত্তই তত্ত্বকথার অবতারণা করা হইয়াছে। গীতা শুধুই বৈদান্তিক জ্ঞান প্রচার করে নাই, কিন্তু, একদিকে যেমন জ্ঞানেই সমস্ত কর্ম্মের পরিসমাপ্তি করিয়াছে এবং ভক্তিকেই কর্ম্মের সার ও প্রাণ বলিয়াছে তেমনি কর্ম্মকেই আবার জ্ঞান ও ভক্তির ভিত্তি করিয়াছে। আবার গীতার যোগ সাংখ্যের বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সাংখ্য হইতেই ইহার আরম্ভ এবং বরাবর ইহার অনেকটা মত ও পদ্ধতি সাংখ্যেরই অনুরূপ। তথাপি ইহা সাংখ্যকে অনেক দূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; সাংখ্যের কোন কোন মূল কথা অস্বীকার করিয়াছে এবং এইরূপে সাংখ্যের নিম্নস্তরের বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের সহিত উচ্চ ব্যাপক বৈদান্তিক সত্যের সমন্বয় করিয়াছে।

তাহা হইলে, গীতায় যে সাংখ্য ও যোগের কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি কি? আমরা এখন সাংখ্য বলিতে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা এবং যোগ বলিতে পাতঞ্জলির যোগ সূত্র বুঝি—কিন্তু গীতার সাংখ্য ও যোগ যে ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কারিকায় সাংখ্যমত যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে—অন্ততঃ সাধারণতঃ আমরা যেরূপ বুঝি, গীতার সাংখ্য সেরূপ নহে—কারণ গীতা কোথাও মুহূর্ত্তের জন্যও সৃষ্টির মূল তত্ত্বস্বরূপ বহু পুরুষ স্বীকার করে না। প্রচলিত সাংখ্যের সম্পূর্ণভাবে বিপক্ষে গীতা জোরের সহিত বলিয়াছে যে আত্মা এবং পুরুষ এক, সেই একই ঈশ্বর ও পুরুষোত্তম, এবং ঈশ্বরই এই জগতের আদি কারণ। আধুনিক ভাষায় তফাৎ করিতে গেলে—প্রচলিত সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী;

কিন্তু, গীতার সাংখ্য ঈশ্বরবাদ (theism), সর্ব্বেশ্বরবাদ (pantheism) এবং একত্ববাদের (monism) সূক্ষ্ম সমন্বয় সাধন করিয়াছে।

গীতায় যে যোগের কথা আছে তাহাও পাতঞ্জলির যোগ প্রণালী নহে। কারণ, পাতঞ্জলিতে খাঁটি রাজযোগেরই প্রণালী বিবৃত হইয়াছে—এই প্রণালীতে আভ্যন্তরীণ বৃত্তি সমূহকে সংযত করিবার বাঁধাধরা পদ্ধতি আছে, ইহাতে সুনির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ উপায় সমূহের দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তকে শান্ত করিয়া সমাধির অবস্থায় তুলিতে হয়; তাহাতে ঐহিক ও চিরন্তন উভয়বিধ ফললাভ হয়। ঐহিক ফল—জীবের জ্ঞান শক্তি বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হয়। চিরন্তন ফল—ভগবানের সহিত মিলন। কিন্তু গীতার যোগ উদার, নানামুখী, উহা বাঁধাধরা নিয়ম প্রণালীর ভিতর সীমাবদ্ধ নহে; উহার মধ্যে নানা বিষয়ের সমাবেশ আছে এবং তাহাদেরও পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে; রাজযোগ ইহার একটি সামান্য অপ্রধান অংশ মাত্র। গীতার যোগে রাজযোগের মত কাটাছাঁটা বৈজ্ঞানিক স্তরবিভাগ নাই—উহা আত্মার সহজ স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ প্রণালী। কি ভাবে আমরা কর্ম্ম করিব এই সম্বন্ধে কয়েকটি নীতি অনুসরণ করিয়া—সমস্ত আধারের রূপান্তর সাধন করিতে হইবে,—আধারের প্রত্যেক অঙ্গকে পুরাতন প্রাকৃত সত্তা ও সংস্কার (প্রকৃতির নীচের স্তরের খেলা বা প্রাকৃত জীবন) হইতে মুক্ত করিয়া অভিনব দিব্য ধর্ম্মে গড়িয়া তুলিতে হইবে; অপরা প্রকৃতি ছাড়াইয়া উঠিয়া পরা প্রকৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে —ইহাই গীতার যোগের লক্ষ্য। অতএব, পাতঞ্জলিতে যে যৌগিক অবস্থার কথা বলা হইয়াছে—গীতার সমাধি তাহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। পাতঞ্জলির মতে শুধু প্রথমাবস্থাতে চিত্তশুদ্ধির জন্য এবং একাগ্রতা লাভের জন্যই কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু, গীতা কর্ম্মকেই যোগের বিশেষ লক্ষণ

পর্য্যন্ত বলিয়াছে। পাতঞ্জলির মতে কর্ম্ম শুধু যোগের উপক্রমণিকা—গীতার মতে কর্ম্মই যোগের স্থায়ী ভিত্তি। রাজযোগানুসারে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে কর্ম্মকে বস্তুতঃ পরিত্যাগই করিতে হয় অন্ততঃ শীঘ্রই যোগের উপায় স্বরূপ কর্ম্মের কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকে না। গীতার মতে কর্ম্মই সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় উঠিবার একটি উপায় এবং আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তি হইবার পরও কর্ম্ম থাকে।

এতটুকু বলা দরকার, কারণ সুপরিচিত কথাগুলি প্রচলিত পারিভাবিক অর্থে ব্যবহার না করিয়া, ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিলে ভাবার্থ বুঝিতে গোলমাল হওয়া সম্ভব। তবে, প্রচলিত সাংখ্য ও যোগ দর্শনের মধ্যে যাহা কিছু উদার, সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক সত্য আছে গীতায় তাহা স্বীকৃত হইয়াছে—যদিও গীতা শুধু ইহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। উপনিষদের বৈদান্তিক সমন্বয়ে এবং পরবর্ত্তী পুরাণে আমরা যে উদার বৈদান্তিক সাংখ্যমতের পরিচয় পাই, গীতার সাংখ্য তাহাই। প্রধানতঃ অন্তর্মুখী সাধনার দ্বারা আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া আত্মার দর্শন ও ভগবানের সহিত মিলনের যে সাধনা তাহাই গীতার যোগ—রাজযোগ গীতার এই উদার সাধনার একটি বিশেষ পদ্ধতি মাত্র। গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে সাংখ্য ও যোগ দুইটি বিভিন্ন, সামঞ্জস্যহীন, পরস্পর বিরোধী মতবাদ নহে—তাহাদের মূল নীতি ও লক্ষ্য এক। শুধু তাহাদের পদ্ধতি ও আরম্ভ বিভিন্ন। সাংখ্যও এক প্রকার যোগ—তবে ইহার আরম্ভ জ্ঞানে; অর্থাৎ সাংখ্য মতে বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্ব সমূহ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়া আরম্ভ করিতে হয় এবং সত্যকে দর্শন করিয়া, লাভ করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অপর দিকে, যোগের আরম্ভ কর্ম্মে, মূলতঃ ইহা কর্ম্মযোগ। তবে গীতার সমগ্র শিক্ষা হইতে এবং পরে কর্ম্ম শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা

হইতে বেশ বুঝা যায় যে কর্ম্ম শব্দটী খুব বিস্তৃত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আমার ভিতরে ও বাহিরে যে সকল ক্রিয়া হইতেছে সে সমস্ত সর্ব্বকর্ম্মের ঈশ্বরকে নিঃস্বার্থভাবে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা, যজ্ঞ ও তপস্যা সকলের ভোক্তা ও প্রভু স্বরূপ ভগবানের নিকট সমর্পণ করা—ইহাই যোগ। জ্ঞানের দ্বারা যে সত্য দেখা যায় তাহার সাধন করাই যোগ—এবং এই জ্ঞানের দ্বারা যাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানা যায় তাহার প্রতি জ্ঞানসম্ভূত ভক্তি ও শান্ত বা আবেগপূর্ণ আত্মসমর্পণই ঐ সাধনের পরিচালক শক্তি।

কিন্তু, সাংখ্যের সত্য কি? তত্ত্বসমূহের বিশ্লেষণ ও সংখ্যা করিয়াছে বলিয়া এই দর্শনের নাম সাংখ্য দর্শন হইয়াছে। সাধারণতঃ আমরা জগৎকে যেরূপ দেখি তাহা নানা তত্ত্বের সংযোগের ফল—সাংখ্য এই তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে দেখাইয়াছে এবং তাহাদের গণনা করিয়াছে। সাংখ্য বিশ্লেসণ করিয়াছে বটে কিন্তু সমন্বয় করিতে মোটেই চেষ্টা করে নাই। মূলতঃ সাংখ্য দ্বৈতবাদী। বৈদান্তিকদের মধ্যে যাঁহারা নিজদিগকে দ্বৈতবাদী বলেন, সেরূপ বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ সাংখ্যের মত নহে। সাংখ্যের মত সম্পূর্ণভাবে দ্বৈত অর্থাৎ সাংখ্য সৃষ্টির মূলে একটি নহে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুইটী তত্ত্ব স্বীকার করে—নিষ্ক্রিয় পুরুষ এবং ক্রিয়াশীলা প্রকৃতি। তাহাদের সংযোগেই জগতের উৎপত্তি। পুরুষই আত্মা; আত্মা বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় পুরুষ তাহা নহে—পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্যময়, অচল, অবিকারী, স্বপ্রকাশ। শক্তি এবং তাহার ক্রিয়াই প্রকৃতি। পুরুষ কিছুই করে না—শুধু শক্তি এবং তাহার ক্রিয়া পুরুষে প্রতিফলিত হয়; প্রকৃতি বস্তুতঃ জড় অচেতন হইলেও পুরুষে প্রতিফলিত হওয়ায় প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হয়। এইরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, জন্ম জীবন ও মৃত্যু, চৈতন্য ও অচৈতন্য, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান, বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ও অজ্ঞান, কর্ম্ম ও

অকর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ এই সকল ব্যাপারের উদ্ভব হয় এবং প্রকৃতির প্রভাবের অধীন পুরুষ এই সকলকে তাহার নিজের বলিয়া ধরে কিন্তু বাস্তবিক এই সকল মোটেই পুরুষের নহে, এই সব শুধু প্রকৃতিরই ক্রিয়া।

কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী—প্রকৃতির শক্তি মূলতঃ তিন প্রকার। সত্ত্ব: জ্ঞানের বীজ—ইহা স্থিতি করে; রজঃ: তেজ ও কর্ম্মের বীজ—ইহা সৃষ্টি করে; তমঃ: জড়তা ও অজ্ঞানের বীজ এবং সত্ত্ব ও রজের বিরোধী—সত্ত্ব ও রজঃ যাহা সৃষ্টি ও স্থিতি করে, তমঃ তাহা লয় সাধন করে। যখন প্রকৃতির এই তিনটী গুণ সমান বলে বলী হইয়া সাম্যাবস্থায় থাকে—তখন সব স্থির—তখন কোন গতি, ক্রিয়া বা সৃষ্টি থাকে না; অতএব তখন অবিকারী জ্যোতির্ম্ময় চেতন আত্মায় প্রতিফলিত হইবার কিছু থাকে না। কিন্তু যখন এই সাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটে, তখন তিনটী গুণ অসমান হইয়া পরস্পরের সহিত বিরোধ করে এবং তখন অনবরত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ব্যাপার চলিতে থাকে—বিশ্বজগতের অভিব্যক্তি হয়। এই সকল ব্যাপারে পুরুষেব সনাতন স্বরূপকে ঢাকিয়া রাখে। যতদিন পুরুষ ইহা চায় এবং নিজকে প্রকৃতির গুণসম্পন্ন দেখে ততদিনই এইরূপ বিচ্যুতি থাকে, এই সকল ব্যাপার চলিতে থাকে। কিন্তু যখনই পুরুষ আর এ সবে সম্মতি দেয় না—তখনই গুণত্রয় সাম্যাবস্থা লাভ করে, তখনই আত্মা তাহার সনাতন, অপরিণামী, অচল অবস্থায় ফিরিয়া আসে, আত্মার মুক্তি হয়। এইরূপে প্রকৃতির খেলা প্রতিবিম্বিত করা এবং সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়া—শুধু এইটুকুই পুরুষের ক্ষমতা বলিয়া মনে হয়। সাংখ্যের পুরুষ শুধু প্রতিফলনের জন্য দেখিতে পারে এবং অনুমতি দিতে পারে—গীতার ভাষায় সাক্ষী ও অনুমন্তা—কিন্তু ঈশ্বররূপে কর্ম্ম করে না। এমন কি পুরুষের যে অনুমতি দেওয়া বা অনুমতি প্রত্যাহার করা তাহাও ঠিক

পুরুষের কার্য্য নহে—প্রকৃতিই করাইয়া দেয়। বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ কোন কর্ম্মই পুরুষের নাই—তাহার কার্য্যকরী ইচ্ছা নাই, কার্য্যকরী বুদ্ধি নাই। অতএব শুধু পুরুষ একা এই জগতের কারণ হইতে পারে না—দ্বিতীয় কারণ দেখান আবশ্যক। জ্ঞান, ইচ্ছা ও আনন্দের আধার আত্মা একা এই জগতের কর্ত্তা নহে—আত্মা ও প্রকৃতি, নিষ্ক্রিয় চৈতন্য এবং ক্রিয়াশীলা শক্তি এই যুগ্ম কারণ হইতেই জগতের উৎপত্তি। সাংখ্য এই ভাবেই জগতের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছে।

কিন্তু তাহা হইলে আমরা যে চিন্তা করিতেছি, বিচার করিতেছি বলিয়া বুঝিতে পারি, সঙ্কল্প করিতেছি বলিয়া বুঝিতে পারি এসব কোথা হইতে হয়? এগুলি ত আমাদের জীবনের কম অংশ নহে। সাধারণতঃ আমরা মনে করি এগুলি প্রকৃতির নহে, এগুলি পুরুষের। সাংখ্যমতানুসারে এই বিচার বুদ্ধি ও ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে জড়প্রকৃতিরই অংশ—এগুলি আত্মার গুণ নহে। সাংখ্য যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের দ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছে—এগুলি তাহার মধ্যে একটি তত্ত্ব—বুদ্ধি। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই জগতের মূল উপাদান। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। সৃষ্টিকালে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ক্রমান্বয়ে জড়জগতের উপাদানস্বরূপ পঞ্চ মহাভূতের আবির্ভাব হয়। এই পঞ্চ স্থূলভূত প্রাচীন শাস্ত্রে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও পৃথিবী এই সকল নামে অভিহিত। তবে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বর্ত্তমানকালে জড়বিজ্ঞান উপাদান (elements) বলিতে যাহা বুঝে, এই পঞ্চভূত সেরূপ উপাদান নহে—ইহারা জড়শক্তির পাঁচটি সূক্ষ্ম অবস্থা এই স্থূল জড়জগতে ইহারা কোথাও খাঁটি অবস্থায় নাই। জগতের সমস্ত পদার্থই এই পাঁচটি সূক্ষ্ম অবস্থা বা উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত। আবার পাঁচটির প্রত্যেকটিই জড়শক্তির, একটি সূক্ষ্ম গুণের আধার, শব্দ, স্পর্শ,

রূপ, রস গন্ধ। মন এই পাঁচ প্রকারেই বাহ্যিক জগতের বস্তু সকলকে গ্রহণ করে। অতএব, মূল প্রকৃতি হইতেই আবির্ভূত এই পঞ্চ মহাভূত এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা—এইগুলি হইতেই বাহ্যদৃশ্য জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে।

অন্য ত্রয়োদশটি তত্ত্ব লইয়া অন্তর্জগৎ গঠিত—বুদ্ধি বা মহৎ, অহঙ্কার, মন এবং ইহার অধীনে দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন আদি ইন্দ্রিয়—মনই বাহ্যবস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করে, মনই তাহাদের উপর কার্য্য করে। কারণ, মনের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী দুই রকম ক্রিয়াই রহিয়াছে। মন প্রত্যক্ষের দ্বারা বাহ্য স্পর্শ গ্রহণ করিয়া জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে এবং বাহ্য জগতের উপর ক্রিয়ার জন্য শরীর যন্ত্রকে পরিচালিত করে। কিন্তু, মন বিশেষ বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের বিশেষ করে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শকে গ্রহণ করে। মন সেইরূপ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রয়োজনীয় শারীরিক ক্রিয়ার বিশেষ করে। প্রকৃতির যে শক্তি বিচার করে, ভেদ ও সামঞ্জস্য নির্ণয় করে তাহারই নাম **বুদ্ধি**—ইহা একাধারে বোধশক্তি ও ইচ্ছা-শক্তি। বুদ্ধির যে তত্ত্বের দ্বারা পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সহিত এক বলিয়া ধরিয়া লয়, প্রকৃতির কার্য্যাবলীকে নিজের কার্য্যাবলী বলিয়া মনে করে তাহারই নাম অহঙ্কার। কিন্তু, এই সকল (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) আভ্যন্তরিক তত্ত্ব (Subjective principles) নিজেরা জড়, অচেতন—বাহ্যিক জগতের কার্য্যাবলী যেরূপ অচেতন প্রাকৃতিক শক্তির অন্তর্গত, ইহারাও ঠিক সেইরূপ। বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছা (এই দুইকেই সাংখ্যে বুদ্ধি বলা হইয়াছে) কেমন করিয়া জড় অচেতনের ক্রিয়া হইতে পারে, নিজেরা জড়

হইতে পারে ইহা বুঝিতে যদি আমাদের কষ্ট হয় তাহা হইলে আমাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে বর্ত্তমান বিজ্ঞানও (Science) এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। এমন কি পরমাণুর (atom) জড়ক্রিয়াতে যে শক্তি রহিয়াছে তাহাকেও অচেতন ইচ্ছাশক্তি বলা যাইতে পারে এবং প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত ঘটনায় ঐ সর্ব্বব্যাপী ইচ্ছা অচেতনভাবেই বুদ্ধির কার্য্য করিতেছে। জড় জগতের সকল কার্য্যে যে ভেদাভেদ নির্ণয় অচেতন ভাবে চলিতেছে—সেই ক্রিয়া এবং যাহাকে আমরা মানসিক বুদ্ধির ক্রিয়া বলি তাহা মূলতঃ একই জিনিষ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে সচেতন মন অচেতন জড়ের ক্রিয়ারই পরিণাম ফল। কিন্তু জড় অচেতন কেমন করিয়া চেতনের মত হয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই, সাংখ্য তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছে। পুরুষের ভিতর প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হওয়াতেই এরূপ হইয়া থাকে, আত্মার চৈতন্য জড়-প্রকৃতির ক্রিয়ার উপর আরোপিত হয়। এইরূপে সাক্ষীস্বরূপ পুরুষ নিজেকে ভুলিয়া যায়—প্রকৃতির চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা, পুরুষের নিজের বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু, বস্তুতঃ এই সব চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, ক্রিয়া প্রকৃতি এবং তাহার তিন গুণের দ্বারাই সংঘটিত হয়—মোটেই পুরুষের দ্বারা নহে। এই ভ্রম হইতে পরিত্রাণ লাভই প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্য হইতে পুরুষের মুক্তি লাভের প্রথম সোপান।

সংসারে অবশ্য অনেক জিনিষ রহিয়াছে সাংখ্য যাহা আদৌ ব্যাখ্যা করে নাই অথবা সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করে নাই। কিন্তু, আমরা যদি সৃষ্টিতত্ত্বের এমন যুক্তিযুক্ত কোন ব্যাখ্যা চাই যাহা অবলম্বন করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির বন্ধন হইতে আত্মা মুক্তি লাভ করিতে পারে (এরূপ মুক্তিই প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য) তাহা হইলে সাংখ্য যে ব্যাখ্যা

দিয়াছে এবং মুক্তির যে পথ দেখাইয়া দিয়াছে তাহা অন্য কিছু হইতে কম সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। সাংখ্যের যেটা আমরা সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারি না সেটা হইতেছে ইহার বহুপুরুষবাদ। মনে হয় এক পুরুষ এবং এক প্রকৃতি ধরিলেই সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। কিন্তু সাংখ্য বস্তুতত্ত্ব যেরূপ বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছে তাহাতে বহুপুরুষমত না আনিলে আর উপায় ছিল না। প্রথমতঃ বাস্তবিক আমরা দেখি যে জগতে অনেক সচেতন জীব রহিয়াছে এবং প্রত্যেকেই জগৎকে আপন আপন ধারা অনুসারে অবলোকন করে—অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ অন্যলোকের নিকট যেরূপ তাহার নিকট সেরূপ নহে—প্রত্যেকেই জগৎকে স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যক্ষ করে, জগতের উপর স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করে। পুরুষ যদি একটি মাত্র হইত তাহা হইলে এই স্বাতন্ত্র্য ও প্রভেদ থাকিত না—সকলেই জগৎকে একভাবে দেখিত, সকলেরই নিকট অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ একই রূপে প্রতিভাত হইত। সকলে এক জগৎই প্রত্যক্ষ করিতেছে—কারণ, প্রকৃতি এবং প্রকৃতির যে সকল তত্ত্ব লইয়া অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ গঠিত সেগুলি সকলের পক্ষে সমান। কিন্তু জগৎকে লোকে যেরূপ দেখে, জগৎ সম্বন্ধে লোকের যেরূপ ধারণা, জগতের প্রতি লোকের যেরূপ ভাব—লোকের অনুভূতি ও কর্ম্ম অসংখ্য রকমের। ("যদি পুরুষ বহু না হইয়া এক হইত, তবে একজন সুখী হইলে সকলে সুখী হইত, একজন দুঃখী হইলে সকলে দুঃখী হইত, একজনের মোহ হইলে সকলের মোহ হইত। যখন এরূপ হয় না, তখন বহুপুরুষ সিদ্ধ হইতেছে" তত্ত্বসমাসবৃত্তি) এই সকল ভেদ ও বিভিন্নতা অবলোকনকারীর, প্রাকৃতিক কার্য্যাবলীর নহে, কারণ প্রকৃতি এক। বহু পুরুষ, বহু সাক্ষী বা দ্রষ্টা না মানিলে এই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা ব্যাখ্যা

করা অসম্ভব। বলিতে পারা যায় বটে জীবের অহং জ্ঞানই প্রত্যেককে প্রত্যেকের সহিত বিভিন্ন করিতেছে কিন্তু অহঙ্কার প্রকৃতির সাধারণ তত্ত্ব এবং ইহা বিভিন্ন হইবার কোন কারণ নাই। কারণ শুধু অহঙ্কার পুরুষের কেবল এই ভ্রম করাইয়া দেয় যে সে প্রকৃতির সহিত এক অভিন্ন। যদি পুরুষ একমাত্র হয় তাহা হইলে সকল জীবই এক হইবে। তাহাদের বাহ্যিক আকার প্রকার যতই বিভিন্ন হউক অহংজ্ঞানে সকলেই সমান হইবে, আত্মার দৃষ্টিতে, আত্মার বাহ্যজ্ঞানে কোন প্রভেদ থাকিবে না। প্রকৃতির মধ্যে যতই বৈচিত্র্য থাকুক, পুরুষ যদি এক হয়, সাক্ষী যদি এক হয় তাহা হইলে জগৎ সম্বন্ধে ধারণাও একরূপ হইবে। যে প্রাচীন বৈদান্তিক জ্ঞান হইতে সাংখ্যের উৎপত্তি তাহা হইতে বিচ্যুত হওয়ায় খাঁটি সাংখ্য বহুপুরুষ স্বীকার করিতে ন্যায়তঃ (Logically) বাধ্য। এক পুরুষ এবং এক প্রকৃতির সঙ্গ হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় বুঝান যাইতে পারে কিন্তু জগতে জীবের মধ্যে এত প্রভেদ কিরূপে হয় তাহা বুঝান যায় না।

বহুপুরুষ স্বীকার না করায় আরও একটি বিষম বাধা আছে। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় সাংখ্য দর্শনেরও উদ্দেশ্য মুক্তি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রকৃতি পুরুষের আনন্দের জন্য যে সকল ক্রিয়া করিতেছে পুরুষ যখন তাহা হইতে তাহার অনুমতি প্রত্যাহার করিয়া লয় তখনই মোক্ষ লাভ হয়; কিন্তু, বস্তুতঃ ইহা কথা বলিবার একটা ধারা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ নিষ্ক্রিয়—অনুমতি দেওয়া বা প্রত্যাহার করা কার্য্য কখনও পুরুষের হইতে পারে না—ইহা নিশ্চয় প্রকৃতিরই ক্রিয়া। বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যে এই অনুমতি দেওয়া বা প্রত্যাহার করা বুদ্ধিরই ক্রিয়া। বুদ্ধির সাহায্যেই মন প্রত্যক্ষ করে, বুদ্ধি প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে ভেদ ও

সামঞ্জস্য বিচার করে, বুদ্ধি অহঙ্কারের সাহায্যে দ্রষ্টাকে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ ও কার্য্যের সহিত এক করিয়া দেয়। ভেদ বিচার করিতে করিতে বুদ্ধি এমন অবস্থায় উপস্থিত হয় যখন সে বুঝিতে পারে যে পুরুষ ও প্রকৃতির একত্ব ভ্রম। শেষে বুদ্ধি পুরুষ ও প্রকৃতিতে প্রভেদ করে এবং বুঝিতে পারে যে জগতের সমস্ত ব্যাপারই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি মাত্র। তখন বুদ্ধি (at once intelligence and will) যে মিথ্যার অবলম্বন হইয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করে—তখন পুরুষ বন্ধনমুক্ত হয় এবং মন যে জাগতিক লীলায় রস পায় তাহার সহিত পুরুষ আর নিজেকে যোগ করে না। পরিণামফল এই হইবে যে প্রকৃতি পুরুষের ভিতর নিজকে প্রতিফলিত করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিবে; কারণ, অহঙ্কারের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে এবং বুদ্ধি উদাসীন হইয়া আর প্রকৃতির কার্য্যের অনুমতির সহায় হইবে না; কাজেই, তাহার গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় পড়িতে বাধ্য হইবে, জাগতিক লীলা বন্ধ হইবে, পুরুষ তাহার অচল শান্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু, যদি শুধু একটি পুরুষই থাকিত এবং এইরূপে বুদ্ধি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া উদাসীন হইয়া পড়িত তাহা হইলে সমস্ত জগৎও শেষ হইত। আমরা দেখিতেছি যে এরূপ কিছুই হয় না। কোটি কোটি লোকের মধ্যে কয়েকজন মাত্র মুক্তি লাভ করেন বা মুক্তি পথের পথিক হ'ন—তাহাতে অবশিষ্টদের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না, এবং এইরূপ প্রত্যাখ্যানে বিশ্বলীলার যে শেষ হইবার কথা তাহা দূরে থাকুক তাহাদের সহিত লীলা করিতে বিশ্বপ্রকৃতির এতটুকুও অসুবিধা হয় না। বহু স্বতন্ত্র পুরুষ মানিয়া না লইলে ইহা ব্যাখ্যা করা যায় না। বৈদান্তিক অদ্বৈত মতানুসারে ইহার একমাত্র ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা হইতেছে মায়াবাদ; কিন্তু, এই মতানুসারে সমস্তই স্বপ্ন—বন্ধন ও মুক্তি দুইই

মিথ্যা, মায়ার ভ্রম, বস্তুতঃ, কেহই মুক্ত হয় না, কেহই বদ্ধ হয় না। সাংখ্য জগৎকে এইরূপে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায় না—তাই সাংখ্য বেদান্তের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করে না। এখানেও আমরা দেখিতেছি যে সাংখ্য যেরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছে তাহাতে বহুপুরুষ স্বীকার না করিয়া আর তাহার উপায় নাই।

সাংখ্যের এই বিশ্লেষণ লইয়াই গীতার আরম্ভ, এমন কি গীতা যে ভাবে যোগের বর্ণনা করিয়াছে তাহাতে মনে হয় গীতা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ইহা স্বীকার করিয়াছে। প্রকৃতি, তাহার তিনগুণ এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্ব গীতা স্বীকার করিয়াছে। সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতির—পুরুষ নিষ্ক্রিয়, গীতা ইহাও মানিয়া লইয়াছে। গীতা স্বীকার করিয়াছে যে জগতে বহু চেতন জীব আছে ; অহঙ্কারের নাশ, বুদ্ধির ভেদ ক্রিয়া এবং প্রকৃতির গুণত্রয়ের অতীত হওয়াই যে মুক্তির উপায় তাহা গীতা স্বীকার করিয়াছে। অর্জ্জুনকে প্রথম হইতেই যে যোগ অভ্যাস করিতে বলা হইয়াছে তাহা হইতেছে বুদ্ধিযোগ। কিন্তু একটি বিষয়ে গুরুতর তফাৎ রহিয়াছে—গীতার মতে পুরুষ এক, পুরুষ বহু নহে। কারণ গীতা যে লিখিয়াছে আত্মা মুক্ত, চেতন, অচল, সনাতন, অক্ষর—তাহা শুধু একটি কথা ছাড়া সাংখ্যের সনাতন, নিষ্ক্রিয়, অচল, অক্ষর পুরুষের বৈদান্তিক বর্ণনা। কিন্তু, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তফাৎ এই যে পুরুষ বহু নহে, পুরুষ এক। সাংখ্য বহু পুরুষ স্বীকার করিয়া যে সকল সমস্যার সমাধান করিয়াছে—ইহাতে আবার সেই সকল সমস্যা উঠে এবং তাহাদের আর একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন সমাধান প্রয়োজন হয়। গীতা বৈদান্তিক সাংখ্যের সহিত বৈদান্তিক যোগ মিলাইয়া সে সমাধান করিয়াছে।

পুরুষ সম্বন্ধে ধারণাতেই প্রথম নূতনত্ব। পুরুষের সুখের জন্য

প্রকৃতি কার্য্য করে; কিন্তু, এই সুখ নির্দ্ধারিত হয় কেমন করিয়া? খাঁটি সাংখ্যের মতে নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর উদাসীন অনুমতির দ্বারাই ইহা নির্দ্ধারিত হয়। সাক্ষী উদাসীন ভাবেই অহঙ্কার ও বুদ্ধির ক্রিয়ায় সায় দেয়, আবার সেইরূপ উদাসীন ভাবেই অহঙ্কার হইতে বুদ্ধির প্রত্যাহারেও সায় দেয়। সে দেখে, অনুমতি দেয় এবং প্রতিফলনের দ্বারা প্রকৃতির কার্য্য ধরিয়া থাকে—সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্ত্তা কিন্তু আর অধিক কিছু নহে। কিন্তু, গীতার পুরুষ প্রকৃতির অধিপতিও বটে—সে ঈশ্বর। বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতির ক্রিয়া হইলেও ইচ্ছার উৎপত্তি ও শক্তি চেতন আত্মা হইতেই—তিনিই প্রকৃতির প্রভু। ইচ্ছার বুদ্ধির কার্য্য প্রকৃতির হইলেও—পুরুষই এই বুদ্ধির উৎপত্তি-স্থান—পুরুষই সক্রিয় ভাবে এই বুদ্ধির আলোক জোগাইয়া দেন। তিনি—শুধু সাক্ষী নহেন, তিনি জ্ঞাতা ও ঈশ্বর—তিনি জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির অধিপতি। তিনিই প্রকৃতির ক্রিয়ার চরম কারণ, প্রকৃতির কার্য্য হইতে সংহরণেরও তিনি চরম কারণ। সাংখ্যের বিশ্লেষণ অনুসারে পুরুষ এবং প্রকৃতি দুই বিভিন্ন—উভয়ের সংযোগে এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, গীতার সমন্বয়কারী সাংখ্য অনুসারে পুরুষ তাঁহার প্রকৃতির সহায়ে এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন। এখন আমরা স্পষ্ট বুঝিলাম যে গীতা প্রাচীন সাংখ্যের সঙ্কীর্ণতা হইতে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে।

কিন্তু, তাহা হইলে গীতা যে অক্ষর, অচল, চিরমুক্ত এক আত্মার কথা বলিয়াছে সে সম্বন্ধে কি? সে আত্মা অবিকার্য্য, অজ, অব্যক্ত, ব্রহ্ম—অথচ তিনিই এই সকল ব্যাপিয়া আছেন, যেন সর্ব্বমিদং ততম্। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ইহার সত্তার মধ্যেই ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে; তিনি

অচল হইলেও তিনিই সমস্ত কর্ম্ম ও গতির কারণ ও অধীশ্বর। কিন্তু ইহা কেমন করিয়া হয় ? জগতে যে বহু জীব রহিয়াছে তাহারই বা কি ? তাহাদিগকে ত ঈশ্বর বলিয়া মনে হয় না—বরং বিশেষ ভাবে তাহারা ঈশ্বর নয়, অনীশ—কারণ, তাহারা গুণত্রয়ের অধীন, অহঙ্কারের, ভ্রমের অধীন। গীতা যে বলিতেছে তাহারা সকলেই এক আত্মা, তাহা হইলে এই বন্ধন, এই অধীনতা ও ভ্রম কেমন করিয়া আসিল—পুরুষকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন না বলিলে কেমন করিয়া ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে ? আর এই বহুত্বই বা কোথা হইতে ? এক শরীর ও মনের ভিতর এক আত্মা মুক্তিলাভ করিতেছে অথচ সেই এক আত্মাই অন্য শরীর মনের ভিতর মুক্তিলাভ করিতেছে না, নিজেকে বদ্ধ বলিয়া ভ্রম করিতেছে ইহাই বা কেমন করিয়া হয় ? এই সকল প্রশ্নের একটা উত্তর না দিলে চলে না।

গীতা পরে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছে, তবে সেখানে এমন সব নূতন তথ্যের অবতারণা করা হইয়াছে যাহা বৈদান্তিক যোগের অন্তর্ভুক্ত—প্রচলিত সাংখ্যের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। গীতা তিনটি পুরুষের কথা অথবা পুরুষের তিনটি অবস্থার কথা বলিয়াছে। উপনিষদ সাংখ্যতত্ত্ব বর্ণনা করিবার সময় কোথাও কোথাও কেবল দুইটি পুরুষের কথা বলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। উপনিষদের এক শ্লোকে আছে—এক ত্রিবর্ণের অজা আছে, ত্রিগুণময়ী স্ত্রীধর্ম্মী প্রকৃতি; ইহা সকল সময়েই সৃষ্টি করিতেছে; দুইটি অজ পুরুষ আছে, ইহাদের মধ্যে একজন প্রকৃতিকে ধরিয়া ভোগ করিতেছে, আর একজন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। আর এক শ্লোকে তাহাদিগকে এক বৃক্ষোপরি

দুইটী পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, উভয়ে একত্র বদ্ধ চিরসঙ্গী। তাহাদের মধ্যে একজন বৃক্ষের ফল খাইতেছে—প্রকৃতিস্থ পুরুষ প্রকৃতির লীলা উপভোগ করিতেছে; অপরটি খাইতেছে না, কিন্তু তাহার সঙ্গীকে দেখিতেছে—সে নীরব দ্রষ্টা, ভোগের মধ্যে লিপ্ত নহে। প্রথমটী যখন দ্বিতীয়কে দেখে এবং বুঝিতে পারে যে সকল মহত্ত্ব তাহারই তখন সে দুঃখ হইতে মুক্ত হয়। উক্ত দুইটি শ্লোকের উদ্দেশ্য বিভিন্ন, কিন্তু, ইহাদের মধ্যে একটি সাধারণ অর্থ নিহিত রহিয়াছে। দুইটি পক্ষীর মধ্যে একটি চিরকাল নীরব, মুক্ত আত্মা অথবা পুরুষ যাহার দ্বারা এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—তিনি তৎকর্তৃক ব্যাপ্ত এই জগৎকে দেখিতেছেন কিন্তু, তাহাতে লিপ্ত হইতেছে না; অপরটি প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধ পুরুষ। প্রথম শ্লোকটি হইতে বুঝা যায় যে দুইটি পুরুষই এক—একই চেতন জীবের দুইটি ভিন্ন অবস্থা—বদ্ধ অবস্থা ও মুক্ত অবস্থা—কারণ, শ্লোকোক্ত অজ পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে নামিয়া তাহাকে উপভোগ করিয়াছেন এবং তাহার পর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকটি হইতে যাহা বুঝা যায়—প্রথম শ্লোকে তাহা পাওয়া যায় না; দ্বিতীয় শ্লোকটি বুঝায় যে একই আত্মার উচ্চ ও নীচ দুই অবস্থা—উচ্চ অবস্থায় ইহা চিরকাল মুক্ত, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত;—কিন্তু, নিম্ন অবস্থায় ইহা প্রকৃতির মধ্যে বহু জীবরূপে অবতীর্ণ হয় এবং বিশেষ বিশেষ জীবে প্রকৃতির লীলায় বিরক্ত হইয়া সেই উচ্চ অবস্থায় ফিরিয়া যায়। একই সচেতন আত্মার এইরূপ দ্বৈত অবস্থা কল্পনা করিলে সমাধানের একটা পথ হয় বটে, কিন্তু এক কি করিয়া বহু হয় তাহা বুঝা যায় না।

উপনিষদের অন্যান্য শ্লোকের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গীতা এই দুইটির উপর আর একটি যোগ করিয়াছে—তাহা হইতেছে পুরুষোত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পুরুষ—নিখিল বিশ্ব তাঁহারই মহিমা। তাহা হইলে তিনটি হইল—ক্ষর, অক্ষর, উত্তম। ক্ষর হইতেছে সচল, পরিণামী—ক্ষর স্বভাব (স্ব-ব্রহ্ম, ভাব-উৎপত্তি; ব্রহ্মই অংশরূপে যে জীব হন তাহাকেই স্বভাব বলে)—আত্মার সেই বহুভূত, বহু জীবরূপে যে পরিণাম তাহাকেই ক্ষর বলা হইয়াছে। এই পুরুষ বহু, এখানে পুরুষ ভগবানের বহুরূপ। এই পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নহে—ইহা প্রকৃতিস্থ পুরুষ। অক্ষর হইতেছে অচল, অপরিণামী—নীরব নিষ্ক্রিয় পুরুষ—ইহা ভগবানের একরূপ, প্রকৃতির সাক্ষী কিন্তু, ইহা প্রকৃতির কার্য্যে বদ্ধ নহে; ইহা নিষ্ক্রিয় পুরুষ—প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্য হইতে এই পুরুষ মুক্ত। পরমেশ্বর, পরমব্রহ্ম, পরম-পুরুষই উত্তম—উল্লিখিত পরিণামী বহুত্ব এবং অপরিণামী একত্ব এই দুইই উত্তমের। তাঁহার প্রকৃতির, তাঁহার শক্তির বিরাট ক্রিয়ার বলে তাঁহার ইচ্ছা ও প্রভাবের বশেই তিনি নিজেকে সংসারে ব্যক্ত করিয়াছেন, আবার আরও মহান্ নীরবতা ও অচলতার দ্বারা তিনি * নিজেকে স্বতন্ত্র, নির্লিপ্ত রাখিয়াছেন; তথাপি তিনি পুরুষোত্তমরূপে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্রতা এবং প্রকৃতিতে লিপ্ততা এই দুইয়েরই উপরে। পুরুষোত্তম সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা উপনিষদে প্রায়ই সূচিত হইলেও—গীতাতেই ইহা প্রথমে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ভারতীয় ধর্ম্ম চিন্তার উপর এই ধারণা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যে সর্ব্বোত্তম ভক্তিযোগ অদ্বৈতবাদের কঠিন নিগড় ছাড়াইয়া যাইতে চায় ইহাই (অর্থাৎ পুরুষোত্তম সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাই) তাহার ভিত্তি। ভক্তিরসাত্মক পুরাণসমূহের মূলে এই পুরুষোত্তমবাদ নিহিত রহিয়াছে।

* পুরুষঃ···অক্ষরাৎ···পরাৎপরঃ—যদিও অক্ষর পরম পুরুষ তথাপি তাহা অপেক্ষাও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছে, উপনিষদে এইরূপ কথিত হইয়াছে।

গীতা শুধু সাংখ্যকৃত প্রকৃতির বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ থাকিতে সন্তুষ্ট নহে—কারণ এই বিশ্লেষণে অহঙ্কারের স্থান আছে বটে কিন্তু বহু (multiple) পুরুষের স্থান নাই। সাংখ্যে বহুপুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, প্রকৃতির অন্তর্গত নহে। গীতা সাংখ্যমতের বিরুদ্ধে বলে যে ঈশ্বর স্বীয় প্রকৃতির দ্বারা জীব হইয়াছেন। কিন্তু ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে? বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে ত মোট চতুর্বিংশতিটি তত্ত্ব রহিয়াছে? গীতায় ভগবান যাহা উত্তর দিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই—"হাঁ, সাংখ্য যেরূপ বর্ণনা করিয়াছে ত্রিগুণময়ী বিশ্বপ্রকৃতির দৃশ্য (apparent) কার্য্যাবলী ঠিকই সেইরূপ বটে ; সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতির যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছে তাহাও ঠিক এবং বন্ধনমুক্তি ও প্রত্যাহারের জন্য কার্য্যতঃ এই সাংখ্যজ্ঞানের বিশেষ উপযোগিতা আছে। কিন্তু ইহা শুধু নিম্ন অপরা প্রকৃতি—ইহা ত্রিগুণময়ী, অচেতন, দৃশ্য। ইহা অপেক্ষা উচ্চ প্রকৃতি আছে—ইহা পরা, চেতন, দৈবী প্রকৃতি এবং এই পরা প্রকৃতিই জীব (individual soul) হইয়াছে। নিম্ন প্রকৃতিতে প্রত্যেকেই অহং ভাবে প্রতিভাত, উচ্চ প্রকৃতিতে তিনি এক পুরুষ। অন্য কথায় বহুত্ব সেই একেরই আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অন্তর্গত। আমিই এই জীবাত্মা, সৃষ্টিতে ইহা আমার আংশিক প্রকাশ, মমৈবাংশ—আমার সমস্ত শক্তি ইহাতে আছে। ইহা উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, জ্ঞাতা, ঈশ্বর। ইহা নিম্ন প্রকৃতিতে অবতীর্ণ হইয়া নিজেকে কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ মনে করে এবং এইরূপে নিম্নস্তরের জীবন উপভোগ করে। ইহা প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে এবং নিজেকে সমস্ত কর্ম্ম হইতে মুক্ত নিষ্ক্রিয় পুরুষ বলিয়া জানিতে পারে। ইহা গুণত্রয়ের উপর উঠিতে পারে এবং কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াও ইহার কর্ম্ম থাকিতে পারে—আমিও এইরূপই করিয়া থাকি। ইহা

পুরুষোত্তমকে ভক্তি করিয়া এবং তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহার দৈবী প্রকৃতি উপভোগ করিতে পারে।

ইহাই গীতার বিশ্লেষণ। ইহা শুধু বাহ্যিক বিশ্বলীলায় সীমাবদ্ধ নহে, ইহা বিজ্ঞানময়ী প্রকৃতির (Superconscious Nature) উত্তম রহস্যের ভিতর প্রবেশ করিয়া বেদান্ত, সাংখ্য এবং যোগ—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি এই তিনের সমন্বয়ে ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। শুধু খাঁটি সাংখ্যের মতে কর্ম্ম ও মোক্ষ পরস্পরবিরোধী এবং ইহাদের যোগ অসম্ভব। খাঁটি অদ্বৈতবাদ অনুসারে বরাবর যোগের অঙ্গরূপে কর্ম্ম থাকিতে পারে না এবং পূর্ণ জ্ঞান, মোক্ষ ও মিলনের পর ভক্তি থাকিতে পারে না। গীতার সাংখ্যজ্ঞান এবং গীতার যোগপ্রণালী এই সকল বাধা অতিক্রম করিয়াছে।

সাধারণের ধারণা এই যে সাংখ্যদের ও যোগীদের প্রণালীদ্বয় বিভিন্ন, এমন কি পরস্পর বিরোধী। ব্যাপক বৈদান্তিক সত্যের কাঠামোর মধ্যে এই দুই দৃশ্যতঃ বিরোধী প্রণালী বা নিষ্ঠার সমন্বয় করাই গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। সাংখ্যকেই আরম্ভ ও ভিত্তি করা হইয়াছে; কিন্তু প্রথম হইতেই ইহা যোগের ভাবে অনুপ্রাণিত এবং ক্রমশঃ যোগের ভাব ও প্রণালীর উপরই অধিক ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। তৎকালে লোকের মনে এই দুই প্রণালীর মধ্যে কার্য্যতঃ যে প্রভেদ ছিল তাহা এই—সাংখ্যের পথ জ্ঞানের পথ, বুদ্ধিযোগের পথ; যোগের পথ কর্ম্মের পথ, কর্ম্মানুগামী বুদ্ধির রূপান্তরের পথ। এই প্রভেদ হইতেই আর একটি দ্বিতীয় প্রভেদ আপনা হইতে আইসে—সাংখ্য লোককে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা ও কর্ম্মত্যাগের দিকে, সন্ন্যাসের দিকে লইয়া যায়; যোগের মতে ভিতরে বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে, কর্ম্মের আভ্যন্তরীণ তত্ত্বের সংশোধন করিতে হইবে—কর্ম্মকে ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হইবে—দেবজীবন

লাভ ও মুক্তিলাভকেই কর্ম্মের উদ্দেশ্য করিতে হইবে—তাহা হইলেই যোগের মতে যথেষ্ট হইবে। অথচ, দুই প্রণালীরই উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এক—পুনর্জ্জন্ম ও সংসার অতিক্রম করা এবং জীবাত্মার সহিত পরমের মিলন। অন্ততঃ পক্ষে গীতা এইরূপ প্রভেদই বুঝাইয়াছে।

এই দ্বিবিধ বিরোধী নিষ্ঠার সমন্বয় কি করিয়া সম্ভব তাহা বুঝিতে অর্জ্জুনের কষ্ট হইবার কারণ এই যে তৎকালে সাধারণতঃ এই দুইটির মধ্যে বিশেষ তফাৎ করা হইত। ভগবান কর্ম্ম ও বুদ্ধিযোগের সমন্বয় লইয়াই আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন যে বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কেবল কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট—দূরেণহ্যবরংকর্ম্ম। বুদ্ধিযোগ ও জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে সাধারণ মনোভাব এবং বাসনা হইতে মুক্ত করিয়া সকল বাসনাশূন্য ব্রাহ্মীস্থিতির পবিত্রতা ও সমত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—তবেই কর্ম্ম গ্রাহ্য হইবে। কর্ম্ম মুক্তির উপায়, তবে সে কর্ম্ম এরূপ জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ হওয়া চাই। অর্জ্জুন তৎকালপ্রচলিত শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবিত। ভগবান বৈদান্তিক সাংখ্যের উপযোগী তত্ত্বসমূহের উপর বিশেষ ঝোঁক দিতে লাগিলেন—ইন্দ্রিয়জয়, মনোগত সর্ব্ববিধ বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া আত্মারাম হইয়া, নীচ প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া উচ্চ প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই সকল কথাই বিশেষভাবে বলিতে লাগিলেন—যোগের কথা অতি সামান্যভাবেই বলিলেন। তাই অর্জ্জুনের বিষম সংশয় উপস্থিত হইল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥
ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ ৩। ১,২

—"হে জনার্দ্দন, হে কেশব, যদি কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ইহাই তোমার অভিমত, তবে কেন হিংসাত্মক কর্ম্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছ ? কখনও কর্ম্ম প্রশংসা কখনও জ্ঞান প্রশংসা এইরূপ বিমিশ্র বাক্যে আমার বুদ্ধিকে কেন মোহিত করিতেছ ; এই দুইটীর যেটি ভাল তাহা নিশ্চয় করিয়া বল, যাহাতে আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি।"

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন যে জ্ঞান ও সন্ন্যাস সাংখ্যের পথ, কর্ম্ম যোগের পথ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩।৩

কিন্তু, কর্ম্মযোগের সাধন ব্যতীত প্রকৃত সন্ন্যাস অসম্ভব—ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে, লাভালাভ জয়পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, প্রকৃতিই কর্ম্ম করিতেছে আত্মা কিছুই করিতেছে না, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে—তাহা না হইলে প্রকৃত সন্ন্যাস সম্ভব হইবে না। কিন্তু, পরক্ষণেই ভগবান বলিলেন যে—জ্ঞান যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানেই সমস্ত কর্ম্মের পরিসমাপ্তি, জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদয় কর্ম্মকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে ; অতএব, যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন যোগের দ্বারাই তাঁহার কর্ম্ম সংন্যস্ত হয় এবং এতাদৃশ আত্মবান্ ব্যক্তিকে কর্ম্ম সকল আবদ্ধ করিতে পারে না।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪।৪১

আবার অর্জ্জুনের গোলমাল লাগিল। বাসনাহীন কর্ম্ম হইতেছে যোগের মূল কথা ; এবং কর্ম্মসন্ন্যাস বা ত্যাগ হইতেছে সাংখ্যের মূল কথা। এই দুইটিকেই পাশাপাশি রাখা হইয়াছে যেন তাহারা একই সাধনার অঙ্গ,

কিন্তু, উভয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য বুঝিতে পারা যাইতেছে না। ভগবান ইতিপূর্ব্বে যে সামঞ্জস্য করিয়াছেন তাহা এই যে বাহ্যিক কর্ম্মশূন্যতার মধ্যেও বুঝিতে হইবে যে কর্ম্ম চলিতেছে; আবার আত্মা যেখানে নিজকে কর্ম্মী ভাবার ভ্রম বুঝিতে পারে এবং সকল কর্ম্ম যজ্ঞেশ্বরে অর্পণ করে সেখানে বাহ্যিক কর্ম্মপরায়ণাতেও প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য দেখিতে হইবে। কিন্তু, অর্জ্জুনের কর্ম্মপ্রবণ ব্যবহারিক বুদ্ধি এই সূক্ষ্ম প্রভেদ বুঝিতে পারিল না, এই হেঁয়ালীর মত কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না—তাই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ৫।১

—"হে কৃষ্ণ, কর্ম্ম সকলের সংন্যাস উপদেশ দিয়া আবার কর্ম্মযোগ উপদেশ দিতেছ; এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ নিশ্চয় করিয়া সেই একটি উপদেশ দাও।"

ভগবান ইহার যে উত্তর দিলেন তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ তাহাতে প্রভেদটি খুব স্পষ্ট করিয়াই দেখান হইয়াছে এবং উভয়ের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত না হইলেও, কোন্ পথে সামঞ্জস্য হইবে তাহাও দেখা ন হইয়াছে। ভগবান বলিলেন—

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ৫।২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি না কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৫।৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৫।৪

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫।৫

—"সন্ন্যাস (কর্ম্মত্যাগ) ও কর্ম্মযোগ (কর্ম্মানুষ্ঠান) উভয়েই মোক্ষপ্রদ; কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ উৎকৃষ্টতর। যিনি দ্বেষ করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যাসী (কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও সন্ন্যাসী) জানিও। যেহেতু রাগদ্বেষাদি-দ্বন্দ্বশূন্য ব্যক্তি অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। অজ্ঞেরাই সাংখ্য ও যোগকে পৃথক বলে, জ্ঞানীরা বলেন না; সম্যকরূপে একটির অনুষ্ঠান করিলে উভয়েরই ফল পাওয়া যায়" কারণ, সম্যকভাবে পালন করিলে প্রত্যেকটির ভিতরেই অপরটি অঙ্গভাবে রহিয়াছে। "জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে স্থান লাভ করেন, যোগিগণও তাহাই প্রাপ্ত হন; যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন তিনিই সম্যক দর্শন করেন। কিন্তু, কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাসলাভ কষ্টকর; যোগযুক্ত মুনি অচিরাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন; তাঁহার আত্মা সর্ব্বভূতের (অর্থাৎ সংসারে যাহা কিছু হইয়াছে তাহার) আত্মা হয়; এবং ঈদৃশ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবদ্ধ হন না।" তিনি জানেন যে কর্ম্ম সকল তাঁহার নহে, প্রকৃতির এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই তিনি মুক্ত হন; তিনি কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়াছেন, কোন কর্ম্ম করেন না, যদিও তাঁহার ভিতর দিয়া কর্ম্ম হয়। তিনি ব্রহ্মভূত—ব্রহ্ম হন, তিনি দেখেন যে সেই এক স্বয়ম্ভু বস্তুই সর্ব্বভূত হইয়াছেন এবং তিনিও তাঁহাদের মত একজন হইয়াছেন। তিনি বুঝেন যে তাঁহাদের সকলের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিতর দিয়া বিশ্ব প্রকৃতিরই কার্য্য এবং তাঁহারও কর্ম্মসকল সেই বিশ্বক্রিয়ার অংশমাত্র।

ইহাই গীতাশিক্ষার সব নহে; কারণ এ পর্য্যন্ত শুধু অক্ষর পুরুষ,—

অক্ষর ব্রহ্মের কথা এবং প্রকৃতির কথা হইয়াছে ; বলা হইয়াছে যে এই দুই হইতেই জগৎ। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের কথা, পুরুষোত্তমের কথা ভাল স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। এ পর্য্যন্ত শুধু জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়ই করা হইয়াছে—কিন্তু, সামান্য সঙ্কেত ভিন্ন ভক্তির কথা আরম্ভ করা হয় নাই। ভক্তিই পরম তত্ত্ব এবং পরবর্ত্তী ভাগে ভক্তিই গীতার মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত শুধু এক নিষ্ক্রিয় পুরুষ এবং নিম্নতর প্রকৃতির কথাই বলা হইয়াছে, এখনও তিন পুরুষ এবং দুই প্রকৃতির প্রভেদ করা হয় নাই। সত্য বোধ যে ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে—কিন্তু আত্মা ও প্রকৃতির সহিত তাঁহার স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। এই সকল অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্বের সম্যক্ অবতারণা না করিয়া যতদূর সমন্বয় করা যায় গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে শুধু ততদূরই করা হইয়াছে। যখন অতঃপর এই সকল তত্ত্বের অবতারণা করা হইবে তখন এই প্রাথমিক সমন্বয়গুলিকে উঠাইয়া না দিলেও অনেক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতেই হইবে।

নবম অধ্যায়

সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত

কৃষ্ণ বলিলেন যে মোক্ষপরতা দ্বিবিধ—সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগ দ্বারা এবং যোগিদিগের কর্ম্মযোগ দ্বারা নিষ্ঠা (মোক্ষপরতা) হয়। এই যে সাংখ্যের সহিত জ্ঞানযোগকে এবং যোগের সহিত কর্ম্মমার্গকে এক করা হইল ইহা বড় মজার জিনিষ। কারণ ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে তৎকালে যে দার্শনিক ধারণা ও চিন্তা সকল প্রচলিত ছিল এখন তাহাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বেদান্ত মতের ক্রমবিকাশই এই পরিবর্ত্তনের কারণ। গীতা রচনার পর হইতেই এই বৈদান্তিক প্রভাব আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় এবং গীতা রচনার পর মোক্ষলাভের অন্যান্য বৈদিক ব্যবহারিক প্রণালী এক রকম উঠিয়া যায়। গীতার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে তৎকালে যাহারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিতেন তাহারা সাধারণতঃ* সাংখ্য প্রণালীই গ্রহণ করিতেন। পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধভাবের দ্বারা সাংখ্যের জ্ঞান প্রণালীর প্রভাব নিশ্চয় খর্ব্ব হইয়া পড়ে। সাংখ্যের ন্যায়ই অনীশ্বরবাদী ও বহুবাদী বৌদ্ধমত বিশ্বশক্তির কার্য্যাবলীর অনিত্যতার উপর ঝোঁক দিয়াছিল। কিন্তু, বৌদ্ধমতে এই বিশ্বশক্তিকে প্রকৃতি না বলিয়া কর্ম্ম বলা হইয়াছে,

* পুরাণ ও তন্ত্রসমূহ সাংখ্যভাবে পরিপূর্ণ, যদিও সেগুলি বৈদান্তিক ভাবেরই অধীনে এবং অন্যান্যভাবের সহিত মিশ্রিত।

কারণ বৌদ্ধেরা বেদান্তের ব্রহ্ম বা সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষ স্বীকার করে না; তাহাদের মতে বুদ্ধি যখন বিশ্বক্রিয়ার এই অনিত্যতা বুঝিতে পারে তখনই মুক্তি হয়। যখন আবার বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল তখন আর সেই পুরাতন সাংখ্যমতের পুনপ্রতিষ্ঠা না হইয়া শঙ্কর কর্তৃক প্রচারিত বেদান্তমতই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। শঙ্কর বৌদ্ধদের অনিত্যতার স্থানে বেদান্ত অনুমোদিত ভ্রম, মায়ার প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং বৌদ্ধদের শূন্যবাদ, নির্ব্বাণবাদের স্থানে অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সকল দার্শনিক তত্ত্বের (ব্রহ্ম, মায়া, মোক্ষ) উপর ভিত্তি করিয়া শঙ্কর যে সাধন প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সংসার মিথ্যা বলিয়া সংসার ত্যাগের যে উপদেশ দিয়াছেন, বর্ত্তমানে আমরা জ্ঞানযোগ বলিতে সাধারণতঃ সেইটাই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু, যখন গীতা রচিত হয় তখনও মায়াবাদ বেদান্তদর্শনের মূল কথা বলিয়া গণ্য হয় নাই এবং পরবর্ত্তী কালে শঙ্কর এই মায়াবাদকে যেরূপ স্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন গীতা রচনার সময় মায়া শব্দের অর্থ সেরূপ স্পষ্ট বা সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কারণ, গীতাতে মায়ার কথা খুব অল্পই আছে কিন্তু প্রকৃতির কথা অনেক আছে। মায়া শব্দ প্রকৃতি শব্দের পরিবর্ত্তেই ব্যবহৃত হইয়াছে বরং প্রকৃতির যে নিম্নাবস্থা—অপরা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই মায়া বলা হইয়াছে—ত্রৈগুণ্যময়ী মায়া। গীতার মতে ভ্রমাত্মিকা মায়া নহে, প্রকৃতিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে।

তবে, দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে ঠিক প্রভেদ যাহাই থাকুক, গীতা সাংখ্য ও যোগের মধ্যে কার্য্যতঃ যেরূপ প্রভেদ করিয়াছে বর্ত্তমানের বৈদান্তিক জ্ঞানযোগ এবং বৈদান্তিক কর্ম্মযোগ এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদও সেইরূপ এবং কার্য্যতঃ এই প্রভেদের ফলও একই রকম। বৈদান্তিক জ্ঞানযোগের

ন্যায় সাংখ্যও বুদ্ধির সাহায্যে মুক্তির পথে অগ্রসর হইত। বিচার বুদ্ধির সাহায্যে আত্মার স্বরূপজ্ঞান এবং জগৎ মিথ্যা জ্ঞান যেমন বেদান্তের প্রণালী তেমনই বিচারবুদ্ধির সাহায্যে পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক, পুরুষ প্রকৃতি-ভেদের সম্যক জ্ঞান সাংখ্যেরও প্রণালী। সাংখ্য যেমন বিচারবুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে চাহিত যে আসক্তি ও অহঙ্কার বশে প্রকৃতির কার্য্যাবলী পুরুষের উপর আরোপিত হয় বেদান্তও তেমনই বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে চায় যে মানসিক ভ্রম হইতে উত্থিত অহঙ্কার ও আসক্তির বশে জাগতিক আভাষ ব্রহ্মের উপর আরোপিত হয়। বৈদান্তিক প্রণালী অনুসারে আত্মা যখন নিজের সত্য সনাতন একব্রহ্ম স্বরূপে ফিরিয়া আসে তখন মায়ার শেষ হয়, বিশ্বলীলা লোপ পায়; সাংখ্য প্রণালী অনুসারে আত্মা যখন তাহার নিষ্ক্রিয় পুরুষ স্বরূপ সত্য সনাতন অবস্থায় ফিরিয়া আসে তখন গুণ সকলের ক্রিয়া শান্ত হয়, বিশ্বক্রিয়া বন্ধ হয়। মায়াবাদীদের ব্রহ্ম নীরব, অক্ষর, নিষ্ক্রিয়—সাংখ্যদের পুরুষও তদ্রূপ। অতএব, উভয়ের মতেই সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপন ভিন্ন মোক্ষলাভের আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু, গীতার যোগ এবং বৈদান্তিক কর্ম্মযোগ উভয় মতানুসারেই কর্ম্ম শুধু মোক্ষের সহায় নহে—কর্ম্মের দ্বারাই মোক্ষলাভ হইতে পারে; এবং এই কথারই যুক্তিযুক্ততা গীতা জোরের সহিত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বৌদ্ধধর্ম্মের * প্রবল বন্যায় গীতার এই

* আবার গীতাও মহাযান বৌদ্ধমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গীতার অনেক শ্লোক সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথমতঃ জ্ঞানী কর্ম্মহীন শান্ত সাধু-সন্ন্যাসীরই ধর্ম্ম ছিল; ক্রমে যে উহা ধ্যানযুক্ত ভক্তি এবং জীবসেবা ও দয়ার ধর্ম্ম হইয়া এসিয়ার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে—বোধ হয় গীতার প্রভাবেই বৌদ্ধধর্ম্মের সেই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

শিক্ষা ভারতবর্ষে স্থান পায়-নাই। পরে কঠোর মায়াবাদের তীব্রতায় এবং সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের ভাবাবেগে গীতার এই কর্ম্মশিক্ষা লোপ পাইয়াছিল। কেবল এতদিন পরে সেই শিক্ষা এখন ভারতবাসীর মনের উপর প্রকৃত কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ত্যাগ চাইই; কিন্তু ভিতরে বাসনা ও অহঙ্কার ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। এই ত্যাগ ব্যতীত বাহ্যিক কর্ম্ম ত্যাগ মিথ্যাচার এবং ব্যর্থ। এই ত্যাগ যেখানে আছে সেখানে বাহ্যিক কর্ম্মত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই, তবে তাহা নিষিদ্ধও নহে। জ্ঞান চাইই, মুক্তির জন্য ইহা অপেক্ষা বড় শক্তি আর কিছুই নাই, তবে জ্ঞানের সহিত কর্ম্মেরও প্রয়োজন আছে; কর্ম্ম ও জ্ঞানের মিলনের দ্বারা আত্মা শুধু কর্ম্মশূন্য শান্তির অবস্থায় নহে, ভীষণ কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মীস্থিতির মধ্যে অবস্থান করিতে পারে। ভক্তি সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়, কিন্তু, ভক্তির সহিত কর্ম্মও প্রয়োজনীয়; জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের মিলনের দ্বারা আত্মা সর্ব্বোচ্চ ঐশ্বরিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়,—যিনি একই কালে অনন্ত আধ্যাত্মিক শান্তি এবং অনন্ত বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম উভয়েরই অধীশ্বর সেই পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করে। ইহাই গীতার সমন্বয়।

কিন্তু, সাংখ্যানুমোদিত জ্ঞানের পথ এবং যোগানুমোদিত কর্ম্মের পথ এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদের সামঞ্জস্য যেমন গীতাকে করিতে হইয়াছে তেমনিই বেদান্তের মধ্যেই ঐরূপ আর একটি যে বিরোধ আছে আর্য্য জ্ঞানের উদার ব্যাখ্যা করিতে গীতাকে সেই বিরোধেরও আলোচনা ও সমাধান করিতে হইয়াছে। এই বিরোধ হইতেছে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড লইয়া; এক চিন্তাধারার পরিণতি পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে, বেদবাদে, আর এক ধারার পরিণতি উত্তর মীমাংসা দর্শনে, ব্রহ্মবাদে; একদল লোক প্রাচীন

কাল হইতে প্রচলিত বৈদিক মন্ত্র, বৈদিক যজ্ঞের উপর ঝোঁক দিতেন, অপর দল এই সকলকে নিম্নজ্ঞান বলিয়া উপেক্ষা করিয়া উপনিষদ হইতে যে উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান পাওয়া যায় তাহারই উপর ঝোঁক দিতেন। ধন, পুত্র, জয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ঐহিক সুখ এবং পরলোকে অমরত্ব এই সকল লাভের উদ্দেশ্যে নিখুঁত ভাবে বৈদিক যজ্ঞাদি সম্পন্ন করা এবং বৈদিক মন্ত্রাদি প্রয়োগ করা—বেদবাদীগণ ইহাকেই ঋষিগণের আর্য্যধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতেন। ব্রহ্মবাদিগণ বলেন যে ইহার দ্বারা মানুষ পরমার্থের জন্য তৈয়ারী হইতে পারে বটে কিন্তু, ইহাই পরামার্থ নহে। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই মানুষকে অনির্ব্বচনীয় আধ্যাত্মিক আনন্দের আলয় প্রকৃত অমরত্ব দিতে পারে—এই আনন্দ সকল প্রকার ঐহিক ভোগসুখ এবং নিম্ন স্বর্গের বহু উপরে। মানুষ যখন এই ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে ফিরে তখনই তাহার পুরুষার্থ সাধনের, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের আরম্ভ হয়। পুরাকালে বেদের প্রকৃত অর্থ যাহাই থাকুক এই প্রভেদই বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল এবং সেইজন্যই গীতাকে ইহার আলোচনা করিতে হইয়াছে।

কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় করিতে গীতা প্রথমেই বেদবাদকে তীব্রভাবে নিন্দা করিয়াছে—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥২।৪২, ৪৩

—"বেদের অর্থবাদে পরিতুষ্ট (তাৎপর্য্য বিমূঢ়) ইহা ভিন্ন ঈশ্বর তত্ত্ব প্রাপ্য আর কিছুই নাই এইরূপ মতের পোষক, কামাত্মা, স্বর্গাভিলাষী,

মূঢ়গণ এই যে পুষ্পিত বাক্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকে তাহা জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ক্রিয়াবিশেষবাহুল্য বিশিষ্ট এবং ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধনভূত।" যদিও এখন কার্য্যতঃ বেদ পরিত্যক্ত হইয়াছে তথাপি ভারতবাসীরা এখনও মনে করে যে বেদ অতি পবিত্র, অনতিক্রমণীয়—সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্রের বেদই মূল এবং প্রামাণ্য। গীতা এই বেদকেও আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।২।৪৫

—"হে অর্জ্জুন, গুণত্রয়ের কার্য্যই বেদের বিষয়; কিন্তু, তুমি ত্রিগুণের অতীত হও।"

যাবানার্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥২।৪৬

—"সকল স্থান জলে প্লাবিত হইয়া গেলে, উদপানে (কূপ তড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যতটুকু প্রয়োজন, পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সমস্ত বেদেও ততটুকু প্রয়োজন।" "সর্ব্বেষু বেদেষু"—সমস্ত বেদ বলিতে উপনিষদ পর্য্যন্ত বুঝাইয়াছে বলিয়া মনে হয়—কারণ পরে ব্যাপক শ্রুতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; যিনি পরমার্থ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট সমস্ত বেদই নিষ্প্রয়োজন। বরং বেদগুলি বাধাস্বরূপ। কারণ, তাহাদের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের মধ্যে যে বিরোধ রহিয়াছে এবং তাহাদের যে নানাবিধ বিরোধী ভাষ্য ও ব্যাখ্যা হইয়াছে তাহাতে বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে; ভিতরে জ্ঞানের আলোক না থাকিলে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না, যোগে নিবিষ্ট হইতে পারে না।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥২।৫২, ৫৩

—"যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহন দুর্গ পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত শাস্ত্র সম্বন্ধে বৈরাগ্য লাভ করিবে। শ্রুতি শ্রবণে তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন পরমেশ্বরে নিশ্চলা ও অভ্যাসপটুতা বশতঃ স্থিরা থাকিবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে।" বেদের প্রতি এই সকল আক্রমণ সাধারণ ধর্ম্মভাবের এত বিরুদ্ধ যে উক্ত শ্লোকগুলির বিকৃত অর্থ করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত শ্লোকগুলির অর্থ স্পষ্ট এবং প্রথম হইতে জ্ঞানকে বলা হইয়াছে যে উহা বেদ ও উপনিষদের উপরে—শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে।

যাহা হউক এই বিষয়টি আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, কারণ গীতার ন্যায় সার্ব্বভৌমিক, সমন্বয়কারী শাস্ত্র আর্য্য সভ্যতার এই সকল বিশিষ্ট অংশকে কখনও সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করিতে পারে না। যোগদর্শনানুসারে কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি এবং সাংখ্যদর্শনানুসারে জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি এই উভয় মতের সমন্বয় গীতাকে করিতে হইবে। জ্ঞানের সহিত কর্ম্মকে মিশাইতে হইবে। আবার পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সাংখ্য ও যোগের মত এক; বেদান্ত কিন্তু উপনিষদের পুরুষ, দেব, ঈশ্বর, এই সকল তত্ত্বকে এক অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্বে পরিণত করিয়াছে; ইহাদের সমন্বয় গীতাকে করিতে হইবে; যোগমতানুযায়ী ঈশ্বর তত্ত্বেরও স্থান করিতে হইবে। ইহার সহিত গীতার নিজস্ব তত্ত্ব—তিন পুরুষ ও পুরুষোত্তমের কথাও বলিতে হইবে। এই পুরুষোত্তম তত্ত্বের কোন প্রমাণ

উপনিষদের মধ্যে সহজে পাওয়া যায় না, যদিও এই ভাবধারা সেখানে আছে। বরং মনে হয় এই তত্ত্ব শ্রুতির বিরোধী কারণ শ্রুতি কেবল দুইটি পুরুষ স্বীকার করিয়াছে। আবার জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করিতে হইলে শুধু সাংখ্য এবং যোগের মধ্যে বিরোধ ধরিলেই চলিবে না, বেদান্তের মধ্যেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে বিরোধ রহিয়াছে তাহা সাংখ্য ও যোগের বিরোধ হইতে স্বতন্ত্র এবং সেই বিরোধেরও একটা হিসাব লওয়া প্রয়োজন। বেদ এবং উপনিষদকে প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া এত বিরুদ্ধ দর্শন ও মতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে গীতা যে বলিয়াছে শ্রুতি মানুষের বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়—শ্রুতিবিপ্রতিপন্না—ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ভারতের পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা এখনও শাস্ত্রবাক্যের অর্থ লইয়া কত ঝগড়া করিতেছে এবং কত বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। এটা মোটেই আশ্চর্য্যের কথা নয় যে বুদ্ধি বিরক্ত হইয়া ছাড়িয়া দিবে, গন্তাসি নির্ব্বেদম্ নূতন পুরাতন, শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ, কোন শাস্ত্র বাক্যই আর শুনিতে চাহিবে না এবং নিজের মধ্যে যাইয়া গভীর, আভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষের আলোকে সত্য আবিষ্কার করিতে চাহিবে।

প্রথম ছয় অধ্যায়ে গীতা কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ের, সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তের সমন্বয়ের প্রশস্ত ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু, প্রথমেই গীতা দেখিয়াছে যে বৈদান্তিকদের ভাষায় কর্ম্ম শব্দের এক বিশেষ অর্থ আছে; তাঁহারা কর্ম্ম শব্দে বৈদিক যজ্ঞ ও অনুষ্ঠান সমূহ বুঝিয়া থাকেন। বড় জোর গৃহ্যসূত্র অনুযায়ী সংসারধর্ম্মপালন ও ঐ সকল যজ্ঞ ও অনুষ্ঠান কর্ম্মের অন্তর্ভূত বলিয়া ধরিয়াছেন। ক্রিয়াবিশেষবহুল বিধি সঙ্গত এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানকেই বৈদান্তিকেরা কর্ম্ম বলিয়াছেন। কিন্তু, যোগশাস্ত্রে কর্ম্মশব্দের অর্থ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যাপক। গীতা এই ব্যাপক

অর্থের উপরই বিশেষ ঝোঁক দিয়াছে; ধর্ম্মকর্ম্মের ভিতর আমাদিগকে সর্ব্বকর্ম্মাদি, সকল কর্ম্মই ধরিতে হইবে। তথাপি গীতা বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় যজ্ঞকে একেবারে উড়াইয়া দেয় নাই, বরং যজ্ঞের ধারণাকে উন্নীত ও প্রশস্ত করিয়াছে। বাস্তবিক গীতার বক্তব্যের মর্ম্ম এই—যজ্ঞ যে জীবনের সর্ব্বপ্রধান অংশ শুধু তাহাই নহে, সমগ্র জীবনকেই যজ্ঞরূপে দেখিতে হইবে; তবে অজ্ঞানীরা উচ্চজ্ঞান ব্যতীতই ইহা সম্পাদন করে এবং যাহারা বিশেষ অজ্ঞানী তাহারা যেরূপ করা উচিত সেরূপে না করিয়া অবিধিপূর্ব্বক ইহা করিয়া থাকে। যজ্ঞ না হইলে জীবন চলিতে পারে না; সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজা সৃষ্টি করিবার সময় যজ্ঞকে তাহাদের চির সঙ্গী করিয়া দিয়াছেন,—সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা। কিন্তু, বেদবাদীদের যে যজ্ঞ তাহা ফল-কামনা প্রসূত; ভোগৈশ্বর্য্যই সে যজ্ঞের লক্ষ্য ও স্বর্গের অধিকতর ভোগই সেখানে শ্রেষ্ঠ গতি এবং অমৃতত্ব বলিয়া বিবেচিত। এরূপ যজ্ঞ প্রণালী কখনও গীতা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইতে পারে না; কারণ কামনা পরিত্যাগই গীতার প্রথম কথা—আত্মার শত্রু স্বরূপ এই কামনাকে বর্জ্জন করিতে হইবে, বিনাশ করিতে হইবে এই কথা লইয়াই গীতা শিক্ষার আরম্ভ। গীতা বলে না যে বৈদিক যজ্ঞ প্রণালী নিরর্থক; গীতা স্বীকার করে যে এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে লোকে এখানে ও স্বর্গে সুখভোগ করিতে পারে। ভগবান বলিয়াছেন, অহংহি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেবচ, লোকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ করে আমিই সেই দেবতারূপে সমুদয় যজ্ঞার্পণ গ্রহণ করি এবং তদনুযায়ী ফল আমিই প্রদান করি। কিন্তু, প্রকৃত পথ ইহা নহে; স্বর্গসুখভোগও মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ নহে, মোক্ষ নহে। অজ্ঞানীরাই দেবতার পূজা করে, তাহারা জানে না যে এই সকল দেবমূর্ত্তিতে অজ্ঞানে তাহারা কাহার পূজা

করিতেছে ; কারণ, তাহারা না জানিয়াও সেই এক ঈশ্বর, সেই এক দেবেরই আরাধনা করে এবং তিনিই সকল পূজা গ্রহণ করেন। সেই ঈশ্বরকেই যজ্ঞ অর্পণ করিতে হইবে ; জীবনের সমস্ত কার্য্য যখন ভক্তির সহিত বাসনা শূন্য হইয়া তাঁহারই উদ্দেশ্যে সর্ব্বজনহিতের জন্য করা যায় তাহাই প্রকৃত যজ্ঞ। বেদবাদ এই সত্যকে ঢাকিয়া দেয় এবং ক্রিয়াবিশেষ-বাহুল্যের দ্বারা মানুষকে ত্রিগুণের ক্রিয়ার মধ্যে বদ্ধ রাখিতে চায়, সেই জন্যই বেদবাদের এত তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে এবং রূঢ়ভাবেই বেদবাদকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে ; কিন্তু ইহার যে মূল কথা তাহা নষ্ট করা হয় নাই ; ইহাকে পরিবর্ত্তিত ও উন্নীত করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনের, মোক্ষ লাভ প্রণালীর একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ করিয়া তোলা হইয়াছে।

বৈদান্তিকদের ভাষায় জ্ঞান শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত তাহা লইয়া এত গোলমাল নাই। গীতা প্রথমেই সম্পূর্ণভাবে বেদান্তের জ্ঞানই গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রথম ছয় অধ্যায়ে সাংখ্যদের শান্ত অক্ষর কিন্তু বহু পুরুষের পরিবর্ত্তে বৈদান্তিকদের একমেবাদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী শান্ত অক্ষর ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই ছয় অধ্যায়ে গীতা বরাবরই স্বীকার করিয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান মোক্ষলাভের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ অসম্ভব, যদিও গীতা বরাবরই বলিয়াছে যে নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানেরই একটি মূল উপাদান। সেই রকমই গীতা স্বীকার করিয়াছে যে অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মের অনন্ত সমতার মধ্যে অহং তত্ত্বের নির্ব্বাণ মোক্ষের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ; সাংখ্যমতে প্রকৃতির কার্য্যের সহিত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় অক্ষর পুরুষের স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন এবং এই নির্ব্বাণকে গীতা কার্য্যতঃ একই করিয়া দিয়াছে। কোন কোন উপনিষদ

(বিশেষ করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ) সাংখ্যের সহিত বেদান্তের ভাষাকে মিশাইয়া যেমন এক করিয়াছে, গীতাতেও তাহা করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বৈদান্তিক মতের একটা দোষ আছে তাহা অতিক্রম করিতেই হইবে। আমরা আন্দাজ করিতে পারি যে তখনও বেদান্ত পরবর্ত্তী বৈষ্ণবযুগের ন্যায় ঈশ্বরবাদের (theism) বিকাশ করে নাই, যদিও ইহার বীজ উপনিষদের মধ্যেই নিহিত ছিল। আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে গোঁড়া বেদান্তের ভিত্তি ছিল সর্ব্বেশ্বরবাদ এবং তাহার চূড়া ছিল অদ্বৈতবাদ।* ইহা একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মকেই জানিত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণকে ব্রহ্ম বলিয়াই জানিত। কিন্তু সেই পরব্রহ্মই যে এক ঈশ্বর, পুরুষ, দেব এই ধারণার ব্যতিক্রম হইয়া পড়িয়াছিল ; খাঁটি ব্রহ্মবাদে এই সকল শব্দ ব্রহ্মের নিম্নতর অবস্থাতেই প্রযুজ্য হইতে পারিত। গীতা যে এই সকল শব্দ এবং অর্থকে পুনরায় স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে শুধু তাহাই নহে, গীতা আরও একপদ অগ্রসর হইতে চাহিয়াছে। সাংখ্যের সহিত বেদান্তের সম্পূর্ণ সমন্বয় করিতে হইলে বলিতে হইবে যে পরমাবস্থায় ব্রহ্মই পুরুষ এবং পুরুষের অপরা প্রকৃতিই ব্রহ্মের মায়া ; এবং সাংখ্য ও বেদান্তের সহিত যোগের সম্পূর্ণ সমন্বয় করিতে হইলে বলিতে হইবে যে নিম্নাবস্থায় নহে, পরমাবস্থায় ব্রহ্মই ঈশ্বর। কিন্তু, গীতা ঈশ্বরকে, পুরুষোত্তমকে শান্ত অক্ষর ব্রহ্মেরও উপর স্থান দিতে অগ্রসর, নির্গুণ ব্রহ্মে অহং তত্ত্বের লয় পুরুষোত্তমের সহিত চরম মিলনের একটি প্রধান প্রাথমিক প্রক্রিয়া মাত্র। কারণ পুরুষোত্তমই পরব্রহ্ম। অতএব

* ঈশ্বর এবং জগতে যাহা কিছু আছে সে সবই এক—এই মতই সর্ব্বেশ্বরবাদ (Pantheism) ; অদ্বৈতবাদ (Monism) বলে যে একমাত্র ভগবান বা ব্রহ্মই সত্য, আর এই জগৎ মিথ্যা, অথবা জগৎ ব্রহ্মেরই আংশিক বিকাশ।

গীতা বেদ ও উপনিষদের প্রচলিত শিক্ষাকে অতিক্রম করিয়া নিজে তাহাদের মধ্য হইতে যে শিক্ষা উদ্ধার করিয়াছে তাহাই বিবৃত করিয়াছে। বৈদান্তিকেরা সাধারণতঃ বেদ ও উপনিষদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে গীতার সহিত তাহার মিল না হইতে পারে *। বাস্তবিক শাস্ত্রবাক্যের এরূপ স্বাধীন সমন্বয়কারী ব্যাখ্যা না করিলে তৎকালে প্রচলিত অসংখ্য মতবাদের ও বৈদিক প্রণালীর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন কিছুতেই সম্ভব হইত না।

পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে গীতা বেদ এবং উপনিষদকে খুব উচ্চস্থান দিয়াছে। বেদ ও উপনিষদ ভাগবৎ শাস্ত্র, ভগবানের বাণী। স্বয়ং ভগবানই বেদের জ্ঞাতা এবং বেদান্তের প্রণেতা—বেদবিৎ বেদান্তকৃৎ। সকল বেদে তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়—সর্ব্বৈর্বেদৈরহমেব বেদ্যঃ। এই ভাষা হইতে বুঝা যায় যে বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞানের গ্রন্থ—এই সকল শাস্ত্রের নাম উপযুক্তই হইয়াছে। পুরুষোত্তম ক্ষর ও অক্ষরের অতীত তাঁহার উচ্চ অবস্থা হইতে নিজেকে জগতে এবং বেদে ব্যাপ্ত করিয়াছেন। তথাপি বেদের শব্দার্থ লইয়া অনেক গোলমাল হয়—যাহারা কথার উপর অত্যধিক ঝোঁক দেয় তাহারা প্রকৃত গূঢ় অর্থের সন্ধান পায় না। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচারক এই কথাই বলিয়াছিলেন যে শব্দে সর্ব্বনাশ, অর্থেই রক্ষা—

---

* বাস্তবিক পুরুষোত্তমের ধারণা গীতার পূর্ব্বে উপনিষদের মধ্যেই সূচিত হইয়াছিল; তবে, সেখানে ইহা বিক্ষিপ্ত ভাবে ছিল। গীতার ন্যায় উপনিষদেও বার বার বলা হইয়াছে যে সেই পরম ব্রহ্ম, পরম পুরুষের মধ্যেই নির্গুণ ও গুণী ব্রহ্মের বিরোধ রহিয়াছে। এই দুইটি আমাদের নিকট বিরোধী মনে হইলেও পরম ব্রহ্ম শুধু গুণীও নহেন, শুধু নির্গুণও নহেন, তাঁহার ভিতর দুইই রহিয়াছে।

"the letter killeth and it is the spirit that saves" এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রেয় উপযোগিতারও একটা সীমা আছে। হৃদয়ের মধ্যে যে ঈশ্বর রহিয়াছেন তিনিই সকল জ্ঞানের প্রকৃত উৎস—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্—" ১৫।১৫

—"আমি সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি এবং আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞান।"

শাস্ত্র সেই অন্তরস্থিত বেদের সেই স্বপ্রকাশ সত্যের বাঙ্ময় রূপ মাত্র—ইহা শব্দব্রহ্ম। বেদে কথিত হইয়াছে যে হৃদয় হইতে, যেখানে সত্যের আবাস সেই গুহস্থান হইতে মন্ত্রের উৎপত্তি, সদনাৎ ঋতস্য, গুহম্। উৎপত্তিস্থান এইরূপ বলিয়াই ইহার সার্থকতা; তথাপি শব্দ অপেক্ষা সনাতন সত্য বড়। এবং কোন ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধেই এ কথা বলা যায় না যে তাহাই সম্পূর্ণ এবং যথেষ্ট এবং তাহা ছাড়া আর কোন সত্যই গ্রাহ্য হইতে পারে না (বেদ সম্বন্ধে বেদবাদীদের এই রূপই অভিমত—নান্যদস্তীতি-বাদিনঃ)। জগতে যত ধর্ম্মশাস্ত্র আছে তাহাদের দ্বারা প্রকৃত উপকার লাভ করিতে হইলে তাহাদিগকে এইভাবেই দেখিতে হইবে। জগতে যত ধর্ম্মগ্রন্থ আছে বা ছিল—বাইবেল, কোরাণ, চীনদেশীয় গ্রন্থ, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র, শাস্ত্র, গীতা, ঋষিদের, পণ্ডিতদের, অবতারদের বাণী ও উপদেশবাক্য—সব ধরিলেও বলিতে পার না যে আর কিছুই নাই, তোমার বুদ্ধি সেখানে যে সত্যের সন্ধান পায় না তাহা সত্য নহে কারণ তোমার বুদ্ধি সেখানে তাহা পাইতেছে না। যাহাদের চিন্তা সাম্প্রদায়িক, সঙ্কীর্ণ, তাহারাই এরূপ ভুল করিবে—যাহাদের ভগবৎ

অনুভূতি হইয়াছে, যাহাদের মন মুক্ত এবং আলোকসম্পন্ন তাঁহারা সত্যের সন্ধান করিতে এরূপ সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হন না। যে সত্য হৃদয়ের গভীর অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ হইয়াছে অথবা যাহা হৃদয়স্থিত সর্ব্ব জ্ঞানের ঈশ্বর, সনাতন বেদবিদের নিকট হইতে শুনা গিয়াছে তাহা শ্রুতই হউক, আর অশ্রুতই হউক—তাহাই প্রকৃত সত্য।

দশম অধ্যায়

বুদ্ধি যোগ

শেষ দুইটী প্রবন্ধে আমি একটু অবান্তর ভাবেই দার্শনিক মতবাদের আলোচনা করিয়াছি। সে আলোচনা মোটেই গভীর বা যথেষ্ট নহে। গীতার যে বিশেষ পদ্ধতি তাহা বুঝানই উক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য। গীতা প্রথমে একটি আংশিক সত্যের ব্যাখ্যা করিয়াছে এবং তাহার গূঢ়তম অর্থ সম্বন্ধে সংযতভাবে দুই একটি ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছে। তাহার পর গীতা ফিরিয়া আসিয়া এই ইঙ্গিতগুলির প্রকৃত অর্থ বাহির করিয়াছে এবং ক্রমে তাহার শেষ মহান্ বক্তব্যে উঠিয়াছে। এই শেষ কথাই শ্রেষ্ঠ রহস্য, গীতা মোটেই ইহা ব্যাখ্যা করে নাই, জীবনে অনুভব করিতে ছাড়িয়া দিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের ভারতীয় সাধকগণ প্রেম, আত্মসমর্পণ ও উল্লাসের মহান্ তরঙ্গের মধ্যে ইহা জীবনে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমন্বয়ের দিকে সকল সময়েই গীতার দৃষ্টি এবং গীতার সকল কথাই সেই শেষ মহান্ সিদ্ধান্তের আয়োজন মাত্র।

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন, জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে তোমায় বলিলাম, এখন কর্ম্মযোগ বিষয়ে যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। (২।৩৯) তুমি তোমার কর্ম্মের ফল ভাবিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছ, তুমি অন্যরূপ ফল কামনা করিতেছ এবং সেই ফলের সম্ভাবনা না দেখিয়া তুমি কর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ফল সম্বন্ধে এরূপ ধারণা—ফল

কামনাতেই কর্ম্ম করিতে হয়, কর্ম্ম শুধু বাসনা তৃপ্তিরই উপায় এরূপ ভাব অজ্ঞানীদের বন্ধনের কারণ। এরূপ অজ্ঞানীরা জানে না যে কর্ম্ম কি, কর্ম্মের প্রকৃত উৎস কোথায়, কর্ম্মের প্রকৃত ধারা কি এবং মহৎ উপযোগিতা কি। আমি যে যোগের কথা বলিতেছি তাহার দ্বারা তুমি সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে—কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি। তুমি অনেক জিনিষকেই ভয় করিতেছ—তুমি পাপকে ভয় করিতেছ, দুঃখকে ভয় করিতেছ, নরক ও শাস্তিকে ভয় করিতেছ, ভগবানকে ভয় করিতেছ, ইহকালকে ভয় করিতেছ, পরকালকে ভয় করিতেছ, তুমি নিজে নিজেকেই ভয় করিতেছ। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া, জগতের শ্রেষ্ঠ বীর হইয়া ভয় পাইতেছ না কিসে? কিন্তু, যে মহাভয় মানব সকলকে আক্রমণ করে তাহাই এই—পাপের ভয়, ইহকালে পরকালে দুঃখের ভয়, যে সংসারের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে তাহারা অজ্ঞ সেই সংসারের ভয়, যে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ তাহারা দেখে নাই এবং যাঁহার বিশ্বলীলার গূঢ় রহস্য তাহারা বুঝে না সেই ভগবানের ভয়। আমি যে যোগের কথা বলিতেছি তাহা তোমাকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে এবং ইহার অতি স্বল্পমাত্রাও তোমাকে মুক্তি আনিয়া দিবে—স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। একবার তুমি এই পথে যাত্রা করিলেই বুঝিবে যে একটি পদক্ষেপও বৃথা যায় না; প্রত্যেক সামান্য ঘটনাতেই কিছু লাভ হইবে; তুমি দেখিবে যে এমন কোন বাধাই নাই যাহা তোমার অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে পারে। ভগবান এই যে এত বড় চরম প্রতিজ্ঞা করিলেন—যে সকল ভয়গ্রস্ত ইতস্ততঃকারী মানুষ জীবনে পদে পদে বাধা পাইতেছে, ঠকিতেছে তাহারা সহসা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না; ভগবানের এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণ অর্থও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না যদি না গীতার

বাণীর এই প্রথম কথাগুলির সঙ্গে আমরা সেই শেষ কথাগুলিও স্মরণ করি—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥১৮।৬৬

—"ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সকল বিধিনিষেধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, আমিই তোমাকে সর্ব্ববিধ পাপ ও অশুভ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।"

কিন্তু, মানুষের প্রতি ভগবানের এই গভীর মর্ম্মস্পর্শী বাণী প্রথমেই বলা হয় নাই। পথের জন্য যতটুকু আলোর প্রয়োজন প্রথমে শুধু ততটুকুই দেওয়া হইয়াছে। এই আলো আত্মার উপর নহে, বুদ্ধির উপরেই ফেলা হইয়াছে। ভগবান প্রথমে মানুষের সুহৃদ ও প্রণয়ীরূপে কথা বলিলেন না—গুরু ও পথপ্রদর্শকরূপেই এমন কথা বলিলেন যেন তাহার প্রকৃত আত্মা সম্বন্ধে, সংসারের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এবং তাহার কার্য্যের প্রকৃত উৎস ও মূল সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞানতা দূর হইয়া যায়। কারণ, মানুষ অজ্ঞানের সহিত, ভ্রান্ত বুদ্ধির সহিত এবং সেই জন্যই ভ্রান্ত ইচ্ছারও সহিত কার্য্য করে বলিয়া মানুষ তাহার কার্য্যের দ্বারা বদ্ধ হয় অথবা বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; নতুবা মুক্ত আত্মার নিকট কর্ম্ম বন্ধন হয় না। এই ভ্রান্ত বুদ্ধির জন্যই মানুষের আশা ও আশঙ্কা, ক্রোধ, শোক এবং ক্ষণস্থায়ী হর্ষ হয়; নতুবা সম্পূর্ণ শান্তি ও মুক্তির সহিত কর্ম্ম করা সম্ভব। অতএব অর্জ্জুনকে প্রথমেই বুদ্ধিযোগের পরামর্শ দেওয়া হইল। অভ্রান্ত বুদ্ধির সহিত, এবং সেই জন্যই অভ্রান্ত ইচ্ছার সহিত, তদেকচিত্ত হইয়া, সর্ব্বভূতে এক আত্মা জানিয়া আত্মার শান্ত সমতা হইতে কার্য্য করা,

অজ্ঞান মনের অসংখ্য কামনার বশে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি না করা—ইহাই বুদ্ধিযোগ।

গীতা বলে মানুষের দুই প্রকার বুদ্ধি আছে। প্রথম প্রকার বুদ্ধি শান্ত, ব্যবস্থিত, এক, সম, কেবল মাত্র সত্যই ইহার লক্ষ্য। ঐক্য ইহার লক্ষণ, স্থির একাগ্রতা ইহার স্বরূপ। দ্বিতীয় প্রকারের বুদ্ধিতে কোন একাগ্র ইচ্ছা নাই, কোন নিশ্চয়াত্মিকতা নাই—জীবনে যত প্রকার কামনা আছে তাহার দ্বারাই উহা ইতস্ততঃ চালিত হয়।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥২।৪১

বুদ্ধি শব্দটি যে ব্যবহার করা হইয়াছে ইহার সঠিক অর্থ হইতেছে মনের বোধ শক্তি—কিন্তু, গীতায় ইহা ব্যাপক দার্শনিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মনের যে ক্রিয়ার দ্বারা আমরা বিচার করি এবং নির্দ্ধারণ করি যে আমাদের চিন্তা কিরূপ হইবে এবং আমাদের কর্ম্ম কিরূপ হইবে—সেই সমগ্র ক্রিয়াকেই গীতাতে বুদ্ধি বলা হইয়াছে; চিন্তা (thought), বুদ্ধি (intelligence), বিচার (judgment), প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন (perceptive choice) এবং লক্ষ্যস্থির (aim) এই সমস্তকেই বুদ্ধিক্রিয়ার অন্তর্ভূত করা হইয়াছে; কারণ, শুধু জ্ঞানলাভ ব্যাপারে মনের নিশ্চয়াত্মিকতাই একনিষ্ঠা বুদ্ধির লক্ষণ নহে কিন্তু, কর্ম্মের লক্ষ্য নির্দ্ধারণ এবং সেই নির্দ্ধারণেই অবিচলিত থাকা, ব্যবসায়, বিশেষ করিয়া ইহাই একনিষ্ঠা বুদ্ধির লক্ষণ; অন্যদিকে চিন্তার বিক্ষিপ্ততা বিক্ষিপ্ত বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ নহে—যাহাদের লক্ষ্যের স্থিরতা নাই, "লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনার" পশ্চাতে যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় বিশেষ করিয়া তাহাদের বুদ্ধিই বিক্ষিপ্ত। অতএব, ইচ্ছা (will) এবং জ্ঞান (knowledge) এই

দুইটিই বুদ্ধির* ক্রিয়া। ব্যবসায়াত্মিকা একনিষ্ঠা বুদ্ধি—আত্মার আলোকে নিবদ্ধ, ইহা আভ্যন্তরীণ আত্মজ্ঞানে কেন্দ্রীভূত। অন্যদিকে অব্যবসায়ীদের অনন্ত ও বহুশাখাযুক্ত বুদ্ধি—যেটি একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিষ সেটিকেই ভুলিয়া চঞ্চল বিক্ষিপ্ত মনের বশ হয়, বাহ্য জীবনের কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলে "শতখানে ধায়, শত স্বার্থের মাঝখানে"। ভগবান বলিয়াছেন—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥২।৪৯

—"হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট, অতএব, তুমি বুদ্ধিযোগ আশ্রয় কর; যাহারা কর্ম্মফলের চিন্তা করে, ফলের উদ্দেশ্যে কার্য্য করে তাহারা অতি নিকৃষ্ট ও হতভাগ্য ব্যক্তি।"

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে সাংখ্য মনস্তত্ত্বের যে পারম্পর্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছে, গীতা তাহা স্বীকার করিয়াছে। একদিকে পুরুষ শান্ত আত্মা, নিষ্ক্রিয়, অক্ষর, এক, তাহার বিকাশ নাই; অন্য দিকে প্রকৃতি সচেতন পুরুষকে ছাড়া নিষ্ক্রিয় (inert), কিন্তু সচেতন পুরুষের সন্নিধি মাত্রেই ক্রিয়াশীলা, প্রকৃতি নিরবয়ব (indeterminate), ত্রিগুণময়ী, বিকাশশীলা, সৃষ্টি ও প্রলয়ে সমর্থা। আমাদের ভিতরে ও বাহিরে যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি সে সমুদয় প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন। আমাদের কাছে যেটা ভিতরের (subjective) সেইটিই প্রথমে উৎপন্ন হয়, কারণ আত্মচেতনাই প্রথম কারণ—অচেতন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বিতীয় কারণ এবং ইহা প্রথমের অধীন। কিন্তু, তাহা হইলেও আমাদের অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ প্রকৃতিই সরবরাহ করে, পুরুষ নহে। যথাক্রমে

* শ্রীঅরবিন্দ বুদ্ধি শব্দের ইংরাজী অনুবাদে বলিয়াছেন—intelligent will. —অনুবাদক।

প্রথমে আসে বুদ্ধি ও তাহার অধীন অহঙ্কার। ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় স্তরে বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয় মন (sense-mind); যে শক্তির দ্বারা বিষয় বৈচিত্র্য গ্রহণ করা হয় তাহাই এই। বিকাশের তৃতীয় স্তরে মন হইতে দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। তাহার পর উৎপন্ন হয় প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি—শব্দ, রূপ, গন্ধ ইত্যাদি এবং ইহাদের ভিত্তি স্বরূপ পঞ্চভূত। আকাশ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চভূতের বিভিন্ন মিশ্রণের ফলে এই বাহ্য জগতের বস্তু সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রাকৃতিক শক্তির এই সকল ভিন্ন ক্রম ও শক্তি সমূহ পুরুষের শুদ্ধ চেতনায় প্রতিফলিত হইয়া আমাদের অশুদ্ধ অন্তঃকরণের উপাদান হয়—অশুদ্ধ, কারণ ইহার ক্রিয়া বাহ্যজগতের প্রত্যক্ষ সমূহের উপর এবং তাহাদের আন্তরিক প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক জড় বুদ্ধি ও জড় মনের ক্রিয়া আত্মার চেতনায় প্রতিফলিত হইয়া চেতন বুদ্ধি ও চেতন মন রূপে প্রতিভাত হয়। বাসনা, কামনা, উদ্বেগ এই মনের খেলা। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় অন্তঃকরণের সহিত বাহ্যজগতের যোগ করাইয়া দেয়। বাকী পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত ইন্দ্রিয়ের বিষয়—ইহাদিগকে লইয়াই বাহ্য জগৎ।

সৃষ্টির যে ক্রম, যে পারম্পর্য্য দেখাইলাম বাহ্যজগতে ইহার উল্টা দেখা যায় বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু যদি আমরা স্মরণ রাখি যে বুদ্ধি নিজেই অচেতন প্রকৃতির জড়ক্রিয়া মাত্র এবং জড় অণুতেও এরূপ অচেতন বোধশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি আছে—যদি বৃক্ষলতায় আমরা সুখদুঃখ বোধ, স্মৃতি, ইচ্ছা প্রভৃতির সূচনা দেখিতে পাই, যদি দেখি যে প্রকৃতির এই সকল শক্তিই অন্যান্য জীব ও মনুষ্যের চৈতন্যের ক্রমবিকাশে অন্তঃকরণ

হইয়াছে তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে বর্ত্তমান বিজ্ঞান জড়-জগতের পর্য্যবেক্ষণের ফলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে সাংখ্য প্রণালীর সহিত তাহার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। আত্মা যখন প্রকৃতি হইতে পুরুষের অবস্থায় ফিরিয়া যায় তখন প্রকৃতির পূর্ব্ব অভিব্যক্তির উল্টা ক্রম অবলম্বন করিতে হয়। উপনিষদে আত্মশক্তির ক্রমবিকাশের এইরূপ ক্রমই দেখান হইয়াছে এবং গীতা এ বিষয়ে উপনিষদকেই অনুসরণ করিয়াছে, প্রায় উপনিষদের বাক্যই অবলম্বন করিয়াছে।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥৩।৪২

—"ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মন ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাই তিনি"—সেই চৈতন্যময় আত্মা, পুরুষ। তাই, গীতা বলিয়াছে যে এই পুরুষকে, আমাদের অন্তর্জীবনের এই শ্রেষ্ঠ কারণকে বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে হইবে, জানিতে হইবে; তাহাতেই আমাদের ইচ্ছা ন্যস্ত করিতে হইবে।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৩।৪৩

এইরূপে আমাদের নীচের প্রকৃতিস্থ আত্মাকে শ্রেষ্ঠ, প্রকৃত, চেতন আত্মার দ্বারা স্থির ও শান্ত করিয়া আমরা আমাদের শান্তি এবং আত্মসংযমের দুর্দ্ধর্ষ, অশান্ত সদাব্যস্ত শত্রু কামকে বিনাশ করিতে পারি।

বুদ্ধির ক্রিয়া দুই প্রকার হইতে পারে। বুদ্ধি নিম্নে ত্রৈগুণ্যময়ী প্রকৃতির খেলার দিকে অথবা ঊর্দ্ধ চৈতন্যময় শান্ত আত্মার পবিত্র স্থায়ী শান্তির দিকে যাইতে পারে। প্রথম গতি বহির্মুখী। প্রথম ক্ষেত্রে মানুষ ইন্দ্রিয় বিষয়ের অধীন হয়, বাহ্যস্পর্শ লইয়াই থাকে। এই জীবন কামনার

জীবন। কারণ, ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয়ের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া অশান্তি সৃষ্টি করে এমন কি অনেক সময় অত্যুগ্র উপদ্রবের সৃষ্টি করে, ঐ সকল বিষয়কে লাভ ও ভোগ করিবার জন্য বাহিরের দিকে প্রবল ঝোঁক উৎপন্ন করে এবং তাহারা মনকে হরণ করিয়া লয়, বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি—"যেমন বায়ু নৌকাকে সমুদ্রে বিশৃঙ্খল ভাবে ভ্রমণ করায়" ; ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ উপদ্রবে মন বাসনা, আবেগ, উদ্বেগ, তীব্র লালসার অধীন হইয়া পড়ে এবং এই কামাধীন মন বুদ্ধিকেও টানিয়া লয়—তখন বুদ্ধি শান্ত বিচার-শক্তি ও বিবেক হারাইয়া ফেলে—সংযম হারাইয়া ফেলে। বুদ্ধির এইরূপ নিম্নগতির ফলে আত্মা প্রকৃতির গুণত্রয়ের চিরদ্বন্দ্বের অধীন হইয়া পড়ে ; অজ্ঞান, মিথ্যা ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবন, শোক দুঃখের অধীনতা, আসক্তি, কাম, ক্রোধ—এই সকল নিম্নগামিনি বুদ্ধির পরিণাম, ইহাই সাধারণ অজ্ঞানী অসংযমী মানুষের দুঃখময় জীবন। বেদবাদীদের ন্যায় যাহারা ইন্দ্রিয়ভোগকেই কর্ম্মের লক্ষ্য করে এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই আত্মার শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করে তাহারা মানুষকে ভ্রান্ত পথ দেখায়। বাহ্যবিষয়ের অধীনতা ছাড়াইয়া অন্তরের ভিতর যে আত্মারাম তাহাই আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য এবং শান্তি ও মুক্তির উচ্চ উদার অবস্থা।

অতএব, বুদ্ধির যে ঊর্দ্ধ অন্তর্মুখী গতি তাহাই আমাদিগকে দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত, স্থিরনিশ্চয়তা ও অধ্যবসায়ের (ব্যবসায়) সহিত অবলম্বন করিতে হইবে ; বুদ্ধিকে দৃঢ়ভাবে পুরুষের শান্ত আত্মজ্ঞানে লাগাইয়া রাখিতে হইবে। প্রথমে যে আমাদিগকে কামনা ছাড়িতে চেষ্টা করিতেই হইবে তাহা বেশ বুঝা যায়, কারণ ইহাই সমস্ত অশুভ ও দুঃখের সমগ্র মূল ; এবং কামনা ছাড়িতে হইলে কামনার কারণেরও শেষ করিতে হইবে—ইন্দ্রিয়গণ যে বাহ্যবস্তু ধরিতে ও ভোগ করিতে ছুটিয়া যায় তাহা বন্ধ করিতে হইবে।

ইন্দ্রিয়গণ যখন বাহিরের দিকে ছুটিতে চায় তখন তাহাদিগকে ফিরাইতে হইবে, তাহাদের ভোগ্য বিষয় হইতে তাহাদিগকে সরাইয়া আনিতে হইবে—কচ্ছপ যেমন স্বীয় করচরণাদি অঙ্গ বাহির হইতে সঙ্কুচিত করিয়া দেহ-মধ্যে রাখে তেমনই ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের মূলে রাখিতে হইবে, মনে বিলীন করিতে হইবে, মনকে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধিকে আত্মাতে এবং আত্মজ্ঞানে বিলীন করিতে হইবে, প্রকৃতির কার্য্য দেখা হইবে কিন্তু তাহার অধীন হওয়া চলিবে না—বাহ্যজগৎ যাহা দিতে পারে এমন কোন বস্তু কামনা করা চলিবে না।

পাছে বুঝিতে ভুল হয় তাই পরক্ষণেই কৃষ্ণ নির্দ্দেশ করিলেন যে তিনি বাহ্য কঠোরতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর শারীরিক প্রত্যাখ্যান শিক্ষা দেন নাই। সাংখ্যেরা যে সন্ন্যাস শিক্ষা দেয় অথবা উপবাস, শরীরের পীড়ন প্রভৃতির দ্বারা কঠোর তপস্বিগণ যে তপস্যা করেন তাহা ভগবানের উপদেশ নহে; ভগবান যে প্রত্যাহার ও সংযমের শিক্ষা দিয়াছেন তাহা অন্যরূপ, তাহা আন্তরিক প্রত্যাহার—কামনা পরিত্যাগ। দেহী আত্মার যে দেহ তাহার সাধারণ ক্রিয়ার জন্য সাধারণতঃ আহারের আবশ্যক। আহার পরিত্যাগ করিলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সহিত বাহ্য সংস্পর্শ দূর হয় বটে—কিন্তু, যে আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধের জন্য এই সংস্পর্শ অনিষ্টজনক সেই সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায় না। বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের যে সুখ, রস, তাহা থাকিয়া যায়—রাগ ও দ্বেষ থাকিয়া যায় কারণ এই দুইটিই রসের দুইটা দিক মাত্র; কিন্তু রাগ দ্বেষ শূন্য হইয়া বিষয় গ্রহণ করিবার যে সামর্থ্য তাহাই লাভ করিতে হইবে। নতুবা, বিষয়ের নিবৃত্তি হইবে বটে কিন্তু মনের নিবৃত্তি হইবে না; কিন্তু, ইন্দ্রিয় সকল মনেরই ভিতরের জিনিষ এবং ভিতরে রসের শেষই আত্মজয়ের প্রকৃত চিহ্ন। কিন্তু, ইহা কিরূপে সম্ভব

যে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইবে অথচ কামনা থাকিবে না, রাগ দ্বেষ থাকিবে না? ইহা সম্ভব—পরং দৃষ্টা; পর, আত্মা, পুরুষের দর্শন লাভ করিয়া এবং বুদ্ধিযোগের দ্বারা সমস্ত মনপ্রাণ লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অথবা এক হইয়া তাহার মধ্যে বাস করিয়া ইহা সম্ভব হয়। কারণ সেই এক আত্মা শান্তিময়, আত্মানন্দেই সন্তুষ্ট; আমরা যদি একবার সেই পরম বস্তুকে আমাদের মধ্যে দেখিতে পাই এবং আমাদের মন ও বুদ্ধি তাহাতে নিবিষ্ট করিতে পারি তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যে রাগ দ্বেষ তাহার পরিবর্ত্তে আমরা দ্বন্দ্বশূন্য সেই আত্মানন্দ লাভ করিব। ইহাই মুক্তির প্রকৃত পন্থা।

আত্মসংযম, আত্মজয় যে সহজ নহে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সকল বুদ্ধিমান মনুষ্যই জানে যে তাহাদিগকে কোন রকম আত্মসংযম করিতেই হইবে এবং ইন্দ্রিয়সংযম করিতে যত উপদেশ দেওয়া হয় এত বোধ হয় আর কোন বিষয়েই দেওয়া হয় না; কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ উপদেশ নিতান্ত অসম্পূর্ণ ভাবে দেওয়া হয় এবং নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং সঙ্কীর্ণ ভাবে পালিত হয়। এমন কি যে সকল জ্ঞানী, বিবেকী পুরুষ সম্পূর্ণ আত্মজয়ের জন্য প্রকৃত ভাবেই চেষ্ট যত্ন করেন ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের মনকেও বলপূর্ব্বক হরণ করে—

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥২।৬০

ইহার কারণ এই যে মন স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়গণের অনুগামী হয়; মন ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিতে রস পায়, সে গুলিতে নিবিষ্ট হয় এবং সে গুলিকে বুদ্ধির একান্ত চিন্তার বিষয় এবং ইচ্ছার তীব্র আকর্ষণের বিষয় করিয়া তুলে। এইরূপে আসক্তির উদয় হয়, আসক্তি হইতে কামনা হয়;

এই কামনার তৃপ্তি না হইলে দুঃখ হয়, বাধা পাইলে ক্রোধ হয়; ক্রোধ হইতে আত্মার মোহ উপস্থিত হয়—বুদ্ধি তখন শান্ত, সাক্ষী আত্মাকে দেখিতে এবং তাহাতে নিবিষ্ট হইতে ভুলিয়া যায়—প্রকৃত আত্মার স্মৃতি লোপ পায় এবং এইরূপ লোপের দ্বারা বুদ্ধিও মোহগ্রস্ত হয়, এমন কি বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ, কিছুকালের জন্য ইহা আর আমাদের আত্মস্মৃতিতে থাকে না—দুঃখ ক্রোধাদির আতিশয্যে ইহা অদৃশ্য হয়; আমরা আত্মা ও বুদ্ধির পরিবর্ত্তে ক্রোধ, শোক, দুঃখাদিময় হইয়া উঠি।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥২।৬২।৬৩

অতএব, ইহা কিছুতেই ঘটিতে দেওয়া চলিবে না এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণভাবে বশে আনিতে হইবে কারণ ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিয়াই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥২।৬১

শুধু বুদ্ধির দ্বারা, মানসিক সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করা সম্ভব নহে, ইহার জন্য চাই কোন উচ্চতর সত্তার সহিত যোগ; এমন কোন বস্তুর সহিত যোগের প্রয়োজন যাহাতে শান্তি ও আত্মসংযম স্বভাবতঃই রহিয়াছে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানে সমর্পণ করিলে, কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আমাতে" সমর্পণ করিলে তবেই এই যোগ সাফল্য লাভ করিতে পারে; কারণ মুক্তিদাতা আমাদের

ভিতরেই রহিয়াছেন, তবে আমাদের মন, বুদ্ধি বা ইচ্ছা তাহা নহে—এগুলি তাঁহার যন্ত্র মাত্র। ইনি সেই ঈশ্বর, সর্ব্বতোভাবে যাঁহার শরণ লইবার কথা গীতার শেষে বলা হইয়াছে। এবং ইহার জন্য প্রথমে তাঁহাকেই আমাদের সমগ্র জীবনের লক্ষ্য করিতে হইবে এবং তাঁহার সহিত আত্মার স্পর্শ রাখিতে হইবে। "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" এই বাক্যের ইহাই প্রকৃত অর্থ; কিন্তু, গীতার যেমন ধরণ, এখানে শুধু এই অর্থের সঙ্কেতমাত্র করা হইয়াছে। যে সর্ব্বোত্তম রহস্য পরে ব্যক্ত করা হইবে তাহার সারটুকু বীজরূপে এই তিনটি কথার ভিতর রহিয়াছে—যুক্ত আসীত মৎপরঃ।

যদি এইরূপ করা হয় তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণভাবে অন্তরাত্মার বশীভূত করিয়া বিষয় সমূহের মধ্যে বিচরণ করা যায়—তাহাদের স্পর্শ গ্রহণ করা যায়, তাহাদের উপর কার্য্য করা যায়—সেই সকল বিষয়ের ও তাহাদের প্রতি রাগদ্বেষের অধীন হইতে হয় না,—ঐ অন্তরাত্মা আবার পরমাত্মার, পুরুষের অধীন হয়। তখন বিষয় সমূহের প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্ত ইন্দ্রিয়গণ রাগদ্বেষের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে, কামনা বাসনার দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইবে এবং মানুষ সুখময় শান্তি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥২।৬৫

এই আত্মপ্রসাদই আত্মার প্রকৃত সুখের মূল; এইরূপ শান্ত প্রসন্ন আত্মাকে কোন দুঃখই স্পর্শ করিতে পারে না; দুঃখের অবসান হয়। এইরূপ আত্মজ্ঞানে, আত্মপ্রসাদে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধির শান্ত, বাসনাশূন্য, শোকশূন্য স্থিরতাকেই গীতাতে সমাধি বলা হইয়াছে।

সমাধিস্থ লোকের লক্ষণ ইহা নহে যে তাঁহার বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লোপ পাইবে, তাঁহার শরীর ও মনের জ্ঞানও লোপ পাইবে এমন কি তাহার শরীর দগ্ধ করিলেও তাঁহার জ্ঞান হইবে না; সাধারণতঃ সমাধি বলিতে এই অবস্থায়ই বুঝায়—কিন্তু ইহা সমাধির প্রধান চিহ্ন নহে, ইহা শুধু এক বিশেষ গভীর অবস্থা, সমাধি হইলেই যে এইরূপ অবস্থা হইবে তাহা নহে। সমাধিস্থ ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ এই যে তাঁহার ভিতর হইতে সমস্ত কামনা দূর হয়, তাহারা মনে প্রবেশ করিতে পারে না; যে আন্তরিক অবস্থা হইতে এইরূপ মুক্তির উৎপত্তি—শুভাশুভ, সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদে অবিচলিত মন সহ আত্মার আত্মাতেই যে তৃপ্তি তাহাই প্রকৃত সমাধি। সমাধিস্থ ব্যক্তি বাহিরে কার্য্য করিলেও তাঁহার ভাব অন্তর্মুখী; বাহিরের বস্তুর দিকে যখন তিনি তাকাইয়া থাকেন তখনও আত্মাতেই তিনি নিবদ্ধ থাকেন; যখন সাধারণের চক্ষুতে তাঁহাকে দেখায় যে তিনি সাংসারিক বাহ্য ব্যাপারে ব্যস্ত, তখন সম্পূর্ণ ভাবে ভগবানের দিকেই তাঁহার লক্ষ্য থাকে। সাধারণ মানুষের ন্যায়ই অর্জ্জুন জানিতে চাহিলেন যে এই মহান্ সমাধির এমন বাহিক লক্ষণ কি আছে যাহার দ্বারা এই অবস্থা চিনিতে পারা যায় :—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥২।৫৪

—"হে কেশব, সমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কি বলেন? কিরূপ থাকেন? কিরূপ চলেন?"

কিন্তু এরূপ কোন লক্ষণ দেওয়া যায় না এবং গুরু তাহা দিবার চেষ্টাও করিলেন না; কারণ, এরূপ অবস্থার একমাত্র নিদর্শন আভ্যন্তরীণ। যে আত্মা মুক্তিলাভ করিয়াছে তাহার মহান্ ভাব সমতা

এবং যে সব সহজ লক্ষণ দেখিয়া এই সমতার অবস্থা বুঝা যায় সে সবও আন্তরিক (Subjective)।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥২।৫৬

দুঃখ উপস্থিত হইলে অক্ষুব্ধচিত্ত, সুখে নিস্পৃহ এবং আসক্তি ভয় ও ক্রোধ শূন্য যে মুনি তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহাতে প্রকৃতির ত্রিগুণের ক্রিয়া নাই, দ্বন্দ্ব নাই—তিনি তাঁহার প্রকৃত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার পাওয়া থাকা কিছু নাই, তিনি আত্মাকে পাইয়াছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥২।৪৫

একবার যদি আমরা আত্মাকে পাই তখন সকল বস্তুই আমাদের পাওয়া হয়।

অথচ তিনি কর্ম্ম হইতে বিরত হন না। এই খানেই গীতার মৌলিকত্ব ও শক্তি যে এইরূপ সমাধির কথা বলিয়া এবং মুক্ত আত্মার নিকট প্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়ার শূন্যতার কথা বলিয়াও গীতা কর্ম্ম সমর্থন করিয়াছে, কর্ম্ম করিবার আদেশ দিয়াছে। যে সকল দর্শন শাস্ত্র শুধু কঠোর তপস্যা ও নীরবতার প্রশংসা করিয়া লোককে কর্ম্মহীন করিয়া তুলে গীতা তাহাদের সেই দোষ এইরূপে সংশোধন করিয়াছে; আজ আমরা দেখিতে পাই যে এই সকল দর্শনমত এই দোষ এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥২।৪৭

—"তোমার কর্ম্মে অধিকার, কিন্তু কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে

নহে, কর্ম্মের ফলের জন্যই যেন কর্ম্ম করিও না, কর্ম্ম না করিতেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।" অতএব বেদবাদীরা কামনার সহিত যে কার্য্য করে সেরূপ কার্য্য এখানে অনুমোদিত হয় নাই; যে সকল রজোগুণসম্পন্ন অস্থির লোক কর্ম্মে তৃপ্তি পায়, সর্ব্বদা কর্ম্ম করিবার জন্য যাহাদের মন ব্যাকুল তাহাদের মত কর্ম্ম করিতেও গীতা এখানে উপদেশ দেয় নাই।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥২।৪৮

—"যোগস্থ হইয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ না করিয়া তুমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। চিত্তের এই সমতারই নাম যোগ।" প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কোন্‌টা অপেক্ষাকৃত ভাল বা মন্দ, তাহা বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হইলে, পাপের ভয় থাকিলে, পুণ্যের দিকে কঠিন চেষ্টা করিতে হইলে কাজ করা দায় হইয়া উঠে। কিন্তু, যে মুক্ত পুরুষ তাঁহার বুদ্ধি ও ইচ্ছাকে ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়াছেন তিনি এই দ্বন্দ্বময় সংসারেই পাপ ও পুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করেন—

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।

কারণ, তিনি পাপ পুণ্যের উপরে যে নীতি তাহাতে উঠেন—সেই নীতি আত্মজ্ঞানের স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এরূপ কামনাশূন্য কর্ম্মের স্থিরনিশ্চয়তা বা সাফল্য হইতে পারে না, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য না করিলে সে কার্য্য ভাল হইবে না, উদ্ভাবিনী শক্তিরও সম্যক বিকাশ হইতে পারিবে না। কিন্তু ইহা ঠিক নহে; যোগস্থ হইয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহা শুধু সর্ব্বোচ্চ নহে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত—সাংসারিক ব্যাপারেও এইরূপ কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক শক্তি সম্পন্ন ও কার্য্যকরী ; কারণ সর্ব্ব কর্ম্মের যিনি অধীশ্বর তাঁহার ইচ্ছা ও জ্ঞানের আলোকে এরূপ কর্ম্ম আলোকিত। যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। কিন্তু, দুঃখযন্ত্রণাময় মানব জন্মের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভই যে যোগীর লক্ষ্য বলিয়া সকলে স্বীকার করেন—সাংসারিক কর্ম্ম করিতে যাইলে কি সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে না? না, তাহাও হইবে না ; যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি ফলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের সহিত যোগে কর্ম্ম করেন তাঁহারা জন্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হন এবং সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন—সেখানে শোকদুঃখময় মানব জীবনের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥২।৫১

তিনি যে পদ প্রাপ্ত হন তাহা হইতেছে ব্রাহ্মীস্থিতি ; তিনি ব্রহ্মে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। সংসার-বদ্ধ জীবের যে অবস্থা, যে জ্ঞান, যে অভিজ্ঞতা, যে অনুভূতি—ইহা তাহার বিপরীত। এই যে দ্বন্দ্বময় জীবন তাহাদের নিকট দিবসের স্বরূপ—এই জীবন তাহাদের জাগ্রতাবস্থা, তাহাদের চেতনা—এই অবস্থাতেই তাহারা কার্য্য করিবার, জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ পায়—এই জীবন যোগীর নিকট রাত্রি স্বরূপ, আত্মার কষ্টকর নিদ্রা এবং অন্ধকার স্বরূপ ; আবার তাহাদের যাহা রাত্রি, যে নিদ্রার অবস্থায় সমস্ত জ্ঞান ও ইচ্ছা বন্ধ হয় তাহাতে সংযমী জাগ্রত হন, সেই অবস্থাতেই তাঁহার প্রকৃত জীবন, তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির উজ্জ্বল দিবস।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥২।৬৯

—"সাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা রাত্রি স্বরূপ সেই রাত্রিতে জিতেন্দ্রিয় যোগী জাগ্রত থাকেন; যাহাতে সাধারণ ব্যক্তিগণ জাগিয়া থাকে, স্থিতপ্রজ্ঞের তাহা রাত্রি স্বরূপ।"—সংসারাবদ্ধ অজ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্দ্দমাক্ত সামান্য জলের মত—কামনার সামান্য বেগেই বিচলিত হইয়া উঠে; যোগী চেতনার বিশাল সমুদ্রের ন্যায়—সকল সময়েই তাহা পূরিত হইতেছে তথাপি তাহা আত্মার বিরাট শান্তিতে নিথর, নিশ্চল; সমুদ্রে যেমন জল প্রবেশ করে, তেমনই সংসারের সমস্ত কামনা তাহাতে প্রবেশ করে—তথাপি তাঁহার কোন কামনাই নাই এবং তিনি বিন্দু মাত্র বিচলিতও হ'ন না—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥২।৭০

যেমন সমস্ত নদ নদীর জলে পরিপূর্ণ অতল গম্ভীর সমুদ্রে বর্ষার বারিধারাও আসিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ শব্দাদি বিষয় সকল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে প্রবিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সে মহাত্মা কখনও বিক্ষোভযুক্ত না হইয়া বরং শান্তিই লাভ করিয়া থাকেন। কারণ, সাধারণ ব্যক্তিরা আমি, আমার, তোমার এই সকল দুঃখদায়ক জ্ঞানে পূর্ণ কিন্তু যোগী ব্যক্তি সর্ব্বত্র যে আত্মা রহিয়াছে তাহার সহিত এক এবং তাঁহাতে "আমি" বা "আমার" এরূপ ভাব নাই।—তিনি অপরের ন্যায়ই কার্য্য করেন কিন্তু সমস্ত কাম, সমস্ত লালসা বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি পরম শান্তি লাভ করেন এবং বাহ্যদৃশ্যে বিচলিত হন না; তিনি সেই একের ভিতর নিজের ক্ষুদ্র আমিত্ব নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছেন, সেই একত্বের

মধ্যে তিনি বাস করেন এবং মৃত্যুকালে সেই ব্রাহ্মীস্থিতিতে থাকিয়া ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥২।৭২

গীতায় এই যে নির্ব্বাণের কথা বলা হইয়াছে ইহা বৌদ্ধমতানুযায়ী আত্মলোপ সাধন নহে; ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র সত্তাকে সেই এক অনন্ত সত্তার বিরাট সত্যের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়াকে গীতাতে নির্ব্বাণ বলা হইয়াছে।

এইরূপে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তকে সূক্ষ্মভাবে মিশাইয়াই গীতাশিক্ষার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ইহা মোটেই সব নহে; কার্য্যতঃ জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্ব সাধন যে অবশ্য প্রয়োজন তাহাই এখানে সাধিত হইয়াছে; আত্মার চরম পূর্ণতার যে তৃতীয় উপাদান—ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি, এপর্য্যন্ত কেবল তাহার সঙ্কেত মাত্র করা হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দের গীতা।

তৃতীয় খণ্ড।

(শ্রীঅরবিন্দের Essays on the Gita হইতে অনুবাদিত)

অনুবাদক—

শ্রীঅনিলবরণ রায়।

দুই প্রকৃতি

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় লইয়াই গীতা-শিক্ষার প্রথম ভাগ রচিত হইয়াছে। ঐ প্রথম ভাগটি গীতা-কথিত সাধনা ও জ্ঞানের প্রাথমিক ভিত্তি। সেই ভাবেই গীতার বাকী দ্বাদশ অধ্যায়কে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবিশিষ্ট দুইটি ভাগ রূপে লইয়া আলোচনা করা যাইতে পাবে। প্রথম ভাগেব শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া এই দুই ভাগে গীতাশিক্ষার বাকী অংশ পরিস্ফুট করা হইয়াছে। গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা তাত্ত্বিক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; এবং সেই বর্ণনাকে ভিত্তি করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির নিগূঢ় সমন্বয় করা হইয়াছে, ঠিক যেমন গীতার প্রথম ভাগে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করা হইয়াছে।—গীতার সমন্বয়ের এই অবস্থায় মাঝখানে একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনার দ্বারা এই সমন্বয়কে জীবন্ত ও পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে; এবং ইহার সহিত জীবন ও কর্ম্মের সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে সমস্ত শিক্ষাটীকে পুনরায় ঘুরাইয়া অর্জ্জুনের গোড়াকার প্রশ্নে লইয়া আসা হইয়াছে;—বাস্তবিক অর্জ্জুনের সেই প্রথম প্রশ্নই গীতার সমগ্র শিক্ষার কেন্দ্র এবং গীতা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই প্রশ্নটীরই চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছে। পরে ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে গীতা পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদ করিয়া গুণত্রয়ের ক্রিয়া, গুণাতীত হওয়া, নিষ্কাম কর্ম্ম কেমন জ্ঞানে পরিণত হইয়া ভক্তির সহিত মিলিত হয়—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি এই তিন মিলিয়া এক হয়—এই সব সম্বন্ধে নিজের মত পরিস্ফুট

করিয়াছে; এবং সেখান হইতে তাহার শিক্ষার মহান্ চূড়ান্ত কথায় উঠিয়াছে, বিশ্বপ্রভু ভগবানে আত্মসমর্পণের গুহ্যতম রহস্য ব্যক্ত করিয়াছে।

গীতার এই দ্বিতীয় খণ্ডে কথাগুলি যেমন সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে, প্রথম খণ্ডে সেরূপ দেখা যায় না। যে সকল সংজ্ঞার দ্বারা মূল সত্যটি বুঝিবার সূত্র পাওয়া যায়, প্রথম ছয় অধ্যায়ে সে সব সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই; সংশয় সকল যেমন উঠিয়াছে তেমনিই তাহাদের সমাধান করা হইয়াছে। সেখানে গীতার শিক্ষাটি যেন একটু কষ্টে সৃষ্টে অগ্রসর হইয়াছে এবং অনেক কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা হইয়াছে। অনেক এমন কথা আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাদের সার্থকতা স্পষ্ট বুঝা যায় না।—কিন্তু এই দ্বিতীয় খণ্ডে মনে হয়, আমরা যেন আরও পরিষ্কার ভূমি পাইয়াছি। এখানে কথাগুলি আর তেমন আল্‌গা আল্‌গা নহে,—সোজাসুজি, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ভাবেই বলা হইয়াছে। কিন্তু, আবার এই সংক্ষিপ্ততার জন্যই এখানে ভুলের সম্ভাবনা বেশী; এবং যাহাতে প্রকৃত অর্থটী হারাইয়া না ফেলি সেজন্য আমাদিগকে এখানে খুব সাবধানতার সহিতই অগ্রসর হইতে হইবে। কারণ, এখানে আর আমরা বরাবর মানসিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নিশ্চিত ভূমির উপরে নাই। এখানে অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যকে, এমন কি, বিশ্বাতীত সত্যকেও এমন ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, যেন তাহা মন-বুদ্ধির গোচর হইতে পারে। এরূপ তাত্ত্বিক (metaphysical statement) বর্ণনার মুস্কিল এই যে, যাহা বাস্তবিক অনন্ত, অসীম, তাহাকে সংজ্ঞার মধ্যে বাঁধিবার চেষ্টা করিতে হয়, সসীম সান্ত মনের গোচর করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এরূপ চেষ্টা করা দরকার হয় বটে, কিন্তু, ইহা কখনই বেশ সন্তোষজনক হইতে

পারে না, চরম ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যকে জীবনের মধ্য ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায়, দর্শন করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহার বর্ণনা কেবলমাত্র আংশিক ও অসম্পূর্ণই হইতে পারে। আধ্যাত্মিক ব্যাপারের বর্ণনা করিতে উপনিষদ্ যে পদ্ধতি ও ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, এ-সব বিষয়ে কেবলমাত্র তাহাই সমীচীন। উপনিষদ্ অবাধে রূপক ও উপমা ব্যবহার করিয়াছে, মানসিক বুদ্ধির উপযোগী সংজ্ঞা বাঁধিবার চেষ্টা না করিয়া সোজাসুজী প্রত্যক্ষদর্শনের ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে; এবং কথাগুলিকে অসীম ব্যঞ্জনা ও আভাষের দ্বারা সত্যের সঙ্কেত করিতে ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু, গীতা এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে নাই; কারণ, মনের সংশয়, বুদ্ধির সংশয় দূর করাই গীতার উদ্দেশ্য। মনের যে অবস্থায় বুদ্ধির মধ্যেই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, বুদ্ধি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না, অথচ আমাদের ভাব ও প্রেরণার মধ্যে বিরোধগুলির সমাধান করিতে সেই বুদ্ধিকেই সালিশ মানিতে হয়, সেই অবস্থার প্রয়োজনকে লক্ষ্য করিয়াই গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে। বুদ্ধিকে এমন সত্যে লইয়া যাইতে হইবে যাহা বুদ্ধির উপরে; কিন্তু, বুদ্ধির নিজের পদ্ধতি, নিজের ধরণ অনুসারেই তাহাকে চালাইতে হইবে। গীতা যে মীমাংসা দিয়াছে, অন্তর্জীবনের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক রহস্যের উপর তাহার ভিত্তি। সে ভিত্তি সম্বন্ধে বুদ্ধির কোন অভিজ্ঞতা নাই। অতএব, সেই মীমাংসার সার্থকতা সম্বন্ধে বুদ্ধিকে তুষ্ট করিতে হইলে, জীবনের যে সকল সত্যকে অবলম্বন করিয়া ঐ মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহাদের একটা যুক্তিযুক্ত বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক।

এ পর্য্যন্ত যে সকল সত্যের উল্লেখ করিয়া গীতা আপনার মত সমর্থন করিয়াছে, অর্জ্জুনের বুদ্ধির কাছে সেগুলি একবারে

নূতন নহে; এবং সেগুলি কেবল গোড়ার কথা। প্রথমে, আত্মার (the self) সহিত প্রকৃতিস্থ জীবের প্রভেদ করা হইছে। এই প্রভেদের দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, যতক্ষণ এই প্রকৃতিস্থ জীব (individual being in nature) অহঙ্কারের ক্রিয়ার মধ্যে বদ্ধ, ততক্ষণ সে গুণত্রয়ের অধীন থাকিবেই; মানুষের মন-বুদ্ধির যে ক্রিয়া তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণের যে ক্রিয়া, সে-সব এই গুণত্রয়ের সত্ত্ব, রজঃ, তমের অস্থির খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই গণ্ডীর মধ্যে কোনই সমাধান নাই।—প্রকৃত সমাধান পাইতে হইলে এই গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে; এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির উপরে উঠিয়া শান্ত, স্থির, অক্ষর আত্মাতে—ব্রহ্মে পৌছিতে হইবে; কারণ তখনই মানুষ সকল অনর্থের মূল অহঙ্কার ও বাসনার ক্রিয়াকে অতিক্রম করিবে। কিন্তু, এইভাবে মানুষ কি একেবারে নিষ্ক্রিয়তায় উপনীত হইবে না? প্রকৃতির বাহিরে ত কোথাও কর্ম্ম শক্তি নাই, কর্ম্মের কোনও প্রয়োজন বা প্রেরণা নাই; কারণ, অক্ষর ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়,—সকল বস্তু, সকল কর্ম্ম, সকল ঘটনার প্রতি সম ও নিরপেক্ষ। এইজন্যই গীতা যোগশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছে,— ঈশ্বর সকল কর্ম্মের, সকল যজ্ঞের প্রভু। গীতা এখানে স্পষ্টভাবে না বলিলেও ইঙ্গিত করিয়াছে যে, এই ঈশ্বর অক্ষর ব্রহ্মেরও উপরে এবং ঈশ্বরের মধ্যেই বিশ্বলীলার নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে। অতএব ব্রহ্ম বা আত্মার ভিতর দিয়া ঈশ্বরে উঠিতে পারিলেই কর্ম্মের বন্ধন হইতে আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ করা যায়, অথচ প্রকৃতির মধ্য কর্ম্ম করা যায়। কিন্তু, এই যে পরমেশ্বর দিব্যগুরুরূপে দিব্যসারথিরূপে এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইনি কে এবং আত্মা বা ব্রহ্মের সহিত এবং প্রকৃতিস্থ জীবের সহিত ইঁহার সম্বন্ধই বা কি, তাহা এখনও

প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই। আর, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে কর্ম্মের যে প্রেরণা আসে, তাহা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির প্রেরণা হইতে ভিন্ন কিসে, তাহাও এখনও পরিস্ফুট হয় নাই। এবং যদি উহা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিরই প্রেরণা ভিন্ন আর কিছু না হয়, তাহা হইলে উহার অনুসারে কর্ম্ম করিয়া জীব গুণত্রয়ের বন্ধন কেমন করিয়া এড়াইবে? তাহা হইলে যে মুক্তির ভরসা দেওয়া হইতেছে, তাহা কি মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ হইবে না? ভগবানের যেটা ক্রিয়ার দিক তাহাই প্রকৃতি, শক্তি, nature; তাহা হইতেই ইচ্ছা বা প্রেরণার উদ্ভব। তাহা হইলে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ছাড়াও তাহার উপরে কি আর কোনও প্রকৃতি আছে? অহঙ্কার, বাসনা, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, প্রাণের আবেগ—এই সব ব্যতীত কর্ম্মের, ইচ্ছার, বাস্তব সৃষ্টির কি আর কোন শক্তি আছে?

এখনও এই সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। অতএব দিব্যকর্ম্মের ভিত্তি হইবে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান আরও পূর্ণভাবে এখন বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। সকল কর্ম্মের মূল উৎস ভগবান সম্বন্ধে পূর্ণ সমগ্র জ্ঞানই এইরূপ দিব্য-কর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে। সেই জ্ঞান লাভ করিয়া কর্ম্মী ভগবানের সত্তাতেই মুক্ত হন; কারণ, তিনি সেই মুক্ত আত্মাকে জানেন, যাহা হইতে সকল কর্ম্মের উৎপত্তি; এবং তাহার মুক্তিতে মুক্তি লাভ করেন। তাহা ছাড়া, এই জ্ঞান হইতে এমন আলোক পাওয়া চাই, যেন গীতার প্রথম ভাগের শেষে যে কথা বলা হইয়াছে, তাহার সার্থকতা বুঝিতে পারা যায়। আধ্যাত্মিক চেতনা ও কর্ম্মের সকল প্রেরণার উপরে ভক্তির স্থান কেমন করিয়া হয়, এই জ্ঞানের মধ্যেই তাহার সমর্থন পাওয়া যাইবে। এই জ্ঞান হইবে সেই পরমেশ্বরের, সেই সর্ব্বভূতমহেশ্বরের, যাঁহার নিকটে জীব পূর্ণ

সমর্পণের সহিত নিজেকে নিবেদন করিতে পারে।—এই পূর্ণ আত্ম-নিবেদনই সকল প্রেম ও ভক্তির চূড়ান্ত—গুরু এইরূপ জ্ঞান দিবারই প্রস্তাব সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকগুলিতে করিলেন। এইখান হইতে যে তত্ত্বব্যাখ্যার সূত্রপাত হইল, তাহাই গীতার বাকী অংশে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিলেন—"আমাতে মন লাগাইয়া এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া (অর্থাৎ আমাকে তোমার সমস্ত চেতনা ও কর্ম্মের একমাত্র ভিত্তি ও অবলম্বন করিয়া) যোগ সাধনা করিলে তুমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়া সমগ্রভাবে আমাকে যেমন জানিতে পারিবে তাহা শ্রবণ কর। কোন কিছু বাকী না রাখিয়া, কোন কিছু বাদ না দিয়া আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহ এমন জ্ঞান বলিব, যাহা জানিলে এখানে তোমার অবিদিত আর কিছুই থাকিবে না।" (সপ্তম অধ্যায় ১—২)। এখানে সমগ্র জ্ঞান দিবার যে প্রস্তাব করা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, ভগবানই সব; অতএব ভগবানকে যদি তাঁহার সব সত্তায় এবং সব শক্তিতে জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে সবই জানা যায়। কেবল শুদ্ধ আত্মাকে নহে, পরন্তু জগৎকে, কর্ম্মকে, প্রকৃতিকেও জানা যায়। তখন আর এখানে জানিতে কিছুই বাকী থাকে না; কারণ, সবই সেই ভগবান। আমাদের জ্ঞান এখানে এরূপ সমগ্র নহে, এখানে জ্ঞান দ্বন্দ্বময় মন ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, অহঙ্কারের দ্বারা খণ্ডিত হয়। কেবল সেই জন্যই মনের দ্বারা যাহা আমারা উপলব্ধি করি, তাহা অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মানসিক দ্বন্দ্ব ও অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া আমাদিগকে সত্য অখণ্ড জ্ঞান লাভ করিতে হইবে; এবং ইহার দুইটি দিক আছে—জ্ঞান ও বিজ্ঞান। মূল তত্ত্বকে জানা—জ্ঞান; মূলতত্ত্বের বিকাশকে সর্ব্বতোভাবে জানাই বিজ্ঞান। পরম ভাগবত সত্তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই জ্ঞান এবং প্রকৃতি রূপ

[প্রভৃতি রূপে বিশ্বলীলার মাঝে ভগবানের যে আত্মপ্রকাশ হইয়াছে,সে সম্বন্ধে নিগূঢ় সত্যজ্ঞানই বিজ্ঞান। ইহার দ্বারা যাহা কিছু আছে সকল জিনিষেরই দিব্য উৎপত্তি এবং তাহাদের প্রকৃতির চরম সত্য জানিতে পারা যায়। গীতা বলিয়াছে এইরূপ পূর্ণ, সমগ্র জ্ঞান সুদুর্লভ,

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৭।৩

"সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে ক্বচিৎ দুই এক জন সিদ্ধিলাভে যত্নশীল হয়। আবার যাহারা এরূপ যত্ন করে এবং সিদ্ধিলাভ করে, তাহাদের মধ্যে ক্বচিৎ দুই একজন তত্ত্বতঃ আমাকে জানে (knows me in all the princippees of my existence)।

এই সমগ্র জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ গীতা প্রথমেই দুই প্রকৃতির, প্রাতিভাসিক (phenomenal) প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক (spiritual) প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ করিয়াছে। এই প্রভেদের উপরেই কার্য্যতঃ গীতার সমস্ত যোগপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৭।৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৭।৫

—"পঞ্চভূত (জড়সত্তার পঞ্চ অবস্থা), মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহাই আমার অষ্টধা ভিন্ন প্রকৃতি। ইহা অপরা; কিন্তু, ইহা হইতে বিভিন্ন আমার অন্য এক প্রকৃতি আছে জানিও। তাহা পরা-প্রকৃতি। তাহাই জীব হইয়াছে এবং এই জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছে।" তত্ত্ববর্ণনায় এইটিই গীতার প্রথম নূতন কথা। ইহার সাহায্যেই গীতা সাংখ্যদর্শনের মত হইতে আরম্ভ করিয়াও সাংখ্যকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে; এবং

সাংখ্যের বাক্যগুলিকে রাখিয়াও তাহাদের ব্যাপক ও বৈদান্তিক অর্থ দিতে পারিয়াছে। গীতা যে অষ্টধা প্রকৃতির বর্ণনা দিয়াছে, তাহাতে রহিয়াছে ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণসহ মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। গীতার এই বর্ণনা সাংখ্যেরই প্রকৃতির বর্ণনা। সাংখ্য এইখানেই থামিয়াছে এবং এইখানে থামিয়াছে বলিয়াই সাংখ্য আত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান তুলিতে বাধ্য হইয়াছে। সাংখ্যকে বলিতে হইয়াছে যে, এই দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদি বস্তু (primary entities)। গীতাও যদি এইখানে থামিত তাহা হইলে গীতাকেও আত্মা ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অনতিক্রমনীয় বিরোধ স্বীকার করিতে হইত; এবং তাহা হইলে বিশ্বপ্রকৃতি হইত কেবল ত্রিগুণময়ী মায়া; এবং এই বিশ্বপ্রপঞ্চ হইত কেবল মায়ার খেলা, আর কিছুই নহে। কিন্তু, আরও কিছু আছে—এক উচ্চতর তত্ত্ব, এক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি আছে, প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। ভগবানের এক পরমা প্রকৃতি আছে; তাহাই বিশ্বজগতের প্রকৃত মূল—আত্মা সৃজনী শক্তি ও কর্ম্মশক্তি। নীচের অজ্ঞান অপরা প্রকৃতি সেই পরা-প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত, তাহারই অন্ধকার ছায়া মাত্র। এই উচ্চতম লীলাস্তরে পুরুষ ও প্রকৃতি এক। সেখানে প্রকৃতি পুরুষেরই ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম্মশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে; প্রকৃতি পুরুষেরই লীলার দিক—পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে,—পুরুষই স্বয়ং শক্তিরূপে আবির্ভূত।

এই পরা-প্রকৃতি ভগবানের শক্তিরূপে কেবল যে বিশ্বলীলার মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহা নহে। কারণ, তাহা হইলে যে সর্ব্বব্যাপী আত্মা নিষ্ক্রিয়ভাবে সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে, সকল জিনিষের মধ্যে রহিয়াছে, সকলকেই ধরিয়া আছে, বিশ্বলীলা চলিতে একভাবে বাধ্য করিতেছে অথচ নিজে কিছুই করিতেছে না, সেই নিষ্ক্রিয় আত্মার

সহিত এই পরা-প্রকৃতির কোন প্রভেদই থাকিত না। এই পরা-প্রকৃতি সাংখ্যের অব্যক্তও নহে। ব্যক্ত অষ্টধা প্রকৃতির আদি অপ্রকাশিত বীজ অবস্থাই সাংখ্যের অব্যক্ত। সাংখ্যের মতে তাহাই প্রকৃতির একমাত্র মূল সৃজনী-শক্তি। তাহা হইতেই প্রকৃতির বিভিন্ন যন্ত্র ও ক্রিয়াশক্তির উদ্ভব। আবার অব্যক্ত তত্ত্বকে বৈদান্তিক মতে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলে চলিবে না যে, অব্যক্ত ব্রহ্ম বা আত্মার মধ্যে যে শক্তি বদ্ধ ও নিহিত রহিয়াছে, যাহা হইতে বিশ্বের উত্থান হইতেছে, যাহাতে বিশ্বের লয় হইতেছে, তাহাই এই পরা-প্রকৃতি। পরা-প্রকৃতি তাহা বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া আরও অনেক অধিক; কারণ সেটি পরা-প্রকৃতির নানা আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্যে কেবল একটি অবস্থা। আত্মা ও জগতের পশ্চাতে পরমেশ্বরের যে চিৎশক্তি রহিয়াছে, তাহাই পরা-প্রকৃতি। অক্ষর পুরুষে ইহা আত্মার মধ্যে নিমজ্জিত। ইহা সেখানে রহিয়াছে কিন্তু কর্ম্ম করিতেছে না, নিবৃত্তিতে রহিয়াছে। ক্ষর পুরুষে এবং জগতে ইহা কর্ম্মে বহির্গত হইয়াছে,—প্রবৃত্তি। সেখানে প্রকটশক্তিরূপে থাকিয়া উহা আত্মার সত্তার মধ্যে সর্ব্বভূতের বিকাশ করিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে তাহাদের অন্তরতম আধ্যাত্মিক প্রকৃতিরূপে আবির্ভূত হইতেছে, তাহাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীন্ ঘটনা সমূহের পশ্চাতে স্থায়ী সত্যরূপে বিরাজ করিতেছে। উহাই ভূত সকলের আবির্ভাবের মূল গুণ ও শক্তি, তাহাদের বাহ্য-প্রকাশের পশ্চাতে অন্তরতম সত্তা এবং দিব্যশক্তি। সত্ত্বাদি গুণের যে দ্বন্দ তাহা এই পরা-প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন নীচের খেলা, স্থূল খেলা। নামরূপের এসব খেলা, নীচের প্রকৃতির—মন, প্রাণ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধির খেলা, এসব কেবল প্রাতিভাসিক ঘটনা, phenomenon। ঐ আধ্যাত্মিক শক্তি পশ্চাতে না থাকিলে

এই প্রাতিভাসিক ঘটনা কখনই সম্ভব হইত না। ঐ শক্তি হইতেই এ-সব উঠিয়াছে, উহার মধ্যেই রহিয়াছে, এবং কেবল উহার দ্বারায় চলিতেছে। আমরা যদি শুধু এই প্রাতিভাসিক প্রকৃতির (phenomenal nature) মধ্যেই থাকি এবং এই প্রাতিভাসিক প্রকৃতি বস্তু সকলকে যেমন দেখায় শুধু তেমনি ভাবেই দেখি তাহা হইলে আমাদের কর্ম্ম-জীবনের প্রকৃত সত্যটি আমরা ধরিতে পারিব না ; প্রকৃত সত্য হইতেছে এই আধ্যাত্মিক শক্তি, এই দিব্য প্রকৃতি, সকল বস্তুর অন্তরে এই আধ্যাত্মিক গুণ ; অথবা বলা যাইতে পারে, যে আত্মার মধ্যে বস্তু সকল রহিয়াছে, যাহা হইতে তাহারা তাহাদের সকল শক্তি এবং কর্ম্মের বীজ পাইতেছে, ইহা সেই আত্মারই অন্তরতম গুণ। সেই সত্যকে, শক্তিকে, গুণকে যদি আমরা ধরিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের জীবনযাত্রার সত্য নিয়মটি আমরা ধরিতে পারিব, আমাদের জীবনের দিব্য নীতিটি ধরিতে পারিব ; কেবল জীবনের অজ্ঞান খেলায় মগ্ন না থাকিয়া, জ্ঞানের মধ্যেই ইহার যে মূল ও সার্থকতা আছে, তাহার সন্ধান পাইব ।

এখানে যে ভাবে গীতার অর্থ বর্ণনা করা হইল, তাহা আমাদের বর্ত্তমান চিন্তাধারার, আধুনিক ধ্যান-ধারণার উপযোগী। কিন্তু, গীতা পরা প্রকৃতির যেরূপ বর্ণনা দিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, গীতা বস্তুতঃ এই কথাই বলিয়াছে। কারণ, প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, এই উপরের প্রকৃতি আমারই পরা-প্রকৃতি, প্রকৃতিম্ মে পরাম্। এখানে "আমি" বলিতে বুঝাইতেছে পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, বিশ্বাতীত এবং বিশ্বব্যাপী আত্মা। এই পরমাত্মার আদ্যা ও সনাতনী প্রকৃতি এবং ইহার বিশ্বাতীতা এবং সর্ব্বসৃষ্টির মূলস্বরূপা শক্তি—ইহাকেই পরা-প্রকৃতি বলা হইয়াছে।

কারণ, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁহার প্রকৃতির ক্রিয়াশীলা শক্তির দিক হইতে বিশ্বসৃষ্টির কথা বলিয়াছেন, "এতদ্ যোনিনী ভূতানি"—এই প্রকৃতি হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি। এবং এই শ্লোকেরই দ্বিতীয় পদে সকল সৃষ্টির মূল আত্মার দিক হইতে বিশ্বসৃষ্টির কথা বলিয়াছেন—"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা," "আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তির স্থল, আবার আমাতেই ইহার লয় হয়। আমা অপেক্ষা বড়, আমার উপরে আর কিছুই নাই"। অতএব এখানে পরমাত্মা পুরুষোত্তম এবং সর্ব্বোত্তমা প্রকৃতি পরা-প্রকৃতিকে একই করা হইয়াছে। এখান হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা একই সত্যের কেবল দুইটা দেখিবার ভঙ্গী মাত্র কারণ কৃষ্ণ যে বলিলেন—"আমিই জগতের উৎপত্তির স্থান, লয়েরও স্থান," তাঁহার পরা-প্রকৃতিই যে এই দুই স্থান তাহা বেশ বুঝা যায়। ভগবান তাঁহার অনন্ত চেতনাস্বরূপেই পরমাত্মা এবং পরমাত্মার অনন্ত শক্তি ও ইচ্ছাই পরা-প্রকৃতি,—পরমাত্মা তাঁহার অনন্ত চেতনার অন্তর্গত দিব্য তেজ এবং দিব্য কর্ম্ম স্বরূপেই পরা-প্রকৃতি। পরমাত্মার মধ্য হইতে এই চিৎশক্তির বিবর্ত্তন ও বিকাশ (the movement of evolution), পরা-প্রকৃতি জীবভূতা, ক্ষর-জগতে ইহার লীলা—ইহাই সৃষ্টি, প্রভবঃ; ক্রিয়াশক্তির প্রত্যাহারে অক্ষরের মধ্যে এই লীলার সংহরণ, পরমাত্মার আত্মস্থ শক্তিতে অবস্থান—ইহাই প্রলয়। তাহা হইলে পরা-প্রকৃতি বলিতে প্রথমতঃ ইহাই বুঝাইতেছে।

অতএব পরা-প্রকৃতি হইতেছে অনাদি ভাগবত সত্তার সেই অনন্ত কালাতীত চিৎশক্তি, যাহা হইতে জগতের যাবতীয় বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে এবং কালাতীত অবস্থা হইতে কালের মধ্যে বাহির হইয়াছে। কিন্তু জগতে এই বিচিত্র বহুমুখী বিশ্বলীলাকে ধারণ করিবার জন্য অধ্যাত্ম সত্তার প্রয়োজন; তাই পরা-প্রকৃতি জীবরূপে আবির্ভূত

হইয়াছে, জীবভূতা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। ইহাই অন্যভাবে বলা যায়, পুরুষোত্তমের নিত্য, সনাতন বহুধা আত্মা জগতে সমস্ত নামরূপের মধ্যে ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম সত্তারূপে আবির্ভূত হইয়াছে। এক অখণ্ড পরমাত্মার জীবনেই জগতের যাবতীয় বস্তু অনুপ্রাণিত। সেই এক পুরুষের সনাতন, বহুধা স্বরূপই সকলের ব্যক্তিত্ব, কর্ম্ম ও নামরূপকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে যেন আমরা না ভাবি যে, কালের মধ্যে যে-জীব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এবং পরা-প্রকৃতি এমনভাবে এক যে পরা-প্রকৃতি জীব ভিন্ন আর কিছুই নহে; উহা শুধুই প্রকাশস্বরূপ কিন্তু সৎস্বরূপ নহে। পরমাত্মার পরা-প্রকৃতি কখনও এই প্রকার হইতে পারে না। কালের মধ্যে যখন প্রকাশের লীলা চলিতেছে তখনও পরা-প্রকৃতি ইহা অপেক্ষা আরও বেশী কিছু; নতুবা জগতে উহার সত্তা কেবল বহুধাই হইত, জগতে একত্বের স্বরূপ থাকিত না। গীতা তাহা বলে নাই; গীতা বলে নাই যে, পরা-প্রকৃতি তাহার মূল সত্তায় জীব, জীবাত্মকম্। গীতা বলিয়াছে, পরা-প্রকৃতি জীব হইয়াছে, জীবভূতম্; এবং এই কথা হইতেই বুঝা যায় যে, জীবরূপে আবির্ভাবের পশ্চাতে পরা-প্রকৃতি মূলতঃ আরও কিছু, আরও উচ্চ সত্তা,—ইহা এক পরম আত্মারই স্বরূপ। পরে বলা হইবে যে, জীব ঈশ্বর, কিন্তু আংশিক প্রকাশরূপে ঈশ্বর, মমৈবাংশঃ। এমন কি জগতে যত জীব রহিয়াছে কিম্বা অসংখ্য জগতে যত অসংখ্য জীব রহিয়াছে, সেই সব মিলিয়াও পূর্ণ ভগবান নহে,— কেবলমাত্র সেই এক অনন্তের আংশিক প্রকাশ। তাহাদের মধ্যে এক অবিভক্ত ব্রহ্ম যেন বিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন,—অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। একত্ব উচ্চতর সত্য, বহুত্ব তাহার

নীচের সত্য, যদিও উভয়েই সত্য এবং উভয়ের কোনটাই মিথ্যা ভ্রম নহে।

এই অধ্যাত্ম প্রকৃতির একত্বের দ্বারাই জগৎ বিধৃত, যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ;—যেমন ইহা হইতেই সর্ব্বভূতসহ জগতের উৎপত্তিও হইয়াছে, এতদ্‌যোনীনি ভূতানী, এবং ইহাই প্রলয়কালে সর্ব্বভূতসহ সমগ্র জগৎকে নিজের মধ্যে টানিয়া লয়,—অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। কিন্তু, পরমাত্মার মধ্যে এই যে সৃষ্টি,স্থিতি ও লয়ের লীলা চলিতেছে,এই লীলায় জীবই বহুত্বের ভিত্তি। ইহাকে বহুধা আত্মা বলিতে পারা যায়। অথবা জগতে আমরা যে বহুত্ব দেখিতে পাই, জীবই তাহার আত্মা—ইহা বলিলেই বোধ হয় আরও ভাল হয়। এই জীব মূল সত্তায় সকল সময়েই ভগবানে সহিত এক ; কেবল লীলাশক্তিতেই ইহা ভগবান হইতে বিভিন্ন, বিভিন্ন বলিতে ইহা বুঝায় না যে,জীব আদৌ ঐ শক্তি নহে পরন্তু ইহাই বুঝায় যে, জীব সেই একই শক্তিকে আংশিক বহুধা ব্যষ্টিগত কর্ম্মে ধরিয়া আছে। অতএব সকল বস্তু আদিতে. অন্তে এবং স্থিতিকালেও. সেই পরমাত্মা। সকলেরই মূল প্রকৃতি পরমাত্মার স্বরূপ, অধ্যাত্ম প্রকৃতি। কেবল নীচের বিশেষ লীলাতেই মনে হয় যেন তাহারা পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন ; মনে হয় শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়গণই বুঝি তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ। কিন্তু, এসব বাহিরের গৌণ প্রকাশ মাত্র,—ইহারা আমাদের প্রকৃতির এবং আমাদের জীবনের নিগূঢ় সত্য নহে।

তাহা হইলে ভগবানের পরা প্রকৃতি বিশ্বের অতীত, জগতের এক মূল সত্য ও শক্তি ; আবার সেই পরা-প্রকৃতিইবিশ্বমাঝে প্রকাশলীলার মূল ভিত্তি-স্বরূপ অধ্যাত্ম সত্য। কিন্তু তাহা হইলে এই· রা-প্রকৃতির সহিত নীচের প্রাতিভাসিক প্রকৃতির, অপরা-

প্রকৃতির সম্বন্ধের সূত্র কোথায় ? কৃষ্ণ বলিলেন,এ সব, এখানে যাহা কিছু আছে সে সমুদায়ই, আমাতে সূত্রে মণিগণের ন্যায় গ্রথিত, ময়ি সর্ব্বমিদং (৩) প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইইব। কিন্তু ইহা কেবল একটি উপমা, ইহাকে বেশী টানা চলে না; কারণ, মণিগণ সূত্রের দ্বারা এক সঙ্গে গ্রথিত থাকে মাত্র। সূত্রের সহিত তাহাদের একত্ব বা অন্য কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল সেইটিকে অবলম্বন করিয়া মণিগণ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব উপমা ছাড়িয়া দিয়া মূল জিনিষটিকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। পরমাত্মার পরা-প্রকৃতি, তাঁহার সত্বার অনন্ত চিৎশক্তি, যাহা আত্মবিদ্, সর্ব্ববিদ্, সর্ব্বজ্ঞ, তাহাই এই প্রাতিভাসিক জগতের বস্তু সকলকে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়া সকলকে একত্র সাজাইয়া এই বিশ্বপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই এক পরা-শক্তি সকলের মধ্যে যে এক পরম বস্তু স্বরূপ আবির্ভূত হয় কেবল তাহাই নহে; পরন্তু প্রত্যেকের মধ্যে জীবরূপে, ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম সত্তারূপে আবির্ভূত হয়, আবার প্রকৃতির সকল গুণের সার সত্তারূপেও আবির্ভূত হয়। তাহা হইলে সকল ব্যক্ত রূপের পশ্চাতে ইহারাই গুপ্ত অধ্যাত্ম শক্তি। এই সর্ব্বোত্তম গুণ ত্রিগুণের ক্রিয়া নহে; ত্রিগুণের খেলা গুণের অভিব্যক্তি মাত্র, ইহার অধ্যাত্মিক সারসত্তা নহে। বস্তুতঃ-ইহা হইতেছে এই

---

(৩) জগৎলীলায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সমগ্রভাবে সেই সমুদায়কে বুঝাইতে উপনিষদে সাধারণতঃ "সর্ব্বমিদং" এই বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

সব বাহ্যিক পরিবর্ত্তনের অন্তর্নিহিত, এক অথচ বৈচিত্র্যশীল আভ্যন্তরীন শক্তি। প্রকাশলীলার ইহাই মূল সত্য। এই সত্যই সকল ব্যক্ত রূপকে ধরিয়া আছে; এবং সকলকে অধ্যাত্মিক ও দিব্য সার্থকতা প্রদান করিতেছে। ত্রিগুণের ক্রিয়া, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, অহংকার, প্রাণ ও জড়দেহের বাহ্যিক চঞ্চল ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ; কিন্তু ইহা হইতেছে প্রকাশলীলার সার স্বরূপ, স্থির মূল নিগূঢ়শক্তি—স্বভাব। সকল প্রকাশলীলার এবং প্রত্যেক জীবের মূল ধর্ম্ম, স্ব-ধর্ম্ম ইহার দ্বারাই নির্ণীত হয়; ইহাই প্রকৃতির খেলার বিকাশ করে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে তত্ত্ব ভগবানের সর্ব্বোত্তম আত্মপ্রকাশলীলার সহিত (মদ্‌ভাবাঃ) সাক্ষাৎ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত, তাহাই এই। দিব্য ভাবের সহিত স্বভাবের এই সম্বন্ধ এবং স্বভাবের সহিত বাহ্যিক ভাবের সম্বন্ধ, দিব্য প্রকৃতির সহিত ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম প্রকৃতির সম্বন্ধ এবং শুদ্ধ মূল স্বরূপে ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম প্রকৃতির সহিত গুণত্রয়ের মিশ্রিত খেলা ও দ্বন্দ্বযুক্ত প্রাতিভাসিক প্রকৃতির সম্বন্ধ, এইখানেই আমরা উপরের দিব্য জীবন এবং নীচের প্রাকৃত জীবনের সম্বন্ধ সূত্র দেখিতে পাই। নীচের প্রকৃতির হীন শক্তি ও সম্পদসমূহ পরা-প্রকৃতির মহান্ শক্তি ও সম্পদসমূহ হইতেই উৎপন্ন, এবং সেইখানেই তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে; তবে তাহারা নিজেদের মূল ও সত্যের সন্ধান পাইবে, নিজেদের কর্ম্মের নিগূঢ় নীতির সন্ধান পাইবে। সেই রকম, জীব যে ত্রিগুণের শৃঙ্খলিত, ক্ষুদ্র, নীচ খেলায় বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে যদি সে মুক্ত হইতে চায় এবং দিব্যত্ত সিদ্ধ হইতে চায়, তাহা হইলে তাহার স্বভাবের মূল গুণকে অনুসরণ করিয়া তাহাকে তাহার নিজ সত্তার সেই উপরের ধর্ম্মে ফিরিয়া যাইতেই হইবে।

সেখানে সে তাহার দিব্য প্রকৃতির ইচ্ছা, শক্তি, কর্ম্মনীতি ও সর্ব্বোত্তম লীলার সন্ধান পাইবে।

ঠিক পরের শ্লোকগুলিতে এই কথাই আরও স্পষ্ট হইয়াছে। সেখানে গীতা কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছে, ভগবান জগতের সজীব এবং তথাকথিত নির্জ্জীব পদার্থ সমূহের মধ্যে নিজের পরা-প্রকৃতির শক্তিতে কি ভাবে আবির্ভূত হন। শ্লোকে ছন্দোবদ্ধভাবে প্রকাশ করিতে হইয়াছে বলিয়া সেগুলি ঠিক যুক্তিমত পরপর উল্লিখিত হয় নাই। এখানে আমরা সেগুলিকে যথার্থ ক্রমে সাজাইয়া দিতেছি। প্রথমতঃ, দিব্য-শক্তি ও দিব্য সত্তা পঞ্চভূতের মধ্যে, অর্থাৎ জড়ের পঞ্চ মূল অবস্থার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া কাজ করিতেছে। "আমি জলে রস, আকাশে শব্দ, পৃথিবীতে গন্ধ, অগ্নিতে তেজ," এবং আমরা এখানে যোগ করিয়া দিতে পারি, বায়ুতে স্পর্শ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পঞ্চভূত (৪) যে রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়ানুভূতির জড় আশ্রয়, স্বয়ং ভগবান নিজের পরা-প্রকৃতিতে সেই সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতির মূল শক্তি। জড়ের পাঁচটি মূল অবস্থা পঞ্চভূত। ইহারাই নীচের প্রকৃতিতে বস্তু স্বরূপ এবং ইহারাই জড়ের আকারভেদের আশ্রয়স্থল। পঞ্চ তন্মাত্র—রস,

---

(৪) প্রাচীন সাংখ্যদর্শনের মতে জড়ের পাঁচটি মূল অবস্থা (elemental or essenital conditons)—সূক্ষ্ম (ethereal), জ্যোতির্ম্ময় (radiant), বায়বীয় (gaseous), তরল (liquid), কঠিন (solid)—ইহাদিগকেই যথাক্রমে পঞ্চভূত নাম দেওয়া হইয়াছে—আকাশ, অগ্নি, বায়ু, জল, ও পৃথিবী। সাংখ্যমতে এই পঞ্চভূতই রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ানুভূতির জড় আশ্রয় (physical medium)।

স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি ইহারা গুণস্বরূপ। এই তন্মাত্রগুলি সূক্ষ্ম শক্তি। ইহাদের ক্রিয়ার দ্বারাই ইন্দ্রিয়-চৈতন্য জড়বস্তু সমূহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে সকল জ্ঞান ও অনুভূতির ইহারাই ভিত্তি। জড়বাদ অনুসারে জড়ই সদ্‌বস্তু, এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি জড় হইতেই উৎপন্ন। কিন্তু অধ্যাত্মবাদ অনুসারে ইহার উল্টাটাই সত্য। জড় বস্তু এবং জড় আধার ইহারা নিজেই উদ্ভূত শক্তি। জীবের ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিকট প্রকৃতির গুণসমূহের ক্রিয়া যে স্থূলভাবে প্রকট হয়, জড় মূলতঃ সেই স্থূলভাব বা অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক মূল সনাতন সত্য হইতেছে প্রকৃতির শক্তি। তাহাই ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিতর দিয়া জীবাত্মার সম্মুখে নানা রূপে প্রকট হয়। আবার ইন্দ্রিয়েরও যে সার শক্তি, গভীরতম আধ্যাত্মিক শক্তি, সূক্ষ্মতম শক্তি তাহাও ঐ সনাতন শক্তিরই অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু প্রকৃতির যে-শক্তি, নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত স্বয়ং ভগবানই সেই শক্তি; অতএব প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই শুদ্ধ সত্তায় সেই ভাগবত প্রকৃতি,—ভগবানই তাঁহার নিজ সচেতন মায়াশক্তিতে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হইয়াছেন।

এই শ্রেণীতে উল্লিখিত অন্যান্য বস্তু হইতে ইহা আরও স্পষ্ট বুঝা

---

(৪) প্রাচীন সাংখ্যদর্শনের মতে জড়ের পাঁচটি মূল অবস্থা (elemental or essential conditions)—সূক্ষ্ম (ethereal), জ্যোতির্ম্ময় (radiant), বায়বীয় (gaseous), তরল (liquid), কঠিন (solid)—ইহাদিগকেই যথাক্রমে পঞ্চভূত নাম দেওয়া হইয়াছে—আকাশ, অগ্নি, বায়ু, জল, ও পৃথিবী। সাংখ্যমতে এই পঞ্চভূতই রূপ, রস প্রভৃতিই ইন্দ্রিয়ানুভূতির জড় আশ্রয় (physical medium)।

যায়। "আমি চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রভা, মানুষের পৌরুষ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ, বলবানদের বল, তপস্বীর তপঃশক্তি।" "আমি সর্ব্বভূতের জীবন।" এই সকল বস্তু যাহা হইয়াছে, তাহা হইবার জন্য শক্তির যে মূল গুণের উপরে উহারা নির্ভর করে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেই শক্তিকেই নির্দ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহাদের প্রকৃতিতে ভাগবত শক্তির অধিষ্ঠানের ঐটিই স্বরূপ লক্ষণ। আবার, "আমি সর্ব্ববেদে প্রণব" অর্থাৎ মূলশব্দ ওঁ। এই ওঁকারই শ্রুতির সকল শক্তিশালী সৃজনক্ষম শব্দের মূল ভিত্তি;শব্দ ও বাক্যের যে শক্তি তাহারই সর্ব্বসাধারণ রূপটি হইতেছে ওঁ। এই ওঁকারের মধ্যে বাক্ ও শব্দের সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি ও বিকাশ-সম্ভাবনা সংক্ষেপে নিহিত রহিয়াছে। অন্যান্য যে-সব শব্দ ভাষার উপাদান, সে সকল এই মূল ওঁকারেরই ক্রমবিকাশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করা হয়। এইবার কথাটি খুব পরিষ্কার হইল ইন্দ্রিয়গণের বা জীবনের বা জ্যোতির, বুদ্ধি, তেজ, বল, পৌরুষ বা তপঃশক্তির যে বাহ্য ব্যক্ত ভাব ও বিকাশ, তাহা পরা-প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ নহে। মূল গুণের যে আধ্যাত্মিক শক্তিকে লইয়া স্ব-ভাব, তাহাই পরা-প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ। আত্মার যে শক্তি এই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, আত্মার চেতনার যে জ্যোতি এবং ব্যক্ত জিনিষে ইহার তেজের যে শক্তি, তাহাই মূল শুদ্ধ লক্ষণে হইতেছে অধ্যাত্ম প্রকৃতি। সেই শক্তি, জ্যোতিই সনাতন বীজ, তাহা হইতেই আর সব জিনিষ উদ্ভূত ও বিকশিত হইয়াছে,—আর সব জিনিষ তাহারই বিচিত্র লীলা। অতএব গীতা খুব সাধারণভাবে বলিয়াছে, বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্। "হে পৃথার পুত্র, আমাকেই সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিও।" এই সনাতন বীজ আত্মার শক্তি. আত্মাতে সচেতন ইচ্ছা, ভগবান এই বীজ মহদ্ ব্রহ্মে নিক্ষেপ করেন এবং তাহা হইতেই সর্ব্বভূতের

আবির্ভাব হয়। আত্মার এই বীজই সর্ব্বভূতের মূল গুণরূপে আবির্ভূত হয় এবং তাহাদের স্বভাব হয়।

মূল গুণের এই আদি শক্তির সহিত নীচের প্রকৃতিতে উদ্ভূত ব্যক্ত রূপের যে প্রভেদ, বস্তু শুদ্ধ স্বরূপে যাহা (the thing itself) এবং নিম্নতরক্রমে উহা যেরূপ দেখায় (the thing in its lower appearance), এই দুয়ের যে প্রভেদ, তাহাই শেষকালে অতি স্পষ্টভাবেই দেখান হইয়াছে—

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্।—
—"বলবানদিগের কাম ও আসক্তিবর্জ্জিত বল আমি।"
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ!
—"জীবগণের মধ্যে যে কাম তাহাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে,

আমিই সেই কাম।" আর উপরের প্রকৃতি হইতে যে সকল জিনিষ নীচের প্রকৃতিতে আবির্ভূত হইয়াছে, ভাবাঃ, (মনের ভাব, বাসনার অনুরাগ, রিপুর প্রেরণা, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ের উপর প্রতিক্রিয়া, বুদ্ধির সীমাবদ্ধ ও দ্বন্দ্বময় খেলা, হৃদয়ের নানা অনুভূতি এবং পাপ পুণ্য বিবেক), যে সকল ভাব সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই যে সব ত্রিগুণের খেলা, গীতা বলিয়াছে, তাহারাই পরা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির স্বরূপের খেলা নহে, কিন্তু তাহা হইতে উদ্ভূত; "মত্ত এব," আমা হইতেই যে তাহাদের উৎপত্তি তাহা সত্য, তাহারা অন্য কোথাও হইতে আসে নাই, তবে ন ত্বহং তেষু তে ময়ি, আমি তাহাদের মধ্যে নাই, তাহারাই আমার মধ্যে রহিয়াছে। তাহা হইলে এখানে একটা বেশ প্রভেদ দেখা যাইতেছে, যদিও উহা বই সূক্ষ্ম। ভগবান বলিলেন, "আমিই মূল জ্যোতি, তেজ, কাম, বল,

বুদ্ধি। কিন্তু, এই সব হইতে নীচের প্রকৃতিতে যাহা উদ্ভূত হইয়াছে আমি মূলতঃ তাহা নই, এবং তাহাদের মধ্যেও আমি নাই। তবে তাহারা সকলেই আমা হইতে উদ্ভূত এবং আমার সত্তার মধ্যেই রহিয়াছে।" অতএব এই কথাগুলির উপরে নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, উপরের প্রকৃতি হইতে সব জিনিষ নীচের প্রকৃতিতে কেমন করিয়া আসে, আবার নীচের প্রকৃতি হইতে কেমন করিয়াই বা উপরের প্রকৃতিতে ফিরিয়া যায়।

প্রথম কথাটিতে কোন গোলমাল নাই। বলবান পুরুষের যে বল তাহার স্বরূপ মূলতঃ দিব্য; তাহা সত্ত্বেও ঐ পুরুষ কাম ও আসক্তির অধীন হইয়া পড়ে, পাপে পতিত হয় এবং দ্বন্দ্ব করিতে করিতে পুণ্যের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু, এরূপ যে হয় তাহার কারণ সে তাহার জীবনের কর্ম্মে ত্রিগুণের কবলে নামিয়া পড়ে; উপর হইতে নিজের মুল দিব্য প্রকৃতি হইতে সেই কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে না। তাহার এই সব নীচের খেলার জন্য তাহার শক্তির দিব্যস্বরূপের কোনই হানি হয় না। সমস্ত অজ্ঞান, মোহ, সমস্ত স্খলন সত্ত্বেও মূলতঃ তাহা ঠিক একই থাকে। তাহার সেই দিব্য প্রকৃতিতে ভগবান অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যতক্ষণ না সে পুনরায় জ্ঞানলাভ করিতে পারে, নিজের সত্তার প্রকৃত সূর্য্যালোকে তাহার সমস্ত জীবনকে আলোকিত করিতে এবং তাহার উপরের প্রকৃতিতে অবস্থিত ভাগবত ইচ্ছার শুদ্ধ শক্তির দ্বারা তাহার ইচ্ছা এবং কর্ম্ম সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হয়, ততক্ষণ তিনিই নিজের শক্তির দ্বারা তাহাকে তাহার নীচের জীবনের সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছেন, রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু, ভগবান কেমন করিয়া কাম

হইতে পারেন ? এই কামকেই যে বলা হইয়াছে আমাদের একমাত্র পরম শত্রু, ইহাকে বধ করিতেই হইবে ! কিন্তু, সে কাম হইতেছে ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতির কাম। তাহার উৎপত্তি হইতেছে রজঃ গুণ হইতে—রজোগুণসমুদ্ভবঃ ; কারণ কাম বলিতে সচরাচর আমরা এইটিকেই বুঝি। কিন্তু অপরটি আধ্যাত্মিক। সে কাম বা ইচ্ছা ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে।

আধ্যাত্মিক কাম বলিতে কি বুঝিতে হইবে পুণ্য-কামনা, নীতি-ধর্ম্মের অনুযায়ী সাত্ত্বিক (৫) কামনা ? কিন্তু, তাহা হইলে এখানে একটা স্পষ্ট বিরোধ হয় ; কারণ, পরের ছত্রেই বলা হইয়াছে যে, সাত্ত্বিকভাব সকল দিব্যভাব নহে, তাহারা শুধু নীচের খেলা। অবশ্য পাপকে বর্জ্জন করিতেই হইবে নতুবা কেহ ভগবানের ধার পর্য্যন্তও যাইতে পারিবে না ; কিন্তু, তেমনিই পুণ্যেরও উপরে উঠিতে হইবে ; নতুবা আমরা ভাগবত সত্তায় প্রবেশলাভ করিতে পারিব না। সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ করিতে হইবে কিন্তু, তাহার পর ইহারও উপরে উঠিতে হইবে। নীতিধর্ম্মের অনুযায়ী কর্ম্ম আত্মশুদ্ধির কেবল একটা উপায় মাত্র, ইহার দ্বারা আমরা দিব্যপ্রকৃতির দিকে উঠিতে পারি, কিন্তু সেই প্রকৃতি নিজে পাপপুণ্য সকল দ্বন্দ্বের অতীত,—বাস্তবিক তাহা না হইলে যে শক্তিমান পুরুষ রাজসিক কাম-ক্রোধের অধীন হইয়া পড়িয়াছে তাহার মধ্যে কোন খাঁটি দিব্য সত্তা, বা দিব্য শক্তি থাকিতেই পারিত না। ধর্ম্মের যে আধ্যাত্মিক অর্থ তাহাতে উহা নৈতিকতা বা নীতিধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র জিনিষ। গীতা অন্যত্র বলিয়াছে, স্বভাবের দ্বারা, স্ব-প্রকৃতির মূলনীতির দ্বারা

(৫) কারণ পুণ্য সকল সময়েই মূলতঃ এবং কার্য্যতঃ সাত্ত্বিক।

নিয়ন্ত্রিত যে কর্ম্ম, স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম। আর এই স্বভাব মূলতঃ আত্মারই শুদ্ধ গুণ। আত্মার অন্তর্নিহিত যে সজ্ঞান ইচ্ছা এবং নিজস্ব কর্ম্মশক্তি তাহারই ভাব, স্বভাব। অতএব গীতা এখানে যে কামের কথা বলিয়াছে তাহা আমাদের মধ্যে ভগবানেরই নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইচ্ছা, তাহা নীচের প্রকৃতির ভোগসুখের লালসা নহে, তাহা ভগবানেরই লীলার আনন্দের, আত্মপ্রকাশের আনন্দের সন্ধান। জীবনলীলার যে দিব্য আনন্দ স্বভাবের নিয়ম অনুসারে নিজস্ব সজ্ঞান কর্ম্মশক্তিকে প্রকট করিতে চাহিতেছে, ইহা সেই দিব্য আনন্দের কামনা।

কিন্তু তাহা হইলে আবার একথা বলার অর্থ কি যে,নীচের প্রকৃতির ভাব, রূপ, বিকার সকলের মধ্যে ভগবান নাই, এমন কি সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যেও ভগবান নাই, যদিও সে সব ভগবানের মধ্যেই রহিয়াছে, ন ত্বহং তেষু তে ময়ি? ভগবান যে কোন না কোন ভাবে এই সবের মধ্যেই রহিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, নতুবা তাহাদের অস্তিত্বই সম্ভব হইত না। এখানে কেবল ইহাই বুঝাইতেছে যে, ভগবানের যে সত্য পরা অধ্যাত্ম প্রকৃতি, তাহা এই সবের মধ্যে আবদ্ধ নহে; এ সব কেবল প্রাতিভাসিক ব্যাপার, অহঙ্কার ও অজ্ঞানের ক্রিয়ার দ্বারা তাঁহার মধ্যে তাহার সত্তা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। অজ্ঞান আমাদিগকে প্রত্যেক জিনিষ উল্টা ভাবে দেখায় এবং এমন অনুভূতি উপলব্ধি দেয় যাহা অন্ততঃ কতকটা বিকৃত। আমরা মনে করি যে, জীবাত্মা শরীরের মধ্যে রহিয়াছে, যেন উহা শরীরেরই পরিণাম এবং শরীর হইতেই উৎপন্ন; আমাদের অনুভূতিও এইরূপই হয়। কিন্তু বস্তুতঃ শরীরই জীবাত্মার মধ্যে

রহিয়াছে, শরীর আত্মার পরিণাম, আত্মা হইতেই উদ্ভূত। আমরা মনে করি, এই বিশাল জড় জগৎ ও মনোজগতের মধ্যে আত্মা যেন আমাদেরই একটা ক্ষুদ্র অংশ, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ। কিন্তু বস্তুতঃ জগৎটা যত বড়ই দেখাক না কেন, আত্মার অনন্ত সত্তার মধ্যে উহা একটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জিনিষ। এখানেও তাই; অনেকটা ঠিক এই ভাবেই এই সব জিনিষ ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে, পরন্তু ভগবান ইহাদের মধ্যে নাই। এই যে ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতি জিনিষ সকলকে এইরূপ মিথ্যাভাবে দেখায় এবং তাহাদের স্বরূপকে হীন করিয়া দেয় ইহা মায়া, একটা ভ্রমোৎপাদিকা শক্তি; তাই বলিয়া বুঝায় না যে, এ-সবের কোন অস্তিত্বই নাই, এ সবই মিথ্যা। কথা এই যে, ইহা আমাদের জ্ঞানকে বিভ্রান্ত করে, জিনিষের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে দেয় না, আমাদিগকে অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয়, দেহ, খণ্ডিত বুদ্ধির মধ্যে ঢাকিয়া রাখে, আমাদের জীবনের পরম সত্য আমাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখে। আমরা যে দিব্য অনন্ত অক্ষয় আত্মা,—মায়া তাহা আমাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখে।

ত্রিভিগুর্ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ৭। ১৩

—"এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব সকলের দ্বারা সমস্ত জগৎ বিভ্রান্ত হয়, এবং ইহাদের অতীত পরম অক্ষয় বস্তু আমাকে চিনিতে পারে না।" যদি আমরা দেখিতে পাইতাম যে, ভগবানই আমাদের জীবনের প্রকৃত সত্য, তাহা হইলে আর সবকেই আমরা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতাম, তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের নিকট ধরা পড়িত,

এবং আমাদের জীবন ও কর্ম্ম দিব্যভাব প্রাপ্ত হইত, দিব্যপ্রকৃতির নীতি অনুসারে পরিচালিত হইত।

কিন্তু যাহাই হউক, ভগবান এবং ভাগবত প্রকৃতি যখন এই সকল বিভ্রান্ত ব্যপারের মূলে রহিয়াছেন, যখন আমরাই জীব এবং জীবই সেই, তাহা হইলে এই মায়াকে অতিক্রম করা এত কঠিন কেন—মায়া দূরত্যয়া? ইহার কারণ এই যে, এই মায়া ভগবানেরই মায়া, দৈবী হ্যেযা গুণময়ী মম মায়া, "এই গুণময়ী মায়া আমারই দৈবী মায়া।" ইহা নিজে দিব্য, এবং ভগবানের প্রকৃতি হইতে বিকশিত, কিন্তু দেবতারূপী ভগবানের প্রকৃতি হইতে; ইহা দৈবী, দেবতাদের অথবা বলিতে পার, দেবভাব; কিন্তু দেবভাব যে দ্বন্দ্বময় নীচের জাগতিক খেলা, সাত্ত্বিক,রাজসিক,তামসিক ইহা তাহাই। এই জাগতিক মায়ার আবরণ দেবতা আমাদের বুদ্ধির চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছেন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এই আবরণের জটিল সূত্র বয়ন করিয়াছেন; শক্তি, পরা প্রকৃতি ইহার ভিত্তি এবং ইহার প্রত্যেক অংশে অনুস্যূত রহিয়াছে। আমাদিগকে আমাদের মধ্যে এই মায়ার জাল খুলিতে হইবে, ইহার প্রয়োজন শেষ হইলে ইহাকে ভেদ করিয়া, ইহাকে ছাড়িয়া, পিছনে ফেলিয়া, দেবতাদিগকে ছাড়াইয়া সেই এক দেবাদিদেব পরমেশ্বরের দিকে ফিরিতে হইবে। তাঁহার মধ্যে আমরা দেবতাগণের এবং তাঁহাদের কার্য্যের চরম সার্থকতার সন্ধান পাইব এবং আমাদের অক্ষয় জীবনেরও অন্তরতম আধ্যাত্মিক সত্য সকলের সন্ধান পাইব।

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

—"আমার দিকে যাহারা ফিরিয়া আইসে কেবল তাহারাই এই মায়া অতিক্রম করিতে পারে।"

ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়।*

গীতায় প্রসঙ্গক্রমে বহু দার্শনিক তত্ত্ব স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু গীতা দার্শনিক তত্ত্বালোচনার গ্রন্থ নহে ; কারণ, গীতাতে শুধু আলোচনার জন্যই কোন তত্ত্বের অবতারণা করা হয় নাই। গীতা শ্রেষ্ঠ সত্যের সন্ধান করিয়াছে, যেন তাহা শ্রেষ্ঠ কাজে লাগান যাইতে পারে ; কেবল তর্কবুদ্ধি বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তির জন্য নহে, কিন্তু যেন ঐ সত্য আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে, আমাদের বর্ত্তমান মরজীবনের অপূর্ণতা হইতে আমাদিগকে মৃত্যুহীন পূর্ণতার মধ্যে লইয়া যাইতে পারে। অতএব এই (সপ্তম) অধ্যায়ের প্রথম চতুর্দ্দশ শ্লোকে আমদের পক্ষে প্রয়োজনীয় একটি মূল দার্শনিক সত্যের বর্ণনা করিয়া, ইহার পরেই ষোলটি শ্লোকে উহার প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই সত্যকে লইয়াই গীতা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের সূচনা করিয়াছে ; ইহার পূর্ব্বে শুধু কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে যে সমন্বয়ের প্রয়োজন, তাহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে সম্পাদিত হইয়াছে।

আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তিনটি শক্তি (Powers)—পুরুষোত্তম, আত্মা ও জীব (আমাদিগকে যে পরিণতি লাভ করিতে হইবে তাহারই চরম সত্য হইতেছে পুরুষোত্তম)। এই তিনটিকে অন্য ভাবে বলা যাইতে পারে—পরাৎপর (the Supreme), নামরূপের অতীত আত্মা (the impersonal spirit), এবং বহুরূপী জীবাত্মা (the multiple

---

* গীতা, সপ্তম অধ্যায়, ১৫—২৮ শ্লোক

soul), যাহা আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের কালাতীত ভিত্তি, সত্য ও সনাতন ব্যষ্টি—মমৈবাংশঃ সনাতনঃ। এই তিনটিই ভাগবত সত্তা। সর্ব্বোত্তমা যে অধ্যাত্মিক প্রকৃতি, অবিদ্যার সকল খণ্ডতা হইতে মুক্ত যে পরাপ্রকৃতি, তাহাই পুরুষোত্তমের প্রকৃতি। নির্ব্যক্তিক অক্ষরের অতীত আত্মাতে সেই দিব্য প্রকৃতিই রহিয়াছে; কিন্তু এখানে উহা রহিয়াছে চির-বিশ্রামের অবস্থায়,—সাম্য, নিষ্ক্রিয়তা, নিবৃত্তির অবস্থায়। পরিণামে ক্রিয়ার জন্য, প্রবৃত্তির জন্য পরাপ্রকৃতি বহুরূপী আত্মা (the multiple spiritual personality) হইয়াছে, জীব হইয়াছে। কিন্তু এই উত্তমা প্রকৃতির যে নিগূঢ় ক্রিয়া তাহা সকল সময়েই আধ্যাত্মিক দিব্য ক্রিয়া। দিব্য পরা প্রকৃতির শক্তিই, ভগবানের সচেতন ইচ্ছাই জীবের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক গুণশক্তিরূপে আবির্ভূত হয়; সেই মূল শক্তিই জীবের স্বভাব। যে সব কর্ম্ম ও ভাব (becoming) সাক্ষাৎভাবে এই আধ্যাত্মিক শক্তি হইতে উদ্ভূত সে সকলই দিব্যভাব এবং শুদ্ধ ও আধ্যাত্মিক কর্ম্ম। তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, দিব্যভাবে কর্ম্ম করিতে হইলে মানুষকে তাহার সত্য আধ্যাত্মিক স্বরূপে ফিরিয়া যাইতে, এবং তাহার সকল কর্ম্মকে পরাপ্রকৃতি হইতেই প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে; যেন আত্মার ভিতর দিয়া এবং অন্তরতম নিগূঢ় সত্তার ভিতর দিয়াই কর্ম্মের বিকাশ হয়, মনের চিন্তা ও প্রাণের বাসনার ভিতর দিয়া নহে; যেন তাহার সকল কর্ম্ম ভগবদ্ ইচ্ছারই শুদ্ধ প্রবাহে পরিণত হয়, তাহার সমস্ত জীবন দিব্য প্রকৃতির জীবন্ত বিগ্রহে পরিণত হয়।

কিন্তু আবার ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতিও রহিয়াছে; ইহার স্বরূপ হইতেছে অজ্ঞানের স্বরূপ এবং ইহার কর্ম্ম হইতেছে অজ্ঞানের কর্ম্ম, মিশ্রিত, ভ্রান্ত, বিকৃত। এই কর্ম্ম নীচের সত্তার কর্ম্ম, "অহং"য়ের

কর্ম,—ইহা আধ্যাত্মিক ব্যক্তির কর্ম নহে, প্রাকৃত ব্যক্তির কর্ম। এই নীচের মিথ্যা ব্যক্তিত্ব (false personality) হইতে উপরে উঠিবার জন্যই আমাদিগকে নামরূপের অতীত নির্ব্যক্তিক আত্মাকে(the impersonal self) ধরিতে হয় এবং তাহার সহিত নিজদিগকে এক করিতে হয়। তখন, এইভাবে অহংয়ের ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আমরা পুরুষোত্তমের সহিত সত্য ব্যষ্টির সম্বন্ধটী আবিষ্কার করিতে পারি। কর্ম্মে এবং প্রকৃতির কালাধীন বিকাশে ইহা পুরুষোত্তমের অংশ ও বিশেষ রূপ মাত্র। এরূপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কারণ ইহা ব্যষ্টি। তথাপি মূল সত্তায় ইহা পুরুষোত্তমের সহিত এক। আবার, নীচের প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইলে আমরা উপরের দিব্য আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। অতএব আত্মা হইতে কর্ম্ম করার অর্থ ইহা নহে যে, বাসনাময় আত্মা হইতে কর্ম্ম করা ; কারণ, এই বাসনাময় আত্মা উপরের নিগূঢ় বস্তু নহে ; ইহা কেবল নীচের প্রাকৃত ও বাহ্য রূপ, সত্য বস্তুর আভাস বা ছায়া। নিগূঢ় প্রকৃতি অনুসারে, স্বভাব অনুসারে কর্ম্ম করার অর্থ ইহা নহে যে, অহংয়ের কাম-ক্রোধাদি রিপুর বশে কর্ম্ম করা, নির্ব্বিকার চিত্তে অথবা আসক্তির সহিত প্রাকৃত প্রেরণা অনুসারে ও গুণত্রয়ের চঞ্চল খেলা অনুসারে পাপ-পুণ্যের অনুষ্ঠান করা। রিপুর বশীভূত হওয়া, স্বেচ্ছায় বা জড়তার বশে পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া—ইহা উচ্চতম নির্ব্যক্তিক (highest impersonality) সত্তার আধ্যাত্মিক শান্ত নিষ্ক্রিয়ভাব লাভের পথ নহে অথবা যে দিব্য মানব পরমপুরুষের ইচ্ছার যন্ত্র হইবে, পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ শক্তি এবং বিগ্রহ হইবে, তাহার কর্ম্মের দিব্যভাব লাভেরও ইহা পথ নহে।

গীতা প্রথম হইতেই নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, দিব্যজন্ম, উর্দ্ধের জীবন লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োজন রাজসিক বাসনাকে এবং

ইহা হইতে উদ্ভূত অন্যান্য রিপুগণকে বধ করিতেই হইবে; এবং ইহার অর্থ, পাপকে বর্জ্জন করিতে হইবে*। আত্মা কর্তৃক প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার আত্মসংযম ও আত্মজয়ের উচ্চ চেষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া নীচের প্রকৃতি যে নিজের অজ্ঞান, মূঢ় বা দুর্দ্ধর্ষ রাজসিক ও তামসিক ... র অশুদ্ধ ভোগের জন্য কর্ম্ম করে তাহাই পাপ। নীচের প্রকৃতি যে এইভাবে নীচ রাজসিক ও তামসিক ভাবের দ্বারা মানুষকে অশুদ্ধ ভোগের দিকে জোর করিয়া টানিয়া লয়, ইহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রকৃতির সর্ব্বোচ্চ ভাব, সত্ত্বগুণের আশ্রয় লইতে হইবে। এই সাত্ত্বিক ভাব সকল সময়েই জ্ঞানের আলোক এবং কর্ম্মের সত্য নীতির সন্ধান করে। আমাদের মধ্যে যে পুরুষ রহিয়াছে, যে আত্মা প্রকৃতির গুণসমূহের বিভিন্ন প্রেরণায় সায় দিতেছে, তাহাকে সাত্ত্বিক প্রেরণায় অনুমতি দিতে হইবে। আমাদিগকে সাত্ত্বিক প্রেরণার বশে চলিতে হইবে, রাজসিক বা তামসিক প্রেরণার বশে নহে। কর্ম্মে সকল উচ্চ যৌক্তিকতার এবং সকল প্রকৃত নৈতিকতার ইহাই অর্থ। আমাদের মধ্যে প্রকৃতির, যে নিয়ম প্রকৃতির নীচ বিশৃঙ্খল কর্ম্ম হইতে তাহার উপরের সুশৃঙ্খল কর্ম্মের বিকাশ করিতে চাহিতেছে ইহা তাহাই। রিপুর বশে, অজ্ঞানের বশে, কর্ম্ম করিলে শোক, দুঃখ, অশান্তিতে পড়িতে হয়। তাহা না করিয়া ইহা জ্ঞানের বশে এবং প্রবুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির বশে কর্ম্ম

---

* কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩।৩৭
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১

করিয়া অভ্যন্তরীণ সুখ, স্থিরতা ও শান্তি লাভ করিতে চাহিতেছে। আমরা গুণত্রয়ের উপরে উঠিতে পারি না, যদি আমরা আমাদের মধ্যে প্রথমে শ্রেষ্ঠ গুণ সত্ত্বের ধর্ম্ম বিকাশ না করি।

> ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
> মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥৭।১৫

"মূঢ়, নরাধম, পাপীগণ আমাকে লাভ করিতে পারে না; কারণ মায়া তাহাদের জ্ঞানকে হরণ করিয়া লয় এবং তাহারা আসুরভাব প্রাপ্ত হয়।" প্রকৃতিতে আবদ্ধ আত্মা "আমি"র ছলনায় মুগ্ধ হইয়াই এইরূপ বিমূঢ় হইয়া পড়ে। পাপী ভগবানকে পায় না; কারণ, সে মানবীয় প্রকৃতির নিম্নতম স্তরে পড়িয়া থাকিয়া সর্ব্বদা "আমি" দেবতার তৃপ্তির জন্যই ব্যস্ত থাকে। প্রকৃত পক্ষে এই "আমি"ই তাহার ভগবান। তাহার মন ও বুদ্ধি ত্রিগুণের মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হওয়ায় আত্মার যন্ত্র না হইয়া দেহের ও তাহার বাসনার দাস হয়; অথবা আত্ম প্রতারণার বশে তাহার বাসনা-তৃপ্তির যন্ত্র হয়। সে দেখে কেবল তাহার এই নীচের প্রকৃতিকে, কিন্তু তাহার উচ্চতম আত্মা বা শ্রেষ্ঠ সত্তাকে সে দেখিতে পায় না, তাহার মধ্যে এবং সংসারের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহাকেও দেখিতে পায় না। তাহ "আমি"কে এবং বাসনাকে কেন্দ্র করিয়াই সে সংসারকে বুঝিয়া থাকে; এবং কেবল এই অহঙ্কার ও বাসনারই সেবা করে। ঊর্দ্ধের প্রকৃতি এবং উচ্চতর জীবনধারা লাভের কোনও আকাঙ্খা না রাখিয়া অহঙ্কার ও বাসনার সেবা করে,—ইহাই অসুরের মন, অসুরের ভাব। উপরের দিকে উঠিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই চাই উপরের প্রকৃতিতে উঠিবার, ঊর্দ্ধের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাঙ্খা আস্পৃহা (aspiration), চাই বাসনা অপেক্ষা আরও কোন শ্রেষ্ঠ নীতির অনুসরণ করা;—"আমি"র

পূজা না করিয়া, "আমি"কেই বড় করিয়া দেবতার আসনে না বসাইয়া চাই কোনও মহত্তর দেবতাকে জানা ও পূজা করা, চাই সত্য চিন্তা করা, সত্য কর্ম্মের কর্ম্মী হওয়া। তবে শুধু ইহাই যথেষ্ট নহে; কারণ, সাত্ত্বিক মানুষও ত্রিগুণের খেলায় মুগ্ধ হয়; যেহেতু সে তখনও ইচ্ছা ও দ্বেষের অধীন। সে প্রকৃতির নামরূপের চতুঃসীমার মধ্যেই ঘুরিতেছে, এখনও সে উচ্চতম জ্ঞানলাভ করিতে পারে নাই, প্রপঞ্চাতীত (transcendental) ও অখণ্ড জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই; তথাপি সর্ব্বদা সত্য চিন্তা ও সত্যকর্ম্ম করিবার উচ্চাকাঙ্খার ফলে অবশেষে সে পাপের মোহ হইতে অর্থাৎ রাজসিক বাসনা ও রিপুর মোহ হইতে মুক্ত হয় এবং বিশুদ্ধ প্রকৃতি লাভ করে। তখন ত্রিগুণময়ী মায়ার আধিপত্য ছাড়াইয়া উঠা তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। কেবল পুণ্যের দ্বারাই মানুষ শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিতে পারে না; কিন্তু পুণ্যের* দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতির প্রাপ্তি যোগ্যতা বা অধিকার লাভ করা যায়। কারণ, অসংস্কৃত রাজসিক "আমি"কে অথবা জড়ভাবাপন্ন তামসিক "আমি"কে বর্জ্জন করা বা ছাড়াইয়া উঠা কঠিন। সাত্ত্বিক "আমি" তত কঠিন নহে, এবং অবশেষে যখন ইহা নিজেকে যথেষ্ট শুদ্ধ ও বুদ্ধ করিয়া তোলে, তখন ইহাকে অতিক্রম করা, রূপান্তরিত করা বা ধ্বংস করা সহজেই সম্ভব হয়।

অতএব মানুষকে সর্ব্বপ্রথমে নীতিপরায়ণ, সুকৃতি (ethical) হইতে হইবে, এবং তাহার পর কেবলমাত্র নীতিপরায়ণতার মধ্যেই আবদ্ধ না থাকিয়া, তাহার উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, অধ্যাত্ম প্রকৃতির

---

* অবশ্য এখানে পুণ্য বলিতে গতানুগতিক ভাবে সামাজিক বা লৌকিক বিধিনিষেধের অনুসরণ বুঝাইতেছে না, ভিতরের সত্যিকারের যে পুণ্য, চিন্তা ভাব উদ্দেশ্য কর্ম্মের যে সাত্ত্বিক পবিত্রতা, তাহার দ্বারাই মানুষ উর্দ্ধগতির প্রথম অধিকার লাভ করে।

আলোক, প্রসারতা ও শক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। সেখানে সে দ্বন্দ্বমোহের অতীত হইবে। সেখানে আর সে তাহার ব্যক্তিগত কল্যাণ বা সুখ খুঁজিবে না, অথবা ব্যক্তিগত দুঃখ ও যন্ত্রনা এড়াইতে চাহিবে না, কারণ, এই সকলের দ্বারা তখন আর সে বিচলিত হইবে না, তখন আর সে বলিবে না, "আমি পুণ্যবান," "আমি পাপী' কিন্তু, নিজের উচ্চ অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিশ্বকল্যাণের জন্য কার্য্য করিবে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, এই অবস্থায় পৌঁছিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমেই প্রয়োজন—আত্মজ্ঞান, সমতা ও নির্ব্যক্তিক ভাব (impersonality), জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, আধ্যাত্মিকতার সহিত সাংসারিক কাজের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, কালাতীত আত্মার অচল নিষ্ক্রিয়তার সহিত প্রকৃতির ক্রিয়াশীলা শক্তির অনন্ত লীলার সামঞ্জস্য করিতে হইলে উহাই পথ। কিন্তু, যে কর্ম্মযোগী এইভাবে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সমন্বয় করিয়াছে, গীতা এইবার তাহার পক্ষে আর একটি আরও মহান্ প্রয়োজনের কথা বলিতেছে। এখন তাহার কাছে কেবল জ্ঞান ও কর্ম্মই চাওয়া হয় নাই, ভক্তিও চাওয়া হইতেছে। চাই ভগবদ্ভক্তি, ভগবদ্প্রেম, ভগবদুপাসনা, চাই পুরুষোত্তমকে লাভ করিবার জন্য আত্মার আকাঙ্ক্ষা। এ পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে এই প্রয়োজনের কথা না হইলেও ইহার জন্য শিষ্যকে ইতিপূর্ব্বেই প্রস্তুত করা হইয়াছে যখন গুরু বলিয়াছেন যে, তাঁহার যোগে সকল কর্ম্মকে ক্রমশঃ আমাদের জীবনের ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে পরিণত করিতেই হইবে,—সকল, কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াই এই যোগ পূর্ণ হইবে। শুধু আমাদের নির্ব্যক্তিক আত্মায় (impersonal self) সমর্পণ নহে, নির্ব্যক্তিক ভাবের ভিতর দিয়া সেই ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে যাঁহা হইতে

আমাদের সকল ইচ্ছা, সকল শক্তির উৎপত্তি। সেখানে যাহা ইঙ্গিত করা হইয়াছে এখন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে; এবং এখন আমরা গীতার উদ্দেশ্যটি আরও পূর্ণভাবে দেখিতে আরম্ভ করিতেছি।

এখন আমাদের সম্মুখে তিনটি পরস্পর-সাপেক্ষ প্রক্রিয়া ধরা হইয়াছে, যাহাদের দ্বারা আমরা সাধারণ প্রাকৃত জীবন হইতে মুক্ত হইতে পারি এবং দিব্য অধ্যাত্মজীবনে গড়িয়া উঠিতে পারি।

> ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
> সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ৭।২৭

"ইচ্ছা দ্বেষ হইতে যে সকল দ্বন্দ্ব উৎপন্ন হয় তাহাদের মোহে সংসারের সকলেই ভ্রমে পতিত হয়।" সেই অজ্ঞান, সেই অহঙ্কার সর্ব্বত্র ভগবানকে দেখিতে পায় না, ধরিতে পারে না, কারণ উহা শুধু প্রকৃতির দ্বন্দ্বসমূহকেই দেখিয়া থাকে এবং সর্ব্বদা নিজের স্বতন্ত্র সত্তা এবং বাসনা ও বিরাগসমূহকে লইয়াই ব্যস্ত থাকে। এই চক্র হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে আমাদের কর্ম্মে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন হইতেছে রাজসিক "[illegible] হইতে মুক্তি পাওয়া, মিথ্যা জ্ঞান হইতে, রাজসিক প্রকৃতির বাসনা উদ্ভব হইতে মুক্ত হওয়া, এবং আমাদের নৈতিক জীবনের সাত্ত্বিক প্রেরণা ও সংযমের দ্বারাই ইহা সম্পাদন করিতে হইবে। যখন উহা সম্পন্ন হইবে—যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্,—অথবা যখন উহা সম্পন্ন করা হইতেছে, কারণ, কতক দূর অগ্রসর হইবার পরই সাত্ত্বিক প্রকৃতির যতই বিকাশ হইবে ততই এক উচ্চস্তরের শান্তি, সমতা ও মুক্তভাব লাভের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে —তখন প্রয়োজন হইবে দ্বন্দ্বসকলের উপরে উঠা এবং নির্ব্যক্তিক ভাব ও সমতা লাভ করা, অক্ষরের সহিত একাত্মভাব, সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মভাব লাভ করা। অধ্যাত্মভাবের এইরূপ বিকাশই আমাদের

শুদ্ধিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবে। কিন্তু যখন ইহা করা হইতেছে, জীব যখন আত্মজ্ঞানে বর্দ্ধিত হইতেছে, তখন তাহাকে ভক্তিতেও বর্দ্ধিত হইতে হইবে। কারণ, জীবকে যে সমতার এক উদার ভাব লইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে শুধু তাহাই নহে,—ঈশ্বরার্থ যজ্ঞও করিতে হইবে। ঈশ্বর সর্ব্বভূতের মধ্যে অবস্থিত, তাঁহাকে এখনও সে সম্পূর্ণ ভাবে জানে না; কিন্তু তাঁহাকে এইভাবে সে জানিতে পারিবে,—সমগ্রম্ মাম্,—যখন সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বভূতে এক আত্মাকে দর্শন করার স্থির দৃষ্টি সে লাভ করিবে। সমতা এবং একত্বদর্শন যখন পূর্ণরূপে লাভ হইয়াছে —তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ—তখন উত্তমা ভক্তি, ভগবানের প্রতি সর্ব্বতোমুখী ভক্তি হইবে জীবনের সমগ্র ও একমাত্র নীতি। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অন্য সকল নীতি সেই আত্মসমর্পণের মধ্যেই নিমজ্জিত হইবে,—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। জীব তখন এই ভক্তিতে সুদৃঢ় হইবে, তাহার সকল জীবন, জ্ঞান ও কর্ম্ম আত্ম-নিবেদন করিবার সঙ্কল্পে সে সুদৃঢ় হইবে; কারণ তখন সে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান সম্বন্ধে পূর্ণ, সমগ্র, ঐক্যসাধক জ্ঞানেই নিজের নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা পাইবে, জীবনের ও কর্ম্মের চরম ভিত্তি পাইবে,—তে ভজন্তে মাম্ দৃঢ়ব্রতাঃ।

সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে, জ্ঞান ও নির্ব্যক্তিক ভাব লাভ করিবার পর আবার ভক্তির দিকে ফিরিয়া আসা অথবা হৃদয়বৃত্তির ক্রিয়া চলিতে দেওয়া, ইহা পশ্চাৎগমন বলিয়াই মনে হইতে পারে। কারণ, ভক্তিতে সকল সময়েই ব্যক্তিত্বের ভাব, এমন কি, ব্যক্তিত্বের ভিত্তি রহিয়াছে। কারণ ভক্তির মূল প্রেরণা হইতেছে জগদীশ্বরের প্রতি ব্যষ্টিগত আত্মা বা জীবের প্রেম ও শ্রদ্ধা। কিন্তু, গীতার দিক হইতে দেখিলে এইরূপ আপত্তি আদৌ উঠিতে পারে না; কারণ, নামরূপের অতীত অনন্ত নির্ব্যক্তিক সত্তার (The eternal imper-

sonal) মধ্যে লয় হওয়া, নিষ্ক্রিয় হওয়া, গীতার লক্ষ্য নহে,—আমাদের সমগ্র জীবনের ভিতর দিয়া পুরুষোত্তমের সহিত মিলিত হওয়াই গীতার লক্ষ্য। সত্য বটে, এই যোগে জীব নিজের নির্ব্যক্তিক ও অক্ষর আত্মসত্তাকে উপলব্ধি করিয়া নীচের ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হয় ; কিন্তু তখনও সে কর্ম্ম করে, এবং প্রকৃতির ক্ষরলীলায় রত বহুধা-আত্মাই সকল কর্ম্মের অধিপতি। নিরতিশয় নিষ্ক্রিয়তাকে সংশোধন করিবার জন্য আমরা যদি ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞের আদর্শ না আনি, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে এই যে কর্ম্ম চলিতে থাকে, সেইটাকে দেখিতে হয় যেন আদৌ আমাদের নয়, সেটা যেন ত্রিগুণের খেলারই কিছু অবশিষ্টাংশ, তাহার পশ্চাতে দিব্য সত্য কিছুই নাই। আমাদের যে অহং, যে আমিত্ব লয়প্রাপ্ত হইতেছে, তাহারই একটা রূপ, নীচের প্রকৃতির খেলারই জের। তাহার জন্য আমরা দায়ী নহি, কারণ, আমাদের জ্ঞান তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাহা হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ নিষ্ক্রিয় অবস্থা লাভ করিতে চায়। কিন্তু অদ্বিতীয় আত্মার শান্ত নির্ব্যক্তিক ভাবের সহিত ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞার্থে কৃত প্রকৃতির কর্ম্মলীলা যোগ করিয়া দিয়া, আমরা এই দ্বিবিধ সাধনার দ্বারা নীচের অহংভাবপূর্ণ বক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারি এবং আমাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক স্বরূপের পবিত্রতায় গড়িয়া উঠিতে পারি। তখন আর আমরা নীচের প্রকৃতির বদ্ধ অজ্ঞান "আমি" থাকি না ; তখন দিব্য পরা প্রকৃতিতে মুক্ত জীব হই। তখন আর আমরা এই জ্ঞানের মধ্যে থাকি না যে, এক অক্ষর ও নির্ব্যক্তিক আত্মা এবং এই ক্ষর বহুধা প্রকৃতি, এই দুইটি পরস্পর বিরোধী সত্তা ; কিন্তু আমাদের জীবনের এই দুইটি দিক দিয়া একসঙ্গে উঠিয়া পুরুষোত্তমের আলিঙ্গনের মধ্যেই বাস করি। এই তিনই আধ্যাত্মিক সত্তা। তৃতীয় সত্তাটিই উচ্চতম ;

এবং যে দুইটিকে পরস্পরের বিরোধী দেখায়, তাহারা ঐ তৃতীয় সত্তারই দুইটি সাম্‌না-সাম্‌নি দিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৃষ্ণ পরে বলিবেন— *

"আধ্যাত্মিক পুরুষ দুইটি—নামরূপের অতীত নির্ব্যক্তিক (impersonal) অক্ষর পুরুষ এবং নামরূপযুক্ত (personal) ক্ষর পুরুষ। কিন্তু, আরও একটি উত্তমপুরুষ আছেন, তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয়। তিনি সমস্ত জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে ধরিয়া আছেন। তিনি ঈশ্বর অব্যয়। আমিই এই পুরুষোত্তম, আমি ক্ষরের উপর, এমন কি আমি অক্ষর অপেক্ষাও বড়, অক্ষরেরও উপরে। যে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে, সে সকল জ্ঞানের সহিত সর্ব্বভাবে, তাহার প্রাকৃত জীবনের সকল দিক দিয়া আমাকে ভজনা করে।" এই যে সম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত এবং সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের সহিত ভক্তি, গীতা এখন তাহাই পরিস্ফুট করিতে আরম্ভ করিতেছে।

কারণ, মনে রাখিতে হইবে যে, গীতা শিষ্যের নিকট জ্ঞানযুক্ত ভক্তিই চাহিয়াছে, এবং অন্যান্য প্রকারের ভক্তি আপন আপন ভাবে

---

* দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি, পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥ ১৫।১৬—১৯

ভাল হইলেও, গীতা বলিয়াছে যে, সে সব নিম্নস্তরের ভক্তি; সাধন-মার্গে তাহারা কল্যাণকর হইতে পারে বটে, কিন্তু আত্মার যে চরম সিদ্ধি গীতার লক্ষ্য, ঐসব ভক্তি সে জিনিষ নহে। যে-সকল ব্যক্তি রাজসিক আমিত্বের পাপ বর্জ্জন করিয়াছে এবং ভগবানের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গীতা চারি শ্রেণীর ভক্তকে পৃথক করিয়াছে।* কেহ সংসারের দুঃখ-কষ্ট হইতে আশ্রয়ের জন্য তাঁহার দিকে যায়—আর্ত্ত। কেহ ঐহিক কল্যাণদাতা বলিয়া তাঁহার উপসনা করে,—অর্থার্থী। কেহ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় তাহার নিকটে আসে—জিজ্ঞাসু। আবার কেহ জ্ঞানের সহিত তাহাকে ভজনা করে,—জ্ঞানী। গীতা সকলকেই প্রশংসা করিয়াছে, কিন্তু কেবল শেষেরটিকেই সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করিয়াছে। এই সকল চেষ্টার কোনটাই মন্দ নহে, সবগুলিই উদার ও কল্যাণকর—উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে,—কিন্তু জ্ঞানের সহিত যে ভক্তি তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—বিশিষ্যতে। এই যে কয়েক প্রকারের ভক্ত ইহাদিগকে ক্রমান্বয়ে বলিতে পারা যায়, ভাবপ্রবণ প্রকৃতির ভক্তি (আর্ত্ত), কর্ম্মপ্রবণ প্রকৃতির ভক্তি (অর্থার্থী), চিন্তাপ্রবণ প্রকৃতির ভক্তি (জিজ্ঞাসু), এবং সর্ব্বোচ্চ অন্তর্জ্ঞানময় সত্তার (the highest intuitive being) ভক্তি (জ্ঞানী)। এই সত্তাই প্রকৃতির অন্যান্য অংশকে লইয়া ভগবানের সহিত একত্ব সাধন করে। যাহাই হউক, কার্য্যতঃ অন্যান্য প্রকারের ভক্তিকে প্রাথমিক সাধনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ, গীতা নিজেই এখানে বলিয়াছে যে, বহু জন্ম পরে

---

* চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৭।১৬

সমগ্র জ্ঞান লাভ করিয়া এবং সেই জ্ঞান অনুসারে জীবনকে গঠন করিয়া তবে মানুষ অবশেষে বিশ্বাতীত ভগবানকে লাভ করিতে পারে। কারণ, যাহা কিছু আছে সে সবই ভগবান, এই জ্ঞান-লাভ করা অতিশয় কঠিন; এবং যিনি এইরূপ সমগ্র ভাবে ভগবানকে দেখিতে পারেন, এবং নিজের সমগ্র সত্তা লইয়া, প্রকৃতির সর্ব্বভাব লইয়া ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন,—সর্ব্ববিৎ সর্ব্বভাবেন,—সেরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ।*

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কেবল ঐহিক লাভের জন্যই যে-ভক্তি ভগবানের উপাসনা করে, অথবা সংসারের দুঃখ, যন্ত্রণা এড়াইবার জন্যই ভগবানের শরণাপন্ন হয়, কেবল ভগবানকে পাইবার জন্যই ভগবানের উপাসনা করে না, সে ভক্তি কেমন করিয়া উদার ও মহৎ হইল,—উদারাঃ? এইরূপ ভক্তিতে কি অহঙ্কার, দুর্ব্বলতা ও বাসনারই প্রাধান্য নহে এবং ইহা কি নীচের প্রকৃতিরই খেলা নহে? আরও কথা এই যে, যেখানে জ্ঞান নাই সেখানে ভক্ত ভগবানকে সমগ্রভাবে সর্ব্বতোভাবে জানিয়া,—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি,—ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় না; কিন্তু অসম্পূর্ণ নামরূপের ভিতর দিয়া ভগবানের কল্পনা করে, সে সব তাহার নিজেরই প্রয়োজন স্বভাব প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং সেই সব নামরূপের পূজা করিয়া সে নিজের প্রাকৃত বাসনার তৃপ্তি করিতে চায়। ভগবানকে কেহ ইন্দ্র বা অগ্নিরূপে, বিষ্ণু বা শিবরূপে, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধরূপে কল্পনা করে; কেহ ভগবানকে কতকগুলি

---

* বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ৭।১৯

প্রাকৃত গুণরাশির সমষ্টি বলিয়া কল্পনা করে,—তিনি প্রেমময়, ক্ষমাশীল; কেহ বা আবার ভাবে ভগবান অতি কঠোর ন্যায়পরায়ণ, বিচারপরায়ণ; কেহ ভগবানকে ক্রোধপরায়ণ, ভীষণ দণ্ডদাতা ভাবিয়া ভয়মিশ্রিত ভক্তির সহিত দেখিয়া থাকে, আবার কেহ এই সব লক্ষণ কোন রকমে মিলাইয়া মিশাইয়া ভগবানের কল্পনা করে, অন্তরে এবং বাহিরে সেই ভগবানের বেদী স্থাপন করে এবং তাঁহার সম্মুখে লুণ্ঠিত হইয়া পার্থিব কল্যাণ ও সুখ প্রার্থনা করে, অথবা শোক-দুঃখে সান্ত্বনা প্রার্থনা করে, অথবা নিজেদের ভ্রান্ত, গোঁড়ামিপূর্ণ পরমত—অসহিষ্ণু সাম্প্রদায়িক জ্ঞানের সমর্থন প্রার্থনা করে। এই সবই কতক দূর পর্য্যন্ত খুবই সত্য। যাহা কিছু আছে সে সবই সর্ব্বব্যাপী বাসুদেব, এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা অতি দুর্ল্লভ,—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ। বিবিধ বাহ্য বাসনার দ্বারা চালিত হইয়া মনুষ্য-সকল বিপথগামী হয়। ঐ সকল বাসনা তাহাদের ভিতরের জ্ঞান-ক্রিয়াকে হরণ করিয়া লয়—কামৈ স্তৈ স্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ। অজ্ঞান তাহারা, অপর দেবতার আরাধনা করে, তাহারা ভগবানের সেই সব অসম্পূর্ণ রূপের পূজা করে যাহা তাহাদের বাসনার অনুরূপ হয়,—প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ। তাহারা নিজেরা ক্ষুদ্র, তাই এমন সব সঙ্কীর্ণ নিয়ম বা মতবাদ স্থাপন করে, যাহা হইতে তাহাদের প্রকৃতির প্রয়োজন সিদ্ধ হয়,—তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া। এবং এই সবেতেই তাহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত প্রেরণার দ্বারাই বাধ্য হয়,—তাহারা নিজেদের প্রকৃতিরই এই সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনকে অনুসরণ করিয়া চলে এবং সেইটিকেই পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করে,—অনন্তকে তাহার বিশালতার সহিত গ্রহণ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। তাহাদের

শ্রদ্ধা যদি পূর্ণ থাকে তাহা হইলে ভগবান এই সকল বিভিন্ন নামরূপের ভিতর দিয়াই তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। কিন্তু এই সব ফল ও ভোগ ক্ষণস্থায়ী। যাদের মন ক্ষুদ্র, বুদ্ধি এখনও বিকশিত হয় নাই, কেবল তাহারাই এই সকলের অনুসরণকে ধর্ম্মের ও জীবনের নীতি বলিয়া গ্রহণ করে। এই পথে আধ্যাত্মিক লাভ যদি কিছু হয়, তাহা কেবল দেবতাদের নিকট পর্য্যন্তই পৌছান; ক্ষর প্রকৃতির লীলার মধ্যে ভগবান যে বিভিন্ন নামরূপ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার ফল প্রদান করিতেছেন, তাহারা ভগবানকে কেবল প্রকৃতির সেই সব নামরূপের মধ্যে লাভ করে। কিন্তু যাহারা প্রকৃতির অতীত ভগবানকে সমগ্র সত্তায় উপাসনা করে তাহারা এই সবকেই পায়, এবং এই সবেরই রূপান্তর সাধন করে,—দেবতাগণকে তাহাদের উচ্চতম স্তরে, প্রকৃতিকে তাহার উচ্চতম শিখরে উত্তোলন করে; এবং তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া একেবারে ভগবানের নিকটেই পৌছায়, বিশ্বাতীত পরম বস্তুকে লাভ করে—দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।

তথাপি পরমেশ্বর ভগবান এই সকল ভক্তকে তাহাদের অসম্পূর্ণ দৃষ্টির জন্য পরিত্যাগ করেন না; কারণ, ভগবানের এই সকল আংশিক প্রকাশের অতীত যে অজ, অব্যয়, শ্রেষ্ঠ ভাব, কোনও জীবের পক্ষেই ভগবানকে সেই ভাবে জ্ঞাত হওয়া সহজ নহে। —মায়ার * বিরাট আচ্ছাদনে তিনি নিজেকে সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যে জগতের সহিত এক হইয়াও জগতের অতীত, সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকিয়াও

---

* নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ৭।২৫

অগোচর, সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও সকলেরই নিকট প্রকাশিত নহেন, ইহা তাঁহারই যোগমায়ার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। প্রকৃতিতে বদ্ধ মানুষ মনে করে যে, প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের যে-সব প্রকাশ তাহাই ভগবানের সব; কিন্তু বস্তুতঃ সে-সব কেবল তাঁহার ক্রিয়া, তাঁহার শক্তি, তাঁহার অবগুণ্ঠন। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সবই সমগ্রভাবে জানেন; কিন্তু তাঁহাকে এখনও কেহ জানিতে পারে নাই *। তাহা হইলে ভগবান প্রকৃতিতে নিজের লীলার দ্বারা তাহাদিগকে এইভাবে বিমূঢ় করিবার পর যদি তাহাদিগকে এই সবের ভিতর দিয়াই দেখা না দেন তাহা হইলে কোনও মানুষের পক্ষে, মায়ায় বদ্ধ কোনোও জীবের পক্ষেই ভগবানকে পাওয়ার কোনও আশাই থাকিবে না। অতএব, আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে যে যে-ভাবে ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়, ভগবান তাহাদের ভক্তি গ্রহণ করেন এবং ভগবদ্ প্রেম ও দয়ার দ্বারা তাহার প্রতিদান দেন। এই যে-সব বিভিন্ন দেবতার রূপ, বস্তুতঃ ইহাদের ভিতর দিয়া মানুষের অপূর্ণ বুদ্ধি ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারে; এই যে-সব বাসনার অনুসরণ প্রথমতঃ ইহাদের ভিতর দিয়াই মানুষ ভগবানের দিকে মুখ ফিরায়; কোনও ভক্তি যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন, তাহা একেবারে বৃথা বা নিরর্থক নহে। ইহার মধ্যে অতি বড় প্রয়োজনীয় জিনিসটি রহিয়াছে,—শ্রদ্ধা (faith)। "যে-কেহনও ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত আমার যে-কোনও রূপের পূজা করে আমি তাহার সেই শ্রদ্ধা দৃঢ় ও অচল

---

* বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ ৭।২৬

করিয়া দিই।" ‡ তাহার নিজের মতানুযায়ী পূজায় তাহার যে-বিশ্বাস সেই বিশ্বাসের জোরেই সে তাহার বাসনানুযায়ী ফললাভ করে এবং সেই সময়ে যে-আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের সে যোগ্য, সেই সিদ্ধি সে লাভ করে। তাহার সমস্ত কল্যাণ ভগবানের নিকট চাহিতে চাহিতে শেষ পর্যান্ত সে ভগবানকেই তাহার একমাত্র কল্যাণ বলিয়া প্রার্থনা করিবে। তাহার সমস্ত আনন্দের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিতে করিতে সে ভগবানের মধ্যেই তাহার সমস্ত আনন্দের সন্ধান করিতে শিখিবে। ভগবানকে তাঁহার নামরূপ ও গুণের মধ্যে জানিতে জানিতে অবশেষে সে জানিতে পারিবে যে, ভগবানেই সব, তিনি বিশ্বের অতীত এবং সকল বস্তুরই মূল। *

এইভাবে আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্বারা ভক্তি জ্ঞানের সহিত এক হয়। জীব ক্রমশঃ একমাত্র ভগবানেই আনন্দ লাভ করে, সে জানে যে

---

‡ যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ৭।২১
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ৭।২২

নীচের তিন প্রকারের যে ভক্তি, সর্ব্বোত্তম সিদ্ধিলাভের পরও তাহাদের একটা স্থান আছে; কিন্তু তখন তাহারা রূপান্তরিত, তখন সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত ভাব আর থাকে না। দুঃখ ও পাপ ও অজ্ঞান দূর হউক, এই প্রাকৃত জগতে সর্ব্বোত্তম কল্যাণ, শক্তি, আনন্দ ও জ্ঞান উত্তরোত্তর বিকশিত হউক, পূর্ণভাবে প্রকটিত হউক, এই বাসনার বেগ তখনও হৃদয়ে থাকিতে পারে।

ভগবানই সকল সত্তা ও চেতনা ও আনন্দ, ভগবানই সকল বস্তু সকল জীব, সকল ঘটনা। সে প্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে জানে, আত্মাতে ভগবানকে জানে, আবার ভগবান যে আত্মা ও প্রকৃতির অতীত তাহাও অবগত হয়। সে সর্ব্বদা ভগবানের সহিত যোগে অবস্থান করে,—নিত্যযুক্তঃ। যে বিশ্বাতীত সত্তার উপরে আর কিছুই নাই, যে-বিশ্বব্যাপী সত্তা ভিন্ন আর কেহ নাই, কিছুই নাই, তাঁহার সহিত চিরন্তন যোগই হয় তাহার সমগ্র জীবন, সমগ্র সত্তা। তাঁহার উপরেই তাহার সকল ভক্তি একান্তভাবে নিবদ্ধ হয়,—কোনও অংশদেবতা, বিধি বা মতবাদের উপরে নহে। এই ঐকান্তিক ভক্তিই হয় তাহার জীবনের সমগ্র নীতি। সে সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত ও বিশ্বাসের উপরে চলিয়া যায়; সকল নৈতিক বিধি-নিষেধের উপরে, ব্যক্তিগত সকল বাসনা-কামনার উপরে চলিয়া যায়। তখন আর তাহার কোনও শোক দুঃখ থাকে না যে উপশম করিতে হইবে; কারণ, সে সকল আনন্দের আধারকে লাভ করিয়াছে। কোনও বাসনার তৃপ্তির জন্য তখন তাহাকে লালায়িত হইতে হয় না, কারণ, যিনি সব, সকলের উপরে, তাঁহাকেই সে লাভ করিয়াছে; যিনি সকল সিদ্ধি প্রদান করেন, সে সেই সর্ব্বশক্তিমানের সামীপ্য লাভ করিয়াছে। তাহার কোন সংশয়, কোন অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা অবশিষ্ট থাকে না, কারণ যে-দিব্য জ্যোতির মধ্যে সে বাস করে, তাহা হইতেই সমস্ত জ্ঞান তাহার উপর বিচ্ছুরিত হয়। ভগবানের প্রতি তাহার পূর্ণ প্রেম এবং সে ভগবানের প্রিয়; কারণ, সে ভগবানে যেরূপ আনন্দ পায়, ভগবানও তাহাতে সেইরূপই আনন্দ পান। *

---

* যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।

জ্ঞানের সহিত যে ভগবানের ভজনা করে, যে জ্ঞানী-ভক্ত, ইহাই তাহার স্বরূপ। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, এইরূপ জ্ঞানী তাঁহার আত্মা,—জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্। অপর ভক্তেরা কেবল প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন শক্তিকে আশ্রয় করে ; কিন্তু জ্ঞানীভক্ত একেবারে পুরুষোত্তমের আত্মসত্তা ও লীলাকে আশ্রয় করে, তাঁহারই সহিত সে যুক্ত। তাহারই হইয়াছে পরা প্রকৃতিতে দিব্য জন্ম, জীবনে সে পূর্ণ-বিকশিত, ইচ্ছা শক্তিতে পূর্ণ, প্রেমে অনন্ত, জ্ঞানে সিদ্ধ। তাহাতেই জীবের বিশ্বলীলা সার্থক হইয়াছে ; কারণ, সে নিজেকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে এবং এইভাবেই তাহার জীবনের পূর্ণতম উচ্চতম সত্যকে লাভ করিয়াছে।

পরম পুরুষ (১)

সপ্তম অধ্যায়ে এপর্যান্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের সাধনার নূতন প্রতিষ্ঠাটি খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিবার সন্ধানও মিলিয়াছে। সংক্ষেপতঃ উহা এই, আমাদিগকে অন্তর্মুখী হইয়া এক উচ্চতর চৈতন্যের দিকে, এক পরম সত্তার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের পার্থিব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ ভাবে বাদ দিতে হইবে না; কিন্তু এখন আমরা মূলতঃ বস্তুতঃ যাহা কিছু, সে সবেরই একটা উচ্চতর, একটা অধ্যাত্ম সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে।—কেবল আমাদের মর্ত্ত্যের অপরিপূর্ণতা ছাড়াইয়া দিব্যজীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে; এরূপ হওয়া যে সম্ভব তাহার কারণ, প্রথমতঃ, মানুষের মধ্যে যে ব্যষ্টিগত আত্মা, জীবাত্মা, রহিয়াছে, উহা মূল সনাতন সত্তায় এবং মূল শক্তিতে পরমাত্মা ও ভগবানেরই স্ফুলিঙ্গ, এখানে উহা ভগবানেরই প্রচ্ছন্ন আবির্ভাব, তাঁহারই সত্তার সত্তা, তাঁহারই চৈতন্যের চৈতন্য, তাঁহারই প্রকৃতির প্রকৃতি, কিন্তু এই দেহ মনের অজ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ, নিজের প্রকৃত সত্তা ও সত্য স্বরূপ সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত। দ্বিতীয়তঃ, জীবাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে দুই প্রকৃতিকে ধরিয়া। মূল প্রকৃতিতে উহা উহার প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্তার সহিতই এক থাকে, এবং নীচের প্রকৃতিতে উহা অহঙ্কার ও অজ্ঞানের বশে মোহগ্রস্ত হয়। এই শেষেরটিকে বর্জ্জন করিতে হইবে; এবং অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে পুনরায় অন্তরের মধ্যে পাইতে

(১) গীতা সপ্তম অধ্যায় ২৯, ৩০; অষ্টম অধ্যায়।

হইবে, তাহার পূর্ণ বিকাশ করিতে হইবে, তাহাকে সচল ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। আত্মার অভ্যন্তরীণ বিকাশ সাধন করিয়া, এক নূতন জীবনের দ্বার উন্মোচন করিয়া, এক নূতন শক্তির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাই; এবং আমরা যে-ভগবান হইতে এই মর্ত্ত্য রূপের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছি পুনরায় তাঁহারই অংশ হই।

এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গীতা ভারতের তৎকালীন সমসাময়িক মতকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এখানে জীবনকে অস্বীকার করিবার ভাব, 'নেতি নেতি'র ভাব কম, স্বীকার করার ভাবই বেশী। প্রকৃতির আত্মবিনাশের (a self-annulment of Nature) উপরেই ছিল সেই যুগের একান্ত ঝোঁক; তাহার পরিবর্ত্তে আমারা এক পূর্ণতর সমাধানের ইঙ্গিত পাইতেছি। পরবর্ত্তীকালে যে-সব ভক্তিমূলক ধর্ম্মের বিকাশ হয়,—তাহাদেরও অন্ততঃ একটা পূর্ব্বাভাস এখানে দেখিতে পাইতেছি। আমাদের সাধারণ জীবনের উপরে যে-সত্য রহিয়াছে, আমরা যে-অহংভাবের মধ্যে বাস করি, তাহার পশ্চাতে লুক্কায়িত যে-সত্য, সে-সম্বন্ধে আমাদের যাহা প্রথম অনুভূতি, গীতারও মতে তাহা হইতেছে এক বিশাল, নির্ব্যক্তিক, অক্ষর আত্মার শান্তি, তাহার সমতা ও ঐক্যের মধ্যে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের লোপ করি,—তাহার শান্ত পবিত্রতার মধ্যে আমাদের বাসনা ও রিপুর সমস্ত সঙ্কীর্ণ প্রেরণাকে বর্জ্জন করি। কিন্তু, তাহার পর আমাদের দৃষ্টি যখন আরও পূর্ণ হয়, তখন আমরা দেখিতে পাই এক জীবন্ত অসীম সত্তা, এক দিব্য অপরিমেয় পুরুষ; আমরা যাহা কিছু সবই তাঁহা হইতেই উৎপন্ন, আত্মা ও প্রকৃতি, জগৎ ও জীব, যাহা কিছু আমরা, সবই তাঁহার। আত্মায় যখন

আমরা তাঁহার সহিত এক হই তখন আমরা লয়প্রাপ্ত হই না; বরং এই অনন্তের মহত্ত্বে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়া তাঁহারই মধ্যে আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তাকে ফিরিয়া পাই। ইহা এক সঙ্গেই সাধিত হয় একযোগে তিনটি প্রক্রিয়ার দ্বারা,—তাঁহার ও আমাদের অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মের ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে আত্মার সন্ধান লাভ করা (an integral self-finding); যাঁহার মধ্যে সব রহিয়াছে, যিনিই সব, সেই দিব্য পরম পুরুষের জ্ঞানের ভিতর দিয়া সমগ্র ভাবে আত্মস্বরূপে গড়িয়া উঠা (an integral self-becoming); এবং এই সর্ব্বময়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের প্রতি প্রেম ও ঐকান্তিক ভক্তির ভিতর দিয়া সমগ্রভাবে আত্ম সমর্পণ করা (an integral self-giving), আমাদের সকল কর্ম্মের প্রভু, আমাদের হৃদয়ের অধিবাসী, আমাদের সমগ্র জাগ্রত জীবনের আধার এই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। তৃতীয়টিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং চরম-সিদ্ধিপ্রদ প্রক্রিয়া। যিনি আমাদের সবের মূল তাঁহাকেই আমাদের সব সমর্পণ করি। আমাদের অবিরত আত্মসমর্পণের দ্বারা আমাদের সকল জ্ঞান তাঁহারই জ্ঞানে পরিণত হয়, আমাদের সকল কর্ম্ম তাঁহারই শক্তির জ্যোতিতে পরিণত হয়। আমাদের আত্ম-সমর্পণে যে প্রেমের আবেগ তাহাই আমাদিগকে তাঁহার নিকটে পৌঁছাইয়া দেয় এবং তাঁহার স্বরূপের গভীরতম রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়।—এই যে ত্রিধা সাধনা, উত্তম রহস্যের দ্বার খুলিবার ত্রিধা শক্তি, প্রেমের দ্বারাই তাহা সম্পূর্ণ হয়, প্রেমের দ্বারাই তাহা পূর্ণতম সিদ্ধিলাভ করে।

আমাদের আত্মসমর্পণ কার্য্যকরী হইতে হইলে প্রথমেই চাই যেন উহাতে পূর্ণ জ্ঞান থাকে। অতএব সর্ব্ব প্রথমেই এই পুরুষকে

জানিতে হইবে তাঁহার দিব্য সত্তার সকল শক্তিতে ও সকল তত্ত্বে, তত্ত্বতঃ, সনাতন মুল স্বরূপে এবং জীবনলীলায়, সকলের পূর্ণ সামঞ্জস্যে। কিন্তু প্রাচীনদের নিকট এই জ্ঞানের, তত্ত্বজ্ঞানেব, মুল্য কেবল এই ছিল যে, ইহার শক্তিতে আমরা মরজীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এক পরম জীবনের অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি। কিন্তু এই মুক্তিও উচ্চতমভাবে কিরূপে গীতার নিজস্ব অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারাই পরিণামে লাভ করা যায়, গীতা এখন তাহাই দেখাইতেছে। গীতার কথার মর্ম্ম এই যে, পুরুষোত্তমের জ্ঞানই ব্রহ্ম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যাহারা আমাকে তাহাদের আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করে,—শরণমাশ্রিত্য, তাহাদের দিব্য জ্যোতিঃ, তাহাদের মুক্তিদাতা, তাহাদের আত্মার গৃহীতা ও আশ্রয়দাতা বলিয়া ভজনা করে,—যাহারা জরা ও মরণ হইতে, মরজীবন এবং ইহার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য অধ্যাত্ম সাধনায় আমার শরণাপন্ন হয়, তাহারা "সেই ব্রহ্মকে" জানিতে পারে, সমগ্রভাবে অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে জানিতে পারে এবং অখিল কর্ম্মকে জানিতে পারে (*)। আর যেহেতু তাহারা আমাকে জানে এবং সেই সঙ্গেই অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞকে জানে, সেই জন্য এই দেহের জীবন ছাড়িয়া যাইবার সংকটক্ষণেও আমার সম্বন্ধে জ্ঞান তাহাদের থাকে এবং সেই মুহূর্ত্তে তাহাদের সমগ্র চেতনাকে আমার সহিত যুক্ত করিয়া রাখে (‡)। সেই জন্যই তাহারা আমাকে পায়। মরজীবনে

(*) জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ৭।২৯

(‡) সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৭।৩০

আর বদ্ধ না থাকায় উহারা উচ্চতম দিব্য পদ ঠিক তাহাদেরই ন্যায় লাভ করে যাহারা নির্ব্যক্তিক (impersonal) অক্ষর ব্রহ্মে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে লয় করে। এই নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত দিয়াই গীতা সপ্তম অধ্যায় শেষ করিয়াছে।

এখানে আমরা কয়েকটি কথা পাইতেছি, তাহাদের মধ্যেই ভগবানের জগৎলীলায় আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান মূল সত্য-গুলি সংক্ষেপে রহিয়াছে। ভগবানের সৃষ্টিসূত্র ও কার্য্যপ্রণালীর সকল দিকই উহাদের মধ্যে আছে, জীবাত্মাকে পূর্ণ আত্মজ্ঞানে ফিরিয়া যাইতে হইলে যাহা কিছু প্রয়োজন সবই এখানে রহিয়াছে। প্রথমেই আছে, "সেই ব্রহ্ম,"—তদ্ ব্রহ্ম, পরে প্রকৃতিতে আত্মার মূল প্রকাশ,—অধ্যাত্ম; তাহার পর, অধিভূত এবং অধিদৈব যথা-ক্রমে বহির্জগতের ব্যাপার এবং অন্তর্জগতের ব্যাপার; শেষে, অধিযজ্ঞ, ইহাই জাগতিক কর্ম্ম ও যজ্ঞের নিগূঢ় রহস্য। শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহা ফলতঃ এই,—"আমি পুরুষোত্তম (মাং বিদুঃ), আমি এই সকলেরই উপরে, তথাপি এই সকলেরই মধ্য দিয়া এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের সহায়তাতেই আমাকে সন্ধান করিতে হইবে, জানিতে হইবে,—মানুষের চেতনা যে আমাকে ফিরিয়া পাইবার পথ খুঁজিতেছে, তাহার পক্ষে ইহাই একমাত্র পূর্ণ সাধনা।" কিন্তু কেবল এই শব্দগুলি হইতে ইহাদের অর্থ প্রথমে স্পষ্ট বুঝা যায় না, অন্তত. ইহ অর্থ করা যাইতে পারে। এই সকল শব্দের দ্ব ঠিক কি বুঝাইতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে; এবং আদর্শ শিষ্য অর্জ্জুনও তৎক্ষণাৎ তাহাদের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন

—শুধু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করিতে গীতা কোথাও বেশীক্ষণ দাঁড়ায় নাই; গীতা কেবল ততটুকুই এমন ভাবে দিয়াছে যেন তাহাদের সত্যটি ধরিতে পারা যায়, এবং সাধক নিজেই অনুভূতি উপলব্ধি লাভ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে পারে। প্রতিভাসিক (the phenomenal) জগতের বিপরীত স্বপ্রতিষ্ঠ (self-existent) সত্তাকে বুঝাইতে উপনিষদ্ একাধিকবার "তদ্ ব্রহ্ম" এই বাক্য ব্যবহার করিয়াছে; মনে হয় এই বাক্যের দ্বারা গীতা আত্মার অক্ষর প্রতিষ্ঠাকে (the immutable self-existence) বুঝিয়াছে, ইহাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ আত্মাভিব্যক্তি এবং ইহারই অপরিবর্ত্তনীয় অনন্ততার উপরে বাকী সব,—যাহা কিছু চলিতেছে, বিকশিত হইতেছে সেই সব—প্রতিষ্ঠিত,—অক্ষরম্ পরম্ *। পরা প্রকৃতিতে জীবের যে আধ্যাত্মিক ভাব ও মূল প্রকাশের ধারা,—স্বভাব, গীতার মতে তাহাই অধ্যাত্ম,—স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে।

গীতা বলিয়াছে, সৃষ্টির প্রেরণা ও শক্তিকেই কর্ম্ম বলা হয়, —বিসর্গঃ কর্ম্মসঞ্জিতঃ। ঐ প্রথম মূল আত্মপ্রকাশ বা স্বভাব হইতে কর্ম্মই বস্তু সকলকে সৃজন করিতেছে, এবং এই স্বভাবের বশেই কার্য্য করিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে, প্রকৃতিতে বিশ্বলীলা প্রকট করিতেছে। ক্ষরলীলার ফলে যাহা কিছুর আবির্ভাব হইতেছে, অধিভূত বলিতে সেই সমস্তই বুঝিতে হইবে,—অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ।

(*) মং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতাভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮।৩
অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৮।৪

প্রকৃতিতে যে-পুরুষ বিরাজ করিতেছেন,—প্রকৃতিস্থ আত্মা,—তিনিই অধিদৈব। তাঁহার মূল সত্তার যে সব ক্ষর ভাব কর্ম্ম প্রকৃতিতে প্রকট করিতেছে, পুরুষের চেতনায় সে সব প্রতিফলিত হইতেছে। অন্তর্যামী পুরুষ সেই সব দেখিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "কর্ম্মের ও যজ্ঞের অধিপতি,—অধিযজ্ঞ,—বলিতে আমাকেই বুঝায়। আমি ভগবান, বিশ্বদেব, পুরুষোত্তম—এখানে এই সব দেহধারীদের মধ্যে আমি গুপ্তভাবে বিরাজ করিতেছি।" অতএব যাহা কিছু আছে,—সর্ব্বমিদং,—সবই এই কয়েকটি শব্দের সূত্রের মধ্যে পড়িয়াছে।

গীতা এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াই জ্ঞানের দ্বারা অন্তিমে যে মুক্তিলাভ করা যায় তাহাই অবিলম্বে বুঝাইতে অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে এইরূপ মুক্তিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অবশ্য পরে গীতা আবার এই কথার আলোচনা করিবে, এ সম্বন্ধে আরও এমন ব্যাখ্যা দিবে কর্ম্মের জন্য এবং অভ্যন্তরীণ উপলব্ধির জন্য যাহা আবশ্যক। ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এই সকল শব্দ বলিতে যাহা কিছু বুঝায় সেই সবের আরও পূর্ণ জ্ঞানের জন্য অপেক্ষা করিতে পারি। কিন্তু আর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, এখানে এবং ইহার আগে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই এই সকল বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ যতটা বুঝা যায়, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ, এখানে বিশ্বলীলার ধারা সম্বন্ধে গীতার মতটি ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ রহিয়াছে ব্রহ্ম,—ইহা উচ্চতম অক্ষর আত্মপ্রতিষ্ঠ (self-existent) সত্তা; দেশ-কাল-নিমিত্তের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির যে খেলা চলিতেছে তাহার পশ্চাতে সর্ব্বভূতই বস্তুতঃ ব্রহ্ম। কারণ, ঐ আত্মপ্রতিষ্ঠা আছে বলিয়াই দেশ, কাল, নিমিত্তের থাকা

সম্ভব হইয়াছে। ঐ অপরিবর্ত্তনশীল সর্ব্বব্যাপী অথচ অখণ্ড আধার যদি না থাকিত, তাহা হইলে দেশ, কাল, নিমিত্তের বিভাগ এবং নামরূপের খেলা সম্ভব হইত না। কিন্তু নিজে ঐ অক্ষরব্রহ্ম কিছুই করে না, কোন কিছুর কারণ হয় না, কোন কিছু সঙ্কল্প করে না। ইহা নিরপেক্ষ (impartial), সম, সকলকেই ধরিয়া আছে, কিন্তু কিছু বাছে না, কিছু উৎপাদন করে না। তাহা হইলে উৎপাদন করে কে, সঙ্কল্প করে কে, পরমপুরুষের দিব্য প্রেরণা দেয় কে? কর্ম্মকে যে পরিচালিত করে এবং অনন্ত সত্তা হইতে কালের মধ্যে কার্য্যতঃ বিশ্বলীলাকে প্রকট করে, সে কে? স্বভাবরূপে প্রকৃতি। পরাৎপর, ভগবান, পুরুষোত্তম রহিয়াছেন এবং তাঁহার অনন্ত অক্ষরতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পরা অধ্যাত্ম শক্তির ক্রিয়াকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। ভগবান যে দিব্য সত্তা, চৈতন্য, ইচ্ছা বা শক্তিকে বিস্তার করিতেছেন,—যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ,—তাহাই পরা প্রকৃতি। ভগবান তাঁহার সত্তায় যাহা কিছু আপনা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ধরেন এবং জীবের অধ্যাত্ম প্রকৃতি বা স্বভাবে প্রকট করেন, সে সবেরই মূল শক্তি ও সত্যটি আত্মা ঐ পরাপ্রকৃতিতে আত্মসম্বিতের আলোকেই দেখিতে পায়। প্রত্যেক জীবের অন্তর্নিহিত সত্য এবং মূল অধ্যাত্মতত্ত্ব, যাহা নিজেকে লীলার মধ্যে কার্য্যতঃ প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে, সংসার মধ্যে যে মূল দিব্য প্রকৃতি সকল পরিবর্ত্তন, বিকৃতি, বিপর্য্যয়ের ভিতরেও দিব্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহাই স্বভাব। স্বভাবের মধ্যে যাহা নিহিত আছে সে সব বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিসৃষ্ট হইয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতি যেন তাহা লইয়া পুরুষোত্তমের অন্তর্দৃষ্টির ছায়ায় যথাশক্তি ব্যবহার করে। নিত্য স্বভাবের মধ্য হইতে, প্রত্যেক ভূতের মূল প্রকৃতি

ও অধ্যাত্মসত্তার মধ্য হইতে, প্রকৃতি নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া উহাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে,—নিজের নামরূপের সমস্ত পরিবর্ত্তনের খেলা, দেশ-কাল-নিমিত্তের পরিবর্ত্তনের খেলা প্রকট করিতেছে *।

এই সব অভিব্যক্তি, এবং অবস্থা হইতে অবস্থার পরিবর্ত্তন —ইহাই কর্ম্ম, প্রকৃতির ক্রিয়া। প্রকৃতিই কর্ম্মী, লীলাময়ী। স্বভাব যখন সৃষ্টিক্রিয়ায় নিজেকে বিস্তার করে (বিসর্গ), তাহাই কর্ম্মের প্রথম রূপ। সৃষ্টি দুই প্রকারের,—ভূত ও ভাব। সৃষ্টিতে যে সকল বস্তু আবির্ভূত হইতেছে, তাহারাই ভূত (ভূতকরঃ), এবং ঐ সকল বস্তু অন্তরে ও বাহিরে যে রূপ গ্রহণ করিতেছে তাহাই ভাব (ভাবকরঃ)। কালের মধ্যে নিয়ত এই সকল জিনিষেরই উৎপত্তি হইতেছে (উদ্ভব); কর্ম্মের সৃষ্টিশক্তিই এই উদ্ভবের মূল। প্রকৃতির শক্তিসমূহের পরস্পর সংযোগে এই সব পরিবর্ত্তনশীল লীলা প্রকট হইতেছে (অধিভূত)। ইহাই জগৎ, ইহাই জীবাত্মার চৈতন্যের বিষয়-বস্তু (the object of the soul's consciousness)। এই সমুদায়ের মধ্যে জীবাত্মাই দ্রষ্টা ও ভোক্তাস্বরূপ প্রকৃতিস্থ দেবতা। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের দিব্য শক্তিসমূহ,—জীবাত্মা আপন চৈতন্যময় সত্তার যে সকল শক্তির দ্বারা প্রকৃতির খেলাকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে, তাহাদিগকে লইয়াই অধিদৈব। অতএব এই প্রকৃতিস্থ আত্মাই ক্ষর পুরুষ, ইহাই পরিবর্ত্তনশীল আত্মা, ভগবানের শাশ্বত কর্ম্মলীলা। এই আত্মা

* দেশ ও কালের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থার যে বিকাশ হইতেছে তাহাকেই আমরা নিমিত্ত (causality) বলি।

যখন প্রকৃতি হইতে সরিয়া ব্রহ্মে অবস্থিত, তখন ইহাই অক্ষর-পুরুষ, অপরিবর্ত্তনশীল আত্মা, ভগবানের শাশ্বত নিষ্ক্রিয়তা। কিন্তু ক্ষরপুরুষের দেহ ও রূপের মধ্যে দিব্য পরম পুরুষ বাস করেন। মানুষের মধ্যে পুরুষোত্তম রহিয়াছেন, তাঁহাতে অক্ষর সত্তার শান্তি রহিয়াছে। আবার সেই সঙ্গেই তিনি ক্ষরলীলাও উপভোগ করিতেছেন। তিনি যে কেবল বিশ্বের অতীত এক পরম পদে আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে রহিয়াছেন শুধু তাহাই নহে, তিনি এখানেও সর্ব্বভূতের দেহের মধ্যে রহিয়াছেন, প্রকৃতিতে এবং মানুষের হৃদ্দেশে বিরাজ করিতেছেন। এখানে তিনি প্রকৃতির কর্ম্মসমূহকে যজ্ঞরূপে গ্রহণ করিতেছেন এবং মানুষ সজ্ঞানে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে সেই অপেক্ষায় রহিয়াছেন। কিন্তু সকল সময়ে, এমন কি মানুষের অজ্ঞান ও অহঙ্কারের মধ্যেও, তিনি মানুষের স্বভাবের অধীশ্বর এবং তাহার সকল কর্ম্মের প্রভু। তাঁহার অধ্যক্ষতাতেই প্রকৃতি ও কর্ম্মের ক্রিয়া চলে। তাঁহা হইতেই জীবাত্মা প্রকৃতির ক্ষরলীলায় আবির্ভূত হয়; অক্ষর আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া জীবাত্মা আবার তাঁহাতেই ফিরিয়া যায়, ভগবানের পরমপদ লাভ করে,—পরমং ধাম।

জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ প্রকৃতি এবং কর্ম্মের ক্রিয়ার বশে জগৎ হইতে জগতান্তরে গমনাগমন করে। প্রকৃতিস্থ পুরুষ (Purusha in Prakriti), ইহাই তাহার সূত্র; তাহার মধ্যে আত্মা যাহা চিন্তা করে, যাহা ভাবে, যাহা করে সে সর্ব্বদা তাহাই হয়। পূর্ব্বজন্মে সে যাহা ছিল, যাহা করিয়াছে সেই সবের দ্বারাই তাহার বর্ত্তমান জন্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আবার এই জন্মে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে যেরূপ থাকিবে, যাহা ভাবিবে, যাহা

করিবে সেই সবের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবে যে, সে পরলোকে কি হইবে এবং পরজন্মেই বা কি হইবে। জন্ম যদি "হওয়া" (becoming), তাহা হইলে মৃত্যুও "হওয়া." মৃত্যু কোন ক্রমেই ফুরাইয়া যাওয়া নহে। শরীর পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু জীবাত্মা আপনার পথেই চলিতে থাকে (ত্যক্ত্বা কলেবরম্)। অতএব তাহার মহাযাত্রার সন্ধিক্ষণে সে কিরূপ থাকে তাহার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। কারণ যে-রূপ "হওয়া"র উপর তাহার চিত্ত মৃত্যুকালে নিবিষ্ট থাকে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বেও সর্ব্বদা যাহার চিন্তায় পূর্ণ ছিল, তাহাকে সেই রূপই পাইতে হয়। যেহেতু প্রকৃতি কর্ম্মের দ্বারা জীবাত্মার চিন্তা ও শক্তি সকলের বিকাশ করে। বস্তুতঃ উহাই তাহার একমাত্র কাজ। অতএব, মানবাত্মা যদি পুরুষোত্তমের পদ লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে দুইটি জিনিষের প্রয়োজন। দুইটি সর্ত্ত পূর্ণ করিতেই হইবে; তবেই উহা সম্ভব হইতে পারিবে। পার্থিব জীবনে তাহার সমগ্র অন্তর্জ্জীবনকে ঐ আদর্শের দিকে গড়িয়া তোলা চাই; এবং মৃত্যুকালেও তাহার সেই আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে ঐকান্তিক ভাবে ধরিয়া থাকা চাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "যে কেহ অন্তিমকালে আমাকে অনুস্মরণপূর্ব্বক তাহার দেহত্যাগ করিয়া গমন করে, সে আমার ভাব, অর্থাৎ পুরুষোত্তমের ভাব প্রাপ্ত হয়" *। ভগবানের মূল সত্তার সহিত সে মিলিত হয়। তাহাই জীবাত্মার চরম গতি (পরো ভাব)। এইখানেই কর্ম্মের শেষ পরিণতি,—কর্ম্ম এখানে নিজের মধ্যে,

---

* অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৮।৫

আপনার উৎসে ফিরিয়া আসিয়াছে। বিশ্বলীলার মধ্যে আসিয়া জীবাত্মার মূল অধ্যাত্ম প্রকৃতি,—স্বভাব, ঢাকা পড়িয়া যায়, তাহার চৈতন্যের অন্যান্য প্রতিভাসিক ভাবের বিকাশ হয়,—তম্ তম্ ভাবম্। জীবাত্মা যখন এই বিকাশের লীলা অনুসরণ করিয়া তাহার সকল প্রতিভাসিক ভাবের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে, তখন সে তাহার সেই মূল প্রকৃতিতে ফিরিয়া যায়; এবং এইরূপে ফিরিয়া গিয়া তাহার প্রকৃত অধ্যাত্ম সত্তার—আত্মার, সন্ধান পায় এবং শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে (মদ্‌ভাবম্)। এক হিসাবে বলিতে পারা যায় যে, সে তখন ভগবান হয়; কারণ, তাহার প্রতিভাসিক প্রকৃতি ও জীবনের চরম রূপান্তর সাধনের দ্বারা সে ভগবানের প্রকৃতির সহিতই মিলিত হয়।

এখানে গীতা মৃত্যুকালীন মনের ভাব ও চিন্তার উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। গীতা কেন এইরূপ জোর দিয়াছে তাহা বুঝা কঠিন হইবে যদি আমরা চৈতন্যের আত্মসৃজনী শক্তি (self-creative power of consciousness) যাহাকে বলা যাইতে পারে সেই শক্তির পরিচয় না লই। চিন্তা আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা, এবং পূর্ণ ও ঐকান্তিক সঙ্কল্পের সহিত যাহার উপর নিবদ্ধ হয়, আমাদের অভ্যন্তরীণ সত্তারও তাহাতে পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা হয়। এই সম্ভাবনা নিশ্চিত শক্তিতে পরিণত হয় যখন আমরা সেই সকল উচ্চতর অধ্যাত্ম এবং আত্মবিকশিত অনুভূতিতে যাই যেগুলি আমাদের সাধারণ মনস্তত্ত্বের ন্যায় বাহ্য জিনিষের অধীন নহে (এই সাধারণ মনস্তত্ত্ব বাহ্যপ্রকৃতির অধীনতা-পাশে বদ্ধ)। সেখানে আমরা দেখিতে পাই যে, যাহাতে আমাদের মনকে নিবদ্ধ করিয়া রাখি এবং সর্ব্বদা যে দিকে উন্মুখ হইয়া থাকি, আমরা নিশ্চিত-

ভাবে ক্রমশঃ তাহাই হইয়া উঠি। অতএব সেখানে চিন্তার কোন চ্যুতি, স্মৃতির কোন ভ্রংশতা হইলেই ঐ পরিবর্ত্তনের ব্যাঘাত হইবে, অথবা ইহার ক্রিয়ার কিছু অধঃপতন হইবে এবং আমরা যাহা ছিলাম আবার সেই দিকেই ফিরিয়া যাইব,—অন্ততঃ যতক্ষণ না মূলতঃ অনিবর্ত্ত্য ভাবে আমরা আমাদের নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি ততক্ষণ এরূপ অধঃপতনের আশঙ্কা আছে। যখন আমরা ঐরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি, যখন উহা আমাদের সাধারণ অনুভূতি উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে, তখন উহার স্মৃতি আপনা হইতেই থাকে; কারণ তখন উহাই হয় আমাদের চৈতন্যের স্বাভাবিক স্বরূপ। এই মরজীবন ছাড়িয়া যাইবার সন্ধিক্ষণে আমাদের মনের ভাব কিরূপ থাকে তাহার প্রয়োজনীয়তা এখন বুঝা গেল। কিন্তু সমস্ত জীবন মনে না করিয়া কেবল মৃত্যুকালে মনে করিলে, অথবা আমাদের সমস্ত জীবন ধরিয়া যথেষ্টভাবে প্রস্তুত না হইলে শুধু মৃত্যুকালীন অনুস্মরণ আমাদিকে এইরূপ উদ্ধার করিতে পারে না। লৌকিক ধর্ম্ম-সকল মুক্তিলাভের যে-সব সহজ পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাদের সহিত গীতার শিক্ষার সাদৃশ্য নাই। মৃত্যুকালে ধর্ম্মযাজক আসিয়া মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে, সারাজীবন পাপে কাটাইয়াও এইভাবে শেষকালে খ্রীষ্টানোচিত পবিত্র মৃত্যু ("Christian death") হইবে, অথবা পবিত্র কাশীধামে বা গঙ্গাতীরে মরিতে পারিলেই মুক্তিলাভের জন্য আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না—এই সব অজ্ঞান কল্পনার সহিত গীতার শিক্ষা কোথাও মেলে না। যে দিব্য অধ্যাত্মভাবের উপর মনকে দৈহিক মৃত্যুর সময়ে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে,—যম্ স্মরন্ ভাবম্ ত্যজতি অন্তে কলেবরম্,—দৈহিক জীবনেও

প্রতি *মুহূর্ত্তে আত্মাকে অন্তরে সেই ভাবে গড়িয়া উঠিতে হইবে,—সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ *। শ্রীগুরু বলিলেন—"অতএব সকল সময়ে আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর, কারণ যদি তোমার মন ও বুদ্ধি সকল সময়ে আমাতে নিবদ্ধ রাখিতে পার এবং আমাকে অর্পণ করিতে পার,—ময্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ,—তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি আমাতেই আসিবে। যেহেতু সর্ব্বদা যোগ অভ্যাসের দ্বারা অনন্যচিত্ত হইয়া তাঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে লোক দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়" ‡।

এখানে আমরা এই পরম পুরুষের প্রথম বর্ণনা পাইতেছি,—ইনি ভগবান, ইনি অক্ষর অপেক্ষাও মহত্তর ও বৃহত্তর, গীতা পরে ইহাঁকেই পুরুষোত্তম নাম দিয়াছে। তাঁহার কালাতীত অনন্ততায় তিনিও অক্ষর এবং এই সব ব্যক্ত প্রপঞ্চের বহু উপরে; কালের মধ্যে আমরা তাঁহার সত্তার সামান্য আভাস মাত্র পাই নানা বিচিত্র রূপ ও ছদ্মবেশের মধ্য দিয়া (অব্যক্তোহক্ষরঃ)। তথাপি তিনি শুধুই অরূপ অনির্দ্দেশ্য নহেন, অথবা তিনি কেবল এই জন্যই অনির্দ্দেশ্য যে, মানুষের মন যত বেশী সূক্ষ্মতার ধারণা

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৮।৬

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ;
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ং ॥ ৮।৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮।৮

করিতে পারে, তিনি তাহা হইতেও সূক্ষ্ম এবং ভগবানের রূপ আমাদের চিন্তার অতীত,—অণোরণীয়াংসম্ অচিন্ত্যরূপম্ * । এই পরম পুরুষ পরমাত্মাই দ্রষ্টা, অতি পুরাতন। তাঁহার অনন্ত আত্মদৃষ্টি ও জ্ঞানে তিনিই সমগ্র বিশ্বের প্রভু এবং শাস্তা। তিনি তাঁহার সত্তার মধ্যে এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন,—কবিম্ পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ সর্ব্বস্য ধাতারম্। বেদবিদ্গণ যে স্বয়ম্ভূ অক্ষরব্রহ্মের কথা বলেন, এই পরমাত্মাই সেই ব্রহ্ম। যতিগণ তপস্যার দ্বারা মানসিক বিক্ষেপসমূহের উপর উঠিয়া ইহাঁর মধ্যেই প্রবেশ লাভ করেন,—ইহাঁকেই পাইবার জন্য তাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করেন ‡। সেই অনন্ত সদ্বস্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি, স্থান, পদ (অতএব কালের মধ্যে জীবাত্মার যে বিকাশ হইতেছে, সেই বিকাশলীলার ইহাই পরম লক্ষ্য); কিন্তু ইহার মধ্যে কোন বিকাশের খেলা নাই, ইহা এক আদি, সনাতন, পরম অবস্থা বা স্থান,—পরমম্ স্থানম্ আদ্যম্।

কবিং পুরাণমনুশাসিতার
মণোরণীয়াং সমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ—
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৮।৯

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেন প্রবক্ষ্যে ॥ ৮।১১

যোগী অন্তিমকালে মনের যে ভাবে থাকিয়া জীবন হইতে মৃত্যুর ভিতর দিয়া এই পরম দিব্য স্থানে পৌছান, গীতা তাহারই বর্ণনা করিতেছে। অচঞ্চল মন, যোগবলে বলীয়ান্ আত্মা, ভক্তিতে ভগবানের সহিত যোগ (জ্ঞানের দ্বারা নিরাকারের সহিত যোগ থাকে বলিয়া ভক্তিযোগ নিষ্প্রয়োজন হয় না, শেষ পর্য্যন্ত এই ভক্তি পরম যোগশক্তির অঙ্গরূপেই বিদ্যমান থাকে); এবং প্রাণ-শক্তি ভ্রূমধ্যে, দিব্যদৃষ্টির অধিষ্ঠানে সংগৃহীত *। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হয়, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করা হয়, প্রাণশক্তিকে বিক্ষেপ হইতে সংগ্রহ করিয়া মস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়; বুদ্ধি ওম্ এই পবিত্র অক্ষরের উচ্চারণ এবং ইহার ভাব ধারণা করিতে এবং পরম পুরুষকে স্মরণ করিতে একাগ্র হয়, (মামনুস্মরন্) * ‡। ইহাই দেহত্যাগের প্রচলিত যৌগিক পন্থা,—বিশ্বাতীত অনন্তের নিকট সমগ্র শেষ সমর্পণ। তথাপি, ইহা কেবল একটি প্রক্রিয়া মাত্র; মূল প্রয়োজন হইতেছে, জীবনে, এমন কি যুদ্ধ ও কর্ম্মের মধ্যেও, সর্ব্বদা অব্যভিচারী ভাবে ভগবানকে স্মরণ

---

* প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ৮।১০

‡ সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্‌ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ৮।১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ৮।১৩

করা,—মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ—, এবং সমগ্র জীবনযাত্রাকে বিরতিহীন যোগে পরিণত করা (নিত্যযোগ) * । ভগবান বলিলেন, "যে ইহা করে সে অনায়াসে আমাকে লাভ করে; সেই মহাত্মাই পরম্ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ‡ ।

এইরূপে জীব যখন দেহত্যাগ করিয়া যায়, তখন সে যে অবস্থায় পৌছায়, তাহা বিশ্বাতীত (Supracosmic) অবস্থা। বিশ্বপ্রপঞ্চে যে সকল উচ্চতম স্তরের জগৎ রহিয়াছে, সেখান হইতেও পুনর্জন্মে ফিরিয়া আসিতে হয়; কিন্তু যে-জীব পুরুষোত্তমে গমন করিয়াছে সে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে ‡ । অতএব জ্ঞানের দ্বারা অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া যে ফলই পাওয়া যাউক, অন্যতম পূর্ণ উপাসনা জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমের সম্মিলনের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মের অধীশ্বর, সকল মানুষের ও সর্ব্বভূতের সুহৃদ স্বয়ম্ভু ভগবানের উপাসনা করিয়াও সেই ফল পাওয়া যায়। তাঁহাকে এইরূপে জানায় এবং এইভাবে তাঁহার উপাসনা করায় পুনর্জন্মে বা কর্ম্মশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না; মরলোকের অনিত্য দুঃখময় অবস্থা হইতে (দুঃখালয়ম অশাশ্বতম্) চিরন্তন মুক্তিলাভ করিতে জীবের যে আকাঙ্ক্ষা, জীব তাহা পূর্ণ করিতে পারে।

---

* অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ৮।১৪

‡ মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ৮।১৫

‡ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮।১৬

জন্মান্তর-চক্র এবং সেই চক্র হইতে মুক্তিলাভ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা দিবার জন্য গীতা এখানে জগৎচক্রের পরিবর্তন সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে যে মত সুপ্রচলিত ছিল তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। জগৎ যে সময়ে প্রকট থাকে তাহাকে ব্রহ্মার দিবস বলা হয়, জগৎ যে সময়ে অপ্রকট থাকে তাহাকে ব্রহ্মার রজনী বলা হয়। কালের পরিমাণে উভয়েই সমান। ব্রহ্মার কর্ম্ম চলে সহস্রযুগ ধরিয়া, আবার ব্রহ্মার নিদ্রাও সহস্র নীরব যুগ *। দিবসাগমে ব্যক্ত বস্তু সকল অব্যক্তের মধ্য হইতে আবির্ভূত হয়, রাত্রি সমাগমে সকলে অদৃশ্য হয় বা অব্যক্তের মধ্যে লীন হয় †। এইরূপে সর্ব্বভূত অবশভাবে প্রকাশ ও প্রলয়ের চক্রে ঘুরিতেছে; পুনঃ পুনঃ তাহারা দিবসাগমে আবির্ভূত হইতেছে (ভূত্বা ভূত্বা), এবং অবিরত তাহারা রাত্রিসমাগমে অব্যক্তের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে ‡। কিন্তু এই অব্যক্তই ভগবানের দিব্য আদ্য অবস্থা নহে; তাঁহার আর এক অবস্থা (ভাবোঽন্যঃ) আছে, বিশ্বের এই অব্যক্তাবস্থার উপরেও এক বিশ্বাতীত অব্যক্ত, তাহা অনন্তকাল স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহা এই ব্যক্ত বিশ্বের বিপরীত অব্যক্ত নহে কিন্তু ইহার বহু উপরে, ইহা হইতে সম্পূর্ণ

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিংযুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদোজনাঃ॥ ৮।১৭

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ৮।১৮

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ ৮।১৯

বিভিন্ন, অপরিবর্ত্তনীয়, সনাতন,—সর্ব্বভূত বিনষ্ট হইলেও তাহা বিনষ্ট হয় না * । "তাঁহাকেই অব্যক্ত অক্ষর বলা হয়, তাঁহাকেই লোকে পরমাত্মা এবং পরমা গতি বলে। যাহারা তাঁহাতে পৌছায় তাহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না; তাহাই আমার পরম ধাম" ‡ । কারণ, যে জীবাত্মা সেখানে পৌছিয়াছে, সে বিশ্বের প্রকাশ ও প্রলয়চক্র হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

জগৎ-চক্র সম্বন্ধে এই মত আমরা গ্রহণ করি আর না করি, ("অহোরাত্রবিদ্"গণের জ্ঞানের মূল্য আমাদের কাছে কতখানি তাহার উপরেই উহা নির্ভর করে) গীতা ইহাকে যেভাবে ব্যবহার করিয়াছে তাহাই দ্রষ্টব্য। সহজেই ধারণা হইতে পারে, এই যে সনাতন, অব্যক্ত সত্তা, যাহার পরম ভাবের সহিত বিশ্বের অভিব্যক্তি বা লয়ের কোনই সম্বন্ধ নাই বলিয়া মনে হয়, উহাই চির-অনির্দ্দেশ্য, অজ্ঞাত, নিরুপাধিক ব্রহ্ম; এবং উহাতে পৌছিতে হইলে, জীবনলীলায় আমরা যাহা হইয়াছি, সেই সব বর্জ্জন করাই আমাদের পক্ষে প্রকৃত পন্থা। মনের জ্ঞান, হৃদয়ের ভক্তি, যৌগিক ইচ্ছা, জাগ্রত প্রাণশক্তি—এই সব সম্মিলিত ভাবে একাগ্র করিয়া উহার দিকে আমাদের সমগ্র আন্তর চেতনাকে লইয়া যাওয়া ঠিক পথ নহে। বিশেষতঃ যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সকল সম্বন্ধশূন্য, অব্যবহার্য্য, তাহার প্রতি ভক্তি প্রযুজ্য বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু, গীতা

---

* পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ৮।২০

‡ অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৮।২১

জোর দিয়াই বলিয়াছে, যদিও এই অবস্থা বিশ্বাতীত, এবং যদিও ইহা চির-অব্যক্ত, তথাপি "সেই পরম পুরুষকে অনন্ত ভক্তির দ্বারাই লাভ করিতে হইবে, যাঁহার মধ্যে সর্ব্বভূত বিরাজ করিতেছে, যিনি এই সমগ্র জগৎকে বিস্তার করিয়াছেন * ।" অর্থাৎ এই পরম পুরুষ আমাদের মায়ার জগৎ হইতে দূরে অবস্থিত একেবারে সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য ব্রহ্ম নহেন। পরন্তু তিনি স্রষ্টা, স্রগা, এই জগৎ-সমূহের শাস্তা, কবিম্ অনুশাসিতারম্, ধাতারম্। তাঁহাকেই এক এবং সব, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জানিয়া ও ভক্তি করিয়া, সকল বস্তু, সকল ঘটনা, সকল কর্ম্মে তাঁহার সহিত আমাদের সমগ্র চেতনাকে যুক্ত করিয়াই আমাদিগকে পরমা গতি, পূর্ণ সিদ্ধি, চরম মুক্তির সাধনা করিতে হইবে।

তাহার পরই আরও রহস্যময় এক সিদ্ধান্তের বর্ণনা। এইটি গীতা প্রাচীন বৈদান্তিক সাধকগণের (mystics) নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। যোগী যদি পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন্ সময়ে দেহত্যাগ করিতে হইবে, আর যদি পুনর্জ্জন্ম এড়াইতে চান তাহা হইলেই বা তাঁহাকে কোন্ সময়ে দেহত্যাগ করিতে হইবে, তাহারই বর্ণনা ‡। অগ্নি ও জ্যোতিঃ এবং ধূম বা কুহেলিকা, দিবস এবং রাত্রি, শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ, উত্তরায়ন এবং দক্ষিণায়ন—এইগুলি পরস্পর

---

* পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ৮।২২

‡ যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ৮।২৩

বিপরীত। প্রথমগুলিতে দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু দ্বিতীয়গুলির দ্বারা যোগী চান্দ্রমস জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন এবং পরে তাঁহাকে মানবজন্মে ফিরিয়া আসিতে হয় *। এই দুইটিই শুক্ল ও কৃষ্ণমার্গ। উপনিষদে এই দুইটিকে যথাক্রমে দেবযান ও পিতৃযান বলা হইয়াছে। যে যোগী এই দুই মার্গের তত্ত্ব জানেন, তাঁহাকে আর কোন ভ্রমে পতিত হইতে হয় না ⁂। এই তত্ত্বের পশ্চাতে জড়জগৎ ও মনোজগতের সম্বন্ধবিষয়ক যে কোন সত্য বা সঙ্কেত-সূত্রই থাকুক ‡ (এই বিশ্বাস প্রাচীন সাধকদের

---

* অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ৮।২৪
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ৮।২৫
শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ৮।২৬
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তাস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ৮।২৭

‡ যৌগিক অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, এই তত্ত্বের পশ্চাতে জড়জগৎ ও মনোজগতের সম্বন্ধবিষয়ক একটা সত্য রহিয়াছে, যদিও তাহা সর্ব্বত্র খাটে না, যথা—অন্তরে আলোকের শক্তির সহিত অন্ধকারের শক্তির যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে আলোকের শক্তিসমূহ বৎসরের এবং দিনের আলোর সময়ে অধিকতর প্রভাবশালী হয় এবং অন্ধকার শক্তিগুলির প্রভাব অন্ধকার সময়ে বর্দ্ধিত হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত শেষ জয় লাভ না হয়, ততক্ষণ এইরূপ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে।

যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারা প্রত্যেক জড়বস্তুতে মনোজগতের প্রকৃত সঙ্কেত দেখিতেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র ভিতরের সহিত বাহিরের, আলোকের সহিত জ্ঞানের, অগ্নির সহিত তপঃ-শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া ও কতকটা ঐক্যও নির্ণয় করিতেন)—আমাদিগকে কেবল দেখিতে হইবে যে, গীতা এখানে কথাটিকে কি ভাবে ঘুরাইয়া শেষ করিয়াছে, "অতএব সকল সময়ে যোগযুক্ত থাক",—তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন।

ফলতঃ, মূল কথা এই, সমস্ত সত্তাকে ভগবানের সহিত এক করা। এমন সমগ্র ভাবে এবং সর্ব্ব রকমে এক, যেন সর্ব্বদা স্বাভাবিকভাবে যোগযুক্ত হইয়া থাকা যায়। এবং এইরূপে সমগ্র জীবনটিকে, শুধু চিন্তা বা ধ্যানকে নহে, কিন্তু কর্ম্ম, প্রয়াস, যুদ্ধ সবকেই ভগবানের অনুস্মরণে পরিণত করা। "আমাকে স্মরণ কর আর যুদ্ধ কর", ইহার অর্থ অনন্তের নিত্য অনুস্মরণ যেন অনিত্য সংসারের দ্বন্দ্বের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও হারাইয়া না যায়। এবং ইহা খুবই কঠিন, প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ ইহা কেবল তখনই সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় যদি অন্যান্য প্রয়োজনগুলি পূর্ণ করা হয়।—যদি আমরা আমাদের চেতনায় সকলের সহিত এক আত্মা হইয়া থাকি, সকল সময়ে আমাদের মনে থাকে যে, সেই এক আত্মা ভগবান, এবং আমাদের চক্ষু ও আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বত্র ভগবানকে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করে যেন কোন জিনিষকে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বলিয়া কখনও ভুল করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, পরন্তু ঐ বাহ্য রূপের মধ্যে ভগবানকে একই সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ও ব্যক্ত দেখিতে পারি, এবং যদি আমাদের ইচ্ছা ভগবানের ইচ্ছার সহিত চেতনায় এক হয়, এবং

আমাদের ইচ্ছার, মনের, শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়া ঐ ভগবদিচ্ছা হইতেই আসিতেছে বলিয়া অনুভব করি,—উহা ভগবদিচ্ছারই ক্রিয়া, ভগবদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত, অথবা তাহার সহিত একই বলিয়া উপলব্ধি করি, তাহা হইলে গীতা যাহা চাহিতেছে তাহা পূর্ণভাবে সম্পাদন করা যায়। তখন আর ভগবানের অনুস্মরণ মনের একটা সাময়িক ব্যাপার হয় না; পরন্তু তখন উহাই হয় আমাদের জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা এবং একভাবে আমাদের চেতনার সার বস্তু। তখন জীব তাহার স্বাধিকার লাভ করিয়াছে, পুরুষোত্তমের সহিত তাহার সত্য ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ, অধ্যাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে,—তখন আমাদের সমস্ত জীবনই যোগ, ভগবানের সহিত ঐক্য,—সে ঐক্য সিদ্ধ, আবার অনন্তকাল ধরিয়াই তাহা সাধিত হইয়া চলিয়াছে।

গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং

যে সত্যটি এইভাবে ধীরে ধীরে পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রতিপদে অখণ্ড জ্ঞানের এক একটি নূতন দিক ব্যক্ত করিয়াছে এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এক-একটি অধ্যাত্ম ভাব ও কর্ম্ম, তাহার মূল্য ও সার্থকতা এইবার আমরা বুঝিব। সেই-হেতু ভগবান অর্জ্জুনের মনকে জাগ্রত ও একাগ্র করিয়া তুলিবার জন্য, তিনি এখন যাহা বলিতে যাইতেছেন, তাহার গুরু প্রয়োজনীয়তার দিকে প্রথমেই তাহার অবধান আকর্ষণ করিলেন। কারণ, তিনি অর্জ্জুনের মনকে পূর্ণ-ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান ও দৃষ্টির জন্য উন্মুক্ত করিতে এবং একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন; সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধা তাহার জীবনের, কর্ম্মের, লক্ষ্যের যিনি কর্ত্তা ও ভর্ত্তা, মানুষের মধ্যে ও জগতের মধ্যে যিনি ভগবান, তাঁহার সম্বন্ধে সজ্ঞান হইবে, মানুষের মধ্যে বা জগতের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে; কারণ, তাঁহা হইতেই সবের উৎপত্তি, তাঁহার অনন্ত সত্তার মধ্যেই সবার খেলা, তাঁহার ইচ্ছা'র দ্বারাই সব চলিতেছে, বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার দিব্যজ্ঞানের মধ্যেই সবের সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তিনিই সকলের মূল ও সারবস্তু ও চরম লক্ষ্য। অর্জ্জুনকে জানিতে হইবে যে, সে নিজে ভগবানেরই মধ্যে রহিয়াছে এবং অন্তরস্থিত শক্তির দ্বারাই কাজ করিতেছে, তাহার কাজ কেবল ভাগবত কর্ম্মের নিমিত্ত মাত্র, তাহার অহঙ্কৃত চেতনা কেবল একটা আচ্ছাদন,

তাহার মধ্যে ভগবানের যে অমর স্ফুলিঙ্গ ও অংশ রহিয়াছে, তাহাই তাহার অজ্ঞানে বিকৃত হইয়া অহংচেতনা রূপে প্রতিভাত হইতেছে।

তাহার মনে এখনও যদি কোনও সংশয় থাকে, এই বিশ্বরূপ-দর্শনই তাহা দূর করিয়া দিবে, এবং তাহাকে সেই কাজের জন্য শক্তিমান করিয়া তুলিবে, যে-কাজ হইতে সে পশ্চাৎপদ হইয়াছে, সেই কাজের জন্য সে অলঙ্ঘ্য ভাবে নিয়োজিত, তাহার আর ফেরা চলে না,—কারণ ফিরিলে তাহার মধ্যে ভগবানের ইচ্ছা ও আদেশকে অমান্য করা হইবে, ওই আদেশ ইতিপূর্ব্বেই তাহার ব্যক্তিগত চেতনায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বিরাট বিশ্ব-লীলার মধ্যেও যে সে-কর্ম্মের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, শীঘ্রই তাহা প্রকাশিত হইবে। কারণ এখন বিশ্ব-পুরুষ ভগবানেরই দেহরূপে অর্জ্জুনের সম্মুখে দেখা দিবেন, অনন্ত কাল সেই দেহের আত্মা, তিনি তাঁহার মহান্ ভীতি-ব্যঞ্জক স্বরে অর্জ্জুনকে যুদ্ধের সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিবেন। অর্জ্জুন তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইবে আত্মার মুক্তি-সাধন করিতে, এই বিশ্ব-রহস্যের মধ্যে তাহার কর্ম্ম সম্পাদন করিতে, এবং এই দুইটি—মুক্তি-সাধন ও কর্ম্ম—একই সাধনা হইবে। অর্জ্জুনের সম্মুখে আত্মজ্ঞানের উচ্চতর আলোক এবং ভগবান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান যতই বেশী উদ্ঘাটিত হইতেছে, ততই তাহার বুদ্ধির সংশয় সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। কিন্তু কেবল বুদ্ধির সংশয় পরিষ্কার হইলেই চলিবে না; তাহাকে দেখিতে হইবে অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা যাহা তাহার বহির্মুখী মানবীয় দৃষ্টিকে আলোকিত করিবে, যেন সে কর্ম্ম করিতে পারে, সমগ্র সত্তার সম্মতির সহিত, তাহার প্রতি অঙ্গের পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত,

তাহার মধ্যে যে-আত্মা তাহার জীবনের অধীশ্বর আবার সেই আত্মাই বিশ্বের এবং সমগ্র বিশ্বজীবনের অধীশ্বর সেই একই আত্মার প্রতি পূর্ণ ভক্তির সহিত।

ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সে-সব জ্ঞানের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছে, অথবা ইহার প্রথমে প্রয়োজনীয় উপাদান প্রস্তুত করিয়াছে, কিন্তু এখন কাঠামোটির পূর্ণ আকার তাহার উন্মুক্ত দৃষ্টির সম্মুখে ধরা হইবে। ইহার পরে যাহা আসিবে সে-সবও খুবই প্রয়োজনীয়; কারণ, সে-সব এই কাঠামোর অংশ-গুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবে, কোন্‌টার কি মর্ম্ম তাহা বুঝাইয়া দিবে; কিন্তু যে-পুরুষ তাহার সহিত কথা কহিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান মূলতঃ এখনই তাহার চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া ধরা হইবে যেন না দেখা আর তাহার পক্ষে সম্ভব না হয়। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে তাহাকে দেখান হইয়াছে, অজ্ঞান ও অহঙ্কৃত কর্ম্মের গ্রন্থিতে তাহাকে যে অবশ্যম্ভাবী-ভাবে বাঁধা থাকিতেই হইবে তাহা নহে,—এইরূপ কর্ম্মেই সে এতদিন সন্তুষ্ট ছিল, শেষে উহা আর তাহার মনকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই, উহাতে কোনও সমস্যারই পূর্ণ সমাধান নাই, সংসারের কর্ম্মের মধ্যে যে বিরোধী ভাব রহিয়াছে, তাহাতে তাহার মন বিভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কর্ম্মের জালে বদ্ধ হইয়া তাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল, জীবন ও কর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা ব্যতীত কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তির কোন পথই সে দেখিতে পায় নাই। তাহাকে দেখান হইয়াছে যে, কর্ম্ম ও জীবন-যাত্রায় দুইটি বিরোধী পথ আছে, একটি হইতেছে অহংয়ের অজ্ঞানে, অপরটি হইতেছে সত্তার স্পষ্ট আত্মজ্ঞানে। সে কর্ম্ম করিতে

পারে বাসনার সহিত, রিপুর বশে, নীচের প্রকৃতির গুণত্রয়ের দ্বারা তাড়িত "অহং" রূপে, পাপ পুণ্যের সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বের অধীন হইয়া, কর্ম্মের ফল ও পরিণামের চিন্তায়, জয় পরাজয়ের, শুভ ও অশুভের চিন্তায় বিভোর থাকিয়া, জগৎ-চক্রে বদ্ধ হইয়া, কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্ম যে পরিবর্ত্তনশীল বিরোধী ভাবের দ্বারা মানুষের হৃদয়, মন, আত্মাকে বিভ্রান্ত করে, সে সকলের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়া। কিন্তু অজ্ঞানের কর্ম্মেই সে অকাট্য ভাবে বদ্ধ নহে; সে যদি ইচ্ছা করে তবে জ্ঞানের কর্ম্মও করিতে পারে। সংসারে সে কর্ম্ম করিতে পারে উচ্চ ভাবুক রূপে, জিজ্ঞাসু রূপে, যোগী রূপে, প্রথমে মুক্তি-প্রার্থী রূপে এবং পরে মুক্ত-আত্মা রূপে। এই মহান্ সম্ভাবনা উপলব্ধি করা এবং যে-জ্ঞান ও আত্ম-দৃষ্টি কার্য্যতঃ উহা সম্ভব করিবে তাহাতে তাহার বুদ্ধিকে নিবিষ্ট রাখা, ইহাই তাহার দুঃখ ও মোহ হইতে মুক্তি পাইবার, মানব-জীবনের সমস্যা হইতে মুক্তি পাইবার পথ।

আমাদের মধ্যে এক অধ্যাত্ম সত্তা আছে, তাহা শান্ত, কর্ম্মের অতীত, সম, এই বাহিরের কর্ম্মজালে বদ্ধ নহে, কিন্তু উহার ধাতা, উৎপত্তি-স্থল, অন্তর্যামী সাক্ষী রূপে উহাকে পর্য্যবেক্ষণ করে, অথচ উহাতে জড়িত হয় না। উহা অনন্ত, সবকে ভিতরে ধরিয়া রাখিয়াছে, সকলের মধ্যে এক আত্মা, প্রকৃতির সমগ্র কর্ম্মকে নিরপেক্ষ ভাবে অবলোকন করিতেছে এবং দেখিতেছে যে, এ-সব কেবল প্রকৃতির কর্ম্ম, তাহার নিজের কর্ম্ম নহে। উহা দেখে যে, অহং এবং অহংয়ের ইচ্ছা ও বুদ্ধি সবই প্রকৃতির যন্ত্র, এবং ইহাদের সকল কর্ম্মই প্রকৃতির তিন গুণের জটিল ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ সনাতন অধ্যাত্ম সত্তা নিজে ঐ সব হইতে মুক্ত। এই সব

হইতে সে মুক্ত, কারণ তাহার জ্ঞান আছে, সে জানে যে প্রকৃতি এবং অহং এবং এই সকল জীবের ব্যক্তিক সত্তা (the personal being) ইহা লইয়াই অস্তিত্ব নহে। কারণ জগতে অনবরত যে ক্ষর-লীলা চলিতেছে, মহান্ বা তুচ্ছ, চমকপ্রদ বা বিষাদজনক নিখিল পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্য—কেবল ইহাই অস্তিত্বের (existence) সবটুকু নহে। এমন কিছু আছে যাহা সনাতন, অক্ষর, অক্ষয়, কালাতীত স্বয়ম্ভূ সত্তা; প্রকৃতির পরিবর্ত্তনসকল তাহাকে স্পর্শ করে না। উহা সে-সবের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা, কাহাকেও বিচলিত করে ন', নিজেও বিচলিত হয় না, নিজে কোনও কর্ম্ম করে না, কাহারও কর্ম্ম তাহাকে স্পর্শ করে না, সে পুণ্যবানও নহে, পাপীও নহে; কিন্তু নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মহান্ এবং অক্ষত। অহংভাবাপন্ন মানব যাহাতে ব্যথিত বা আকৃষ্ট হয় উহা তাহাতে শোকান্বিত বা হর্ষান্বিত হয় না, উহা কাহারও মিত্রও নহে, কাহারও শত্রুও নহে, কিন্তু সকলের মধ্যে এক সম আত্মা। মানুষ এখন এই আত্মা সম্বন্ধে সচেতন নহে, কারণ সে বহির্মুখী মনের মধ্যে জড়াইয়া রহিয়াছে, সে অন্তরের মধ্যে বাস করিতে শিখিতে চায় না, অথবা শিখে নাই; নিজের কর্ম্ম হইতে নিজেকে সে পৃথক করিয়া ধরে না, সরিয়া দাঁড়ায় না এবং ঐ কর্ম্মকে প্রকৃতির কর্ম্ম বলিয়া দেখে না। অহংই বাধা, মোহচক্রের নাভি। জীবের অন্তরাত্মায় অহংয়ের লয় করাই মুক্তির জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। অধ্যাত্ম সত্তা হওয়া, আর কেবল মন এবং অহং হইয়া না থাকা, ইহাই এই মুক্তি-বাণীর প্রথম কথা।

অর্জ্জুনকে এই জন্য প্রথমেই বলা হইয়াছে তাহার কর্ম্মের সমস্ত ফল-কামনা পরিত্যাগ করিতে এবং যাহাই করিতে হউক

সেই কর্ত্তব্য শুধু নিষ্কাম নিরপেক্ষ কর্ম্মী ভাবে সম্পাদন করিতে,—এই বিশ্বকর্ম্মসমূহের যিনিই ঈশ্বর হউন তাঁহার হস্তে সমস্ত ফলাফল ছাড়িয়া দিতে। কারণ, সে নিজে যে ঈশ্বর নহে তাহা খুবই সুস্পষ্ট। তাহার ব্যক্তিগত অহংয়ের তৃপ্তির জন্য প্রকৃতি আপনার পথে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তাহার বাসনা, তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বিশ্ব-প্রাণ জীবন-লীলা করিতেছে না; তাহার মানসিক মতামত, তাহার সিদ্ধান্ত ও আদর্শ সার্থক করিবার জন্য বিশ্ব-মন কাজ করিতেছে না, তাহার ক্ষুদ্র দরবারে বিশ্ব-মনের জাগতিক লক্ষ্য বা পার্থিব কর্ম্মধারা ও উদ্দেশ্য উপস্থিত করা হয় না। এই সব অধিকারের দাবী কেবল সেই সকল লোকে করে যাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্বের গণ্ডীর মধ্যে বাস করে এবং সেই ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ প্রতিষ্ঠা হইতে সমস্ত জিনিষকে দেখে। প্রথমেই তাহাকে জগতের উপর তাহার অহঙ্কারের দাবী ছাড়িতে হইবে, এবং লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে সে কেবল একজন মাত্র এই ভাবে তাহাকে কাজ করিতে হইবে। যে ফলাফল তাহার দ্বারা নির্ণীত নহে কিন্তু নিখিল কর্ম্ম ও উদ্দেশ্যের দ্বারা নির্ণীত হইতেছে, তাহাতে তাহার নিজের চেষ্টা ও যত্নের অংশটুকু জোগাইতে হইবে। কিন্তু তাহাকে ইহা অপেক্ষা আরও বেশী কিছু করিতে হইবে,—সে যে কর্ত্তা এই অভিমানও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সকল ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া তাহাকে দেখিতে হইবে যে, নিখিল বুদ্ধি, ইচ্ছা, মন, প্রাণই তার মধ্যে এবং অপর সকলের মধ্যে কর্ম্ম করিতেছে। প্রকৃতিই নিখিল কর্ত্তা; তার কর্ম্ম প্রকৃতিরই কর্ম্ম, ঠিক যেমন তার মধ্যে প্রকৃতির কর্ম্মের ফল তার চেয়ে এক মহত্তর শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মহান ফলসমষ্টির অংশমাত্র।

অধ্যাত্মভাবে সে যদি এই দুইটি জিনিষ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার কর্ম্মের জাল ও বন্ধন তাহা হইতে খসিয়া পড়িবে; কারণ, ঐ বন্ধনের সমস্ত গ্রন্থি রহিয়াছে তাহার অহঙ্কারের দাবীতে এবং কর্ত্তৃত্বাভিমানে। রিপুর উদ্বেগ ও পাপ এবং ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ তাহার আত্মা হইতে অদৃশ্য হইবে। তখন তাহা শুদ্ধ, মহান্, শান্ত, সকল লোক ও সকল জিনিষে সমভাবাপন্ন হইয়া অন্তরের মধ্যে বাস করিবে। কর্ম্ম তখন অন্তরের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিবে না, তাহার আত্মার নির্ম্মলতা ও শান্তির উপর কোন দাগ বা চিহ্ন রাখিয়া যাইবে না। তাহার থাকিবে অভ্যন্তরীণ সুখ, বিরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, এবং মুক্ত অক্ষত সত্তার অটুট আনন্দ। ভিতরে বা বাহিরে আর তাহার সেই পুরাতন ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের জের থাকিবে না; কারণ, সে তখন সজ্ঞানে উপলব্ধি করিবে যে, সে সকলের সহিত এক আত্মা,—তাহার বাহ্য প্রকৃতিও নিখিল মন, প্রাণ, ইচ্ছার অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়াই তাহার জ্ঞানে অনুভূত হইবে। তাহার স্বতন্ত্র অহংভাবাপন্ন সত্তা অধ্যাত্ম সত্তার নির্ব্যক্তিক ভাবের মধ্যে গৃহীত ও নির্ব্বাপিত হইবে; তাহার স্বতন্ত্র অহংভাবাপন্ন প্রকৃতি বিশ্ব-প্রকৃতির লীলার সহিত একীভূত হইবে।

কিন্তু, এই মুক্তি নির্ভর করে দুইটি যুগপৎ উপলব্ধির উপরে, —স্পষ্টভাবে আত্মদর্শন এবং স্পষ্টভাবে প্রকৃতি দর্শন। এই দুইটি উপলব্ধির সামঞ্জস্য এখনও হয় নাই। ইহা কেবল বৈজ্ঞানিকের মানসিক বিচারজনিত নিঃসঙ্গতা নহে, জড়বাদী দার্শনিকও, নিজের আত্মা এবং অধ্যাত্ম সত্তার উপলব্ধি না থাকিলেও শুধু প্রকৃতি সম্বন্ধেই কতকটা স্পষ্ট দৃষ্টি লাভ করিয়া এরূপ নিঃসঙ্গ হইতে

পারে। ইহা ভাববাদী জ্ঞানীরও (the idealistic sage) মানসিক বিচারজনিত নিঃসঙ্গতা নহে। এরূপ ব্যক্তি বুদ্ধির আলোক সহায়ে অহংয়ের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং বিক্ষোভকরী রূপগুলি অতিক্রম করিতে পারে। ইহা আরও বড়, আরও জীবন্ত, আরও পূর্ণ আধ্যাত্মিক নিঃসঙ্গতা। প্রকৃতির উপরে, মন-বুদ্ধির উপরে যে পরম সত্তা রহিয়াছে, তাহার দর্শন লাভ করিয়াই এই নিঃসঙ্গতা লাভ করা যায়। কিন্তু, এই নিঃসঙ্গতাও মুক্তির এবং স্পষ্ট জ্ঞানদৃষ্টির কেবল গোড়াকার রহস্য, ইহা দিব্যরহস্যের সমগ্র সূত্র নহে; কারণ, শুধু এইটির দ্বারাই প্রকৃতির ব্যাখ্যা হয় না; এবং অধ্যাত্ম ও নিষ্ক্রিয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সহিত কর্মজীবনের বিরোধ থাকিয়া যায়। দিব্য নিঃসঙ্গতা হইবে দিব্য কর্মেরই ভিত্তি। আগে যেমন অহং-ভাবের বশে প্রকৃতির কার্য্যে যোগ দেওয়া হইত, তাহার পরিবর্ত্তে দিব্য-ভাবে প্রকৃতির কার্য্যে যোগ দিতে হইবে, দিব্য শান্তি দিব্য ক্রিয়াকে, দিব্য গতিকে ধরিয়া থাকিবে। এই সত্য বরাবরই গুরুর মনে ছিল এবং সেই জন্যই তিনি যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতে, পরমপুরুষকেই আমাদের সকল কর্ম্মের ঈশ্বর বলিয়া জানিতে এবং অবতারের ও দিব্য-জন্মের মর্ম্ম বুঝিতে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন; কিন্তু শান্ত মুক্ত ভাবের প্রতিষ্ঠা প্রথমেই প্রয়োজন বলিয়া এই সত্যের উপর এতক্ষণ তেমন জোর দেওয়া হয় নাই। যে-সকল সত্যের দ্বারা আধ্যাত্মিক শান্তি, নিঃসঙ্গতা, সমতা এবং ঐক্য লাভ করা যায়, এক কথায়, অক্ষর আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, এবং তাহাই হওয়া যায় সেই সকল সত্যই পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছে এবং তাহাদের বৃহত্তম শক্তি ও সার্থকতা দেখান হইয়াছে। অন্য যে মহান্ প্রয়োজনীয়

সত্য এই উপলব্ধিকে পূর্ণতর করিবে, সেটিকে কতকটা অস্পষ্ট রাখা হইয়াছে, অল্প আলোকে দেখান হইয়াছে। পুনঃপুনঃ এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেইটিকে পরিস্ফুট করা হয় নাই। এখন ক্রমান্বয়ে এই কয়েকটি অধ্যায়ে সেই সত্যকে দ্রুত পরিস্ফুট করা হইতেছে।

অবতার, গুরু, জীবন-যুদ্ধে মানবাত্মার চির-সারথি শ্রীকৃষ্ণ প্রথম হইতেই নিজের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। তাহাই প্রকৃতির গভীরতম রহস্য। এই উদ্যোগের মধ্যে একটি সুর তিনি সকল সময়েই ধরিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহার সমগ্র সত্যের বৃহত্তম চূড়ান্ত সমন্বয়ের ইঙ্গিত ও ভূমিকাস্বরূপ পুনঃ-পুনঃ তুলিয়াছেন। সেই সুর হইতেছে পরম ভগবানের তত্ত্ব। তিনি মানুষের মধ্যে ও প্রকৃতির মধ্যে বাস করিতেছেন; কিন্তু তিনি মানুষ ও প্রকৃতি হইতে মহত্তর, আত্মার নির্ব্যক্তিক ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহাকে পাইতে হয়। কিন্তু নির্ব্যক্তিক আত্মাই তাঁহার সমগ্র সত্য নহে। পুনঃপুনঃ জোরের সহিত এই সত্যের ইঙ্গিত কেন করা হইয়াছে, এখন আমরা তাহার অর্থ বুঝিতেছি। একই ভগবান যিনি বিশ্বাত্মায়, মানুষে ও প্রকৃতিতে রহিয়াছেন, তিনিই রথোপরি অবস্থিত গুরুর মুখ দিয়া উদ্যোগ করিতেছিলেন যেন, জাগ্রত দ্রষ্টা ও কর্ম্মীর সমগ্র সত্তার উপর তিনি তাঁহার একান্ত দাবী উপস্থিত করিতে পারেন। তিনি বলিতেছিলেন "আমি তোমার অন্তরে রহিয়াছি, আমি এখানে এই মানব শরীরে রহিয়াছি। আমার জন্যই সব কিছুর অস্তিত্ব, সকলে কর্ম্ম করে, চেষ্টা করে। সেই আমিই স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মারও নিগূঢ় সত্য; আবার সেই সঙ্গে বিশ্বলীলারও নিগূঢ় সত্য। এই যে 'আমি'

ইহাই মহত্তর আমি। যত বড় মানব—সত্তাই হউক না কেন, তাহা এই 'আমি'র এক ক্ষুদ্র আংশিক প্রকাশমাত্র;—প্রকৃতি নিজে ইহারই এক নীচের খেলা মাত্র। জীবাত্মার ঈশ্বর, বিশ্বের সকল কর্ম্মের ঈশ্বর, আমিই অদ্বিতীয় জ্যোতিঃ, একমাত্র শক্তি, এক মাত্র সত্তা। তোমার অন্তরে এই ভগবানই গুরু, সবিতা, —সেই জ্ঞানের স্পষ্ট জ্যোতির প্রকাশকর্ত্তা, যাহাতে তুমি তোমার অক্ষর আত্মা এবং তোমার ক্ষর প্রকৃতির প্রভেদ দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু এই জ্যোতিরও উপরে উহার উৎসের দিকে চাহিয়া দেখ; তাহা হইলে তুমি পরম আত্মাকে জানিতে পারিবে, তাহারই মধ্যে ব্যক্তিত্বের ও প্রকৃতির অধ্যাত্ম সত্যকে ফিরিয়া পাইবে। অতএব সর্ব্বভূতের মধ্যে এক আত্মাকে দেখ, যেন এই ভাবে তুমি সর্ব্বভূতের মধ্যে আমাকে দেখিতে পার। সর্ব্বভূতকে এক অধ্যাত্ম আত্মা এবং সত্য বস্তুর মধ্যে দেখ; কারণ, সর্ব্ব-ভূতকে আমার মধ্যে দেখিবার ইহাই পন্থা। সকলের মধ্যে এক ব্রহ্মকে অবগত হও; কারণ, এই ভাবেই তুমি পরম ব্রহ্ম ভগবানকে দেখিতে পাইবে। তোমার নিজের আত্মাকে অবগত হও, নিজের আত্মা হও, যেন এই ভাবে তুমি আমার সহিত যুক্ত হইতে পার,—এই কালাতীত আত্মা আমারই স্পষ্ট জ্যোতি বা স্বচ্ছ আবরণ। ভগবান আমিই আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তার চরম সত্য।"

অর্জ্জুনকে দেখিতে হইবে যে, এই একই ভগবান শুধু আত্মার উচ্চতর সত্য নহেন, পরন্তু প্রকৃতির এবং তাহার নিজের ব্যক্তিত্বেরও উচ্চতর সত্য,—একই সঙ্গে ব্যক্তির এবং বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য। তাঁহারই ইচ্ছা প্রকৃতিতে সর্ব্বব্যাপী, প্রকৃতির কর্ম্ম-সকল তাঁহা হইতেই আসিতেছে। তিনি সেই সকল কর্ম্ম অপেক্ষা

মহত্তর,—প্রকৃতির, কর্ম্ম, মানুষের কর্ম্ম এবং সেই সকল কর্ম্মের ফল সবই তাঁহার। অতএব তাহাকে যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে; কারণ, সেইটিই হইতেছে তাহার কর্ম্মের, সকল কর্ম্মের প্রকৃত সত্য। প্রকৃতিই কর্ম্মী. অহং কর্ম্মী নহে; কিন্তু প্রকৃতি ভগবানের একটা শক্তিমাত্র,—ভগবানই প্রকৃতির সকল কর্ম্মের ও চেষ্টার একমাত্র প্রভু,—বিশ্বযজ্ঞের যুগযুগান্তরের একমাত্র ঈশ্বর। তাহার কর্ম্ম যখন ভগবানের, তখন তাহার মধ্যে ও জগতে যে ভগবান রহিয়াছেন, যাঁহার দ্বারাই প্রকৃতির রহস্যময় দিব্যলীলায় ঐ সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাঁহাকেই তাহার সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিতে হইবে। আত্মার দিব্য জন্মের জন্য, অহংয়ের এবং শরীরের মরত্ব হইতে অধ্যাত্ম ও অনন্তের মধ্যে মুক্তিলাভের জন্য এই দুইটী প্রয়োজন—প্রথমে নিজের কালাতীত অক্ষর আত্মার জ্ঞান ও ইহার ভিতর দিয়া কালাতীত ভগবানের সহিত মিলন। কিন্তু সেই সঙ্গেই এই বিশ্ব-রহস্যের পশ্চাতে যিনি রহিয়াছেন, সর্ব্বভূতের মধ্যে এবং তাহাদের ক্রিয়ার মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধেও জ্ঞান। কেবল এইরূপেই আমরা আমাদের সমস্ত প্রকৃতি ও সত্তাকে সমর্পণ করিয়া সেই একের সহিত জীবন্তভাবে যুক্ত হইবার আশা করিতে পারি, যিনি দেশ কালের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব হইয়াছেন। পূর্ণ আত্মমুক্তির যোগসাধনায় ভক্তির স্থান এইখানেই। অবিনাশী আত্মা বা পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতি এতদুভয় অপেক্ষাও যিনি মহত্তর, তাঁহার ভজনা ও আরাধনাই এই ভক্তি। তখন সকল জ্ঞান হয় ভজনা ও আরাধনা; কিন্তু সকল কর্ম্মও হয় ভজনা ও আরাধনা। এই ভজনাতেই প্রকৃতির কর্ম্ম এবং আত্মার মুক্তি একীভূত হইয়াছে, এবং সেই এক ভগবানের উদ্দেশে এক আত্মোৎসর্গে পরিণত হইয়াছে। চরম মুক্তি, নীচের প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উপরের

অধ্যাত্মভাবের মূলে যাওয়া, ইহা আত্মার নির্ব্বাণ নহে,—কেবল তাহার অহংরূপেরই নির্ব্বাণ হয়। কিন্তু ইহা হইতেছে আমাদের জ্ঞান-ইচ্ছা-প্রেমময় সমগ্র আত্মার পক্ষে ভগবানের বিশ্বসত্তার মধ্যে আর না থাকিয়া, বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে গমন করা,—ইহা ধ্বংস নহে, সিদ্ধি।

অর্জ্জুনের মনের কাছে এই জ্ঞানটি স্পষ্ট করিয়া ধরিবার জন্য আবশ্যক বলিয়া শ্রীগুরু বাকী দুইটি সংশয়ের মূলোচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইলেন,—নির্ব্যক্তিক সত্তা ও মানুষের ব্যক্তিগত সত্তার মধ্যে বিরোধ এবং পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই দুইটি দ্বন্দ্ব থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতির মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে ভাগবত সত্তার অস্তিত্ব অস্পষ্ট, অসঙ্গত, অবিশ্বাস্য থাকিয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, প্রকৃতি গুণসমূহের জড় শৃঙ্খলা, আত্মা এই শৃঙ্খলের অধীন অহঙ্কৃত সত্তা। কিন্তু ইহাই যদি তাহাদের সমস্ত সত্য হয়, তাহা হইলে তাহারা ভাগবত সত্তা নহে, হইতেই পারে না। জড় অজ্ঞান প্রকৃতি ভগবানের শক্তি হইতে পারে না; কারণ, ভগবানের শক্তি হইবে কর্ম্মে স্বাধীন, মূলে আধ্যাত্মিক, মহত্ত্বে আধ্যাত্মিক। প্রকৃতিতে বদ্ধ অহঙ্কৃত আত্মা, কেবল মনোময় প্রাণময়, দেহময় আত্মা, কখনই ভগবানের অংশ এবং নিজে ভাগবত সত্তা হইতে পারে না; কারণ যাহা এইরূপ ভাগবত সত্তা হইবে, তাহা হইবে স্বরূপে ভগবানেরই ন্যায় মুক্ত, অধ্যাত্ম, আত্মবিকাশশীল, স্বপ্রতিষ্ঠ,—তাহা হইবে মন, প্রাণ, দেহের উর্দ্ধে। এই দুই সংশয় এবং তাহারা যে-অজ্ঞানের সৃষ্টি করে সে-সব অপসৃত হয় সত্যের একটি মাত্র উজ্জ্বল দীপ্ত রশ্মির দ্বারা। জড়প্রকৃতি কেবল একটা নীচের সত্য; নীচের প্রতিভাসিক ক্রিয়াই জড়-

প্রকৃতি নামে অভিহিত। উপরের এক প্রকৃতি আছে, তাহা অধ্যাত্ম প্রকৃতি এবং তাহাই আমাদের অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, আমাদের সত্য ব্যক্তিসত্তা। ভগবান একই সঙ্গে নির্ব্যক্তিক (impersonal) অবার ব্যক্তিক (personal)। আমাদের মনের অনুভূতিতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার নির্ব্যক্তিক ভাব কালের অতীত অনন্ত সদ্‌স্বরূপ চিদ্‌স্বরূপ, অস্তিত্বোপলব্ধির আনন্দস্বরূপ ; তাঁহার ব্যক্তিক ভাব দেখা যায় সত্তার সচেতন শক্তিরূপে, জ্ঞানের, ইচ্ছার এবং বহুধা আত্মপ্রকাশের আনন্দের সচেতন কেন্দ্ররূপে। মূল অক্ষর সত্তায় আমরাও সেই একই নির্ব্যক্তিক ; আমাদের অধ্যাত্ম-ব্যক্তিস্বরূপে আমরা প্রত্যেকেই সেই মূল শক্তির বহুধা রূপ। কিন্তু এই যে প্রভেদ, ইহা কেবল আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনের জন্য। দিব্য নির্ব্যক্তিক সত্তাকে ছাড়াইয়া যাইলে দেখা যায় যে, উহাই আবার অনন্ত পুরুষ, পরমাত্মা। উহাই মহান্ অহম্—সোঽহম্, আমিই সেই,—যাঁহা হইতে সমস্ত ব্যক্তিক সত্তা ও প্রকৃতি আবির্ভূত হয় এবং নির্ব্যক্তিকভাবে প্রতীয়মান এই যে জগৎ, ইহার মধ্যে বিচিত্ররূপে লীলা করে। যাহা কিছু রহিয়াছে সবই ব্রহ্ম,—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ইহাই উপনিষদের কথা, কারণ ব্রহ্ম এক আত্মা, নিজেকে ক্রমান্বয়ে চৈতন্যের চারি স্তরে দেখিতেছেন। বাসুদেব অনন্ত পুরুষই সব, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, ইহাই গীতার কথা। তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার ঊর্দ্ধের অধ্যাত্ম প্রকৃতি হইতে তিনি সজ্ঞানে সমস্ত উৎপাদন করিতেছেন, ধরিয়া রাখিয়াছেন। এখানে বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের বাহ্যদৃশ্য লইয়া যে অপরা প্রকৃতি, তাহার মধ্যে সকল বস্তু তিনিই সজ্ঞানে হইয়াছেন। অনন্তের সেই অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে তিনিই জীব, জীব তাঁহার সনাতন বহুরূপ, সচেতন আত্মশক্তির বহু কেন্দ্র হইতে তাঁহারই

আত্মদর্শন। ভগবান, প্রকৃতি, জীব— এই তিন লইয়াই বিশ্বলীলা এবং এই তিনই এক সত্তা।

এই সত্তা নিজেকে বিশ্বের মাঝে কেমন করিয়া প্রকাশ করে? প্রথমতঃ অক্ষর কালাতীত আত্মা রূপে,—তাহা সর্ব্বব্যাপী, সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার অনন্ততায় তাহা শুধু সত্তা, তাহাতে কোন বিকাশ বা লীলা নাই। তার পর, সেই সত্তায় বিধৃত রহিয়াছে এক মূল শক্তি বা আত্মবিকাশের অধ্যাত্ম ধারা,—স্বভাব। তাহার ভিতর দিয়াই অধ্যাত্ম আত্মদৃষ্টির দ্বারা এই সত্তা সঙ্কল্প করে, বিকাশ করে,—ইহার মধ্যে যাহা কিছু অপ্রকাশিত রহিয়াছে, নিহিত রহিয়াছে, সেই সকলকে মুক্ত করিয়া দিয়া সৃষ্টি করে। এই ভাবে আত্মায় যাহা কিছু সঙ্কল্পিত হয়, সেই আত্মবিকাশের শক্তি বা তেজ বিশ্বের মাঝে সেই সবকে কর্ম্মরূপে বিসৃষ্ট করে। সকল সৃষ্টিই এই ক্রিয়া, মূল প্রকৃতির লীলা, কর্ম্ম। কিন্তু এই সংসারে উহা পরিণত হইয়া উঠিতেছে অপরা প্রকৃতির মধ্যে,—বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূল ভূতের বাহ্য রূপের মধ্যে। তাহা পূর্ণ আলোক হইতে বস্তুতঃ বিচ্ছিন্ন, এবং অজ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। সেখানে তাহার সকল ক্রিয়াই হয় প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যে পরমাত্মা রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশে প্রকৃতিস্থ জীবাত্মার যজ্ঞ। অতএব পরম ভগবান সকলের মধ্যেই তাহাদের যজ্ঞের অধীশ্বর রূপে, অধিযজ্ঞ রূপে বিরাজিত। তাঁহার সান্নিধ্যে, তাঁহার শক্তিতেই সেই যজ্ঞ নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁহার আত্মজ্ঞানে এবং আত্মসত্তার আনন্দে তাহা গৃহীত হয়। ইহা জানিলেই বিশ্ব সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা হয়, জগৎ-মাঝে ভগবানকে দর্শন করা হয় এবং

অজ্ঞান মায়া হইতে মুক্ত হইবার দ্বার খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কারণ, এই জ্ঞান যখন কার্য্যতঃ সত্যে পরিণত হয়, মানুষ তাহার কর্ম্ম এবং তাহার সমস্ত চেতনাকে সর্ব্বভূতস্থিত ভগবানে অর্পণ করে। তখন সেই জ্ঞানের দ্বারা সে তাহার অধ্যাত্ম সত্তায় ফিরিয়া যাইতে সক্ষম হয় এবং ইহার ভিতর দিয়া এই অপরা ক্ষর প্রকৃতির উপরে অনন্ত ও ভাস্বর যে বিশ্বাতীত সত্য বস্তু রহিয়াছে, তাহাতে পৌঁছিতে সমর্থ হয়।

আমাদের মূল সত্তার এই যে নিগূঢ় সত্য, আমাদের অভ্যন্তরীণ জীবন ও বাহ্যকর্ম্ম বিকাশে কেমন করিয়া ইহা পূর্ণভাবে প্রযোগ করা যায়, গীতা এখন তাহাই দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছে। গীতা এখন যাহা বলিতেছে তাহা সকল রহস্যের গুহ্যতম রহস্য *। ইহাই ভগবান সম্বন্ধে সেই সমগ্র জ্ঞান,—সমগ্রম্ মাম্,—অর্জ্জুনকে যাহা দিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাই সমস্ত তত্ত্বের পূর্ণ বিজ্ঞানসহ মূল জ্ঞান, যাহা জানিলে আর জানিতে কিছু বাকী থাকে না। যে অজ্ঞান তাহার মানবীয় মনকে বিমূঢ় করিয়াছে, এবং তাহার ভগবদ্‌নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে তাহার

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥২
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩
গীতা, নবম অধ্যায়।

ইচ্ছাকে বিমুখ করিয়াছে, সেই অজ্ঞানের গ্রন্থি ইহার দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে ছেদিত হইবে। ইহাই সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, সকল রহস্যের শ্রেষ্ঠ রহস্য, রাজ-বিদ্যা, রাজগুহ্য। ইহা শুদ্ধ এবং উত্তম জ্যোতি। প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম উপলব্ধির দ্বারা মানুষ ইহার প্রমাণ পায়, নিজের মধ্যেই সত্য বলিয়া দেখিতে পারে। ইহাই প্রকৃত সত্যধর্ম্ম, জীবনের মূল নীতি। মানুষ যখন ইহাকে ধরিতে পারে, দেখিতে পারে এবং শ্রদ্ধার সহিত এই অনুসারে জীবনকে গঠিত করিতে চায়, তখন ইহার অনুসরণ করা সহজ হয়।

কিন্তু শ্রদ্ধা চাই। শ্রদ্ধা যদি না থাকে, মানুষ যদি তর্ক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে সেই উচ্চতর জ্ঞানকে জীবনে সত্য করিয়া তোলা সম্ভব হয় না। তর্কবুদ্ধি বাহ্য ব্যাপারের অনুগমন করে, অধ্যাত্মদৃষ্টিলব্ধ জ্ঞানকে সন্দেহের সহিত যাচাই করিয়া দেখিতে চায় কারণ তাহা দৃশ্য প্রকৃতির দ্বন্দ্ব ও অপূর্ণতা সমূহের সহিত মিলে না,—মনে হয়, তাহা এই দ্বন্দ্বময় প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতেছে,—এমন কথা বলিতেছে, যাহা আমাদিগকে আমাদের বর্ত্তমান জীবনের প্রত্যক্ষ শোক, দুঃখ, অমঙ্গল, দোষ, ভ্রান্তি ও অক্ষমতা হইতে, অশুভ হইতে উপরে লইতে চায়। যে-জীব সেই উপরের সত্য ও ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, তাহাকে মৃত্যু, ভ্রান্তি, অশুভের অধীন সাধারণ মরজীবনের পথে ফিরিতেই হইবে। যে-ভাগবত সত্তাকে সে অস্বীকার করে, তাহাতে গড়িয়া উঠা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ এই যে সত্য, জীবনের মাঝে ইহাকে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে, ইহারই অনুসরণে জীবনকে গঠিত ও পরিচালিত

করিতে হইবে,—আত্মার ক্রমবর্দ্ধনশীল জ্যোতিতে অনুসরণ করিতে হইবে,—মনের অন্ধকারে তর্কবুদ্ধির সহায়ে নহে। মানুষকে এই সত্যে গড়িয়া উঠিতে হইবে, এই সত্য হইতে হইবে,—ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার ইহাই এক মাত্র উপায়। নীচের সত্তাকে অতিক্রম করিয়াই মানুষ প্রকৃত দিব্যসত্তা হইতে পারে এবং আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের সত্যকে জীবনের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। সত্য বলিয়া যাহা কিছু ইহার বিরুদ্ধে উত্থাপন করা যায়—সে সমস্তই নীচের প্রকৃতির বাহ্যিক সত্য। নীচের প্রকৃতির অপূর্ণতা ও অমঙ্গল হইতে, "অশুভ" হইতে, মুক্তিলাভ করা যায় কেবল এক উর্দ্ধের জ্ঞানকে স্বীকার করিয়া,—যেখানে ঐ সকল বাহ্যিক অশুভ শেষ পর্য্যন্ত মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, আমাদেরই অজ্ঞানের সৃষ্টি বলিয়া প্রদর্শিত হয়। কিন্তু এই ভাবে দিব্য প্রকৃতির মুক্তিতে গড়িয়া উঠিতে হইলে আমাদের বর্ত্তমান বদ্ধ প্রকৃতিতে প্রচ্ছন্নভাবে যে ভাগবত সত্তা রহিয়াছেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই ইহবে। কারণ, এই যোগাভ্যাস সম্ভব ও সহজ কেবল এই জন্যই হয় যে, আমরা স্বভাবতঃ যাহা, সে সমুদায়ের ক্রিয়াকে এই সাধনায় সেই অভ্যন্তরীণ দিব্যপুরুষের হস্তে আমরা সমর্পণ করিয়া দিই। ভগবানই আমাদের মধ্যে দিব্য জন্মের বিকাশ করিয়া দেন ক্রমবর্দ্ধনশীলভাবে, সহজভাবে, অব্যর্থভাবে, আমাদের সত্তাকে তাঁহারই সত্তার মধ্যে তুলিয়া লইয়া এবং ইহাকে তাঁহারই জ্ঞানে ও শক্তিতে পূর্ণ করিয়া দিয়া,—জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা,—তিনি তাঁহার কল্যাণ হস্তের স্পর্শে আমাদের মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞান প্রকৃতিকে তাঁহারই নিজের জ্যোতিঃ ও বিশালতায় রূপান্তরিত করিয়া লন। আমরা পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত এবং অহংভাবশূন্য হইয়া যাহাতে

বিশ্বাস করি এবং ভগবদ্‌প্রেরণায় যাহা হইতে চাই, অন্তরস্থিত ভগবান তাহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিয়া দিবেন। কিন্তু এখন যে অহংভাবময় মন ও প্রাণ আমাদের প্রকৃত সত্তা বলিয়া অনুমিত হইতেছে, প্রথমেই প্রয়োজন যে সেইটি আমাদের অন্তরস্থিত গুহ্য ভগবানের হস্তে নিজেকে রূপান্তরের জন্য একান্তভাবে সমর্পণ করে।

দিব্য সত্য ও পন্থা

গীতা অতঃপর সেই চরম ও পূর্ণ রহস্য, সেই এক তত্ত্ব ও সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে চলিয়াছে,—সিদ্ধি ও মুক্তির প্রার্থীকে যাহাতে বাস করিতে শিখিতে হইবে, সেই এক ধর্ম্মকে অনুসরণ করিয়াই তাহার অধ্যাত্ম অঙ্গসমূহের এবং তাহাদের সকল প্রক্রিয়ার পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে হইবে। এই চরম সত্য হইতেছে বিশ্বাতীত ভগবানের রহস্য,—তিনিই সব এবং সর্ব্বত্র বিরাজিত; অথচ বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল রূপ অপেক্ষা তিনি এত মহত্তর ও বিভিন্ন যে, এখানে কোন কিছুর মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ নহেন, কোন কিছুই বস্তুতঃ তাঁহাকে প্রকট করিতে পারে না,—দেশ ও কালের মধ্যে যে-সব বস্তু আবির্ভূত হইয়াছে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে-সম্বন্ধ, এই সকল বুঝাইতে যে-ভাষা প্রয়োগ করা হয় তাহা তাঁহার অচিন্ত্য সত্তার স্বরূপ ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে। অতএব আমাদের সিদ্ধিলাভের নীতি হইতেছে আমাদের সমগ্র প্রকৃতি দিয়া ভজনা এবং ইহার মূল অধিকারীর নিকট আত্মসমর্পণ। সব শেষে আমাদের এক পথ হইতেছে, এই সংসারে আমাদের সমগ্র জীবনকে (শুধু ইহার কোন এক অংশকেই নহে) অনন্তের দিকে একাগ্র ভাবে প্রবাহিত করা। এক দিব্য যোগের শক্তি ও রহস্যের দ্বারা আমরা তাঁহার অনির্ব্বচনীয় নিগূঢ় সত্তার মধ্য হইতে এই প্রতিভাসিক জগতের সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে আসিয়াছি। সেই যোগেরই এক বিপরীত প্রক্রিয়ার দ্বারা আমাদিগকে প্রতিভাসিক প্রকৃতির সকল সীমা অতিক্রম করিতে হইবে, এবং সেই মহত্তর চেতনাকে ফিরিয়া

পাইতে হইবে, যাহার দ্বারা আমরা ভগবানের মধ্যে, অনন্তের মধ্যে, বাস করিতে পারিব।

ভগবানের যে শ্রেষ্ঠতম সত্তা তাহা অব্যক্ত—কখনও প্রকাশিত হয় না। তাঁহার যে সত্য শাশ্বত মূর্ত্তি তাহা জড়ের মধ্যে ব্যক্ত হয় না, প্রাণও তাহাকে ধরিতে পারে না, মনও তাহাকে চিন্তা করিতে পারে না,—অচিন্ত্যরূপ, অব্যক্তমূর্ত্তি *। আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা কেবল ভগবানের আত্মসৃষ্ট রূপ,—তাঁহার শাশ্বত রূপ, স্বরূপ নহে। এমন একজন আছেন, অথবা এমন এক সত্তা আছে, যাহা বিশ্ব হইতে ভিন্ন, অপ্রকাশ্য, অচিন্ত্য, এক অনির্ব্বচনীয় অনন্ত ভাগবত সত্তা,—অনন্ত সম্বন্ধে আমরা যতই বিরাট বা যতই সূক্ষ্ম ধারণা করি না কেন, সেই সত্তা সে ধারণার বহু ঊর্দ্ধে। এই যে-সকল জিনিষের সমবায়কে আমরা বিশ্বজগৎ বলিয়া অভিহিত করি, এই যে-সব বিরাট গতিশীলতার সমষ্টি যাহার কোনও সীমানা আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি না এবং যাহার বিভিন্ন রূপ ও প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা কোনও স্থায়ী বস্তু খুঁজিয়া পাই না, দাঁড়াইয়া ধরিবার মত কোন স্থান, স্থর বা কেন্দ্র খুঁজিয়া পাই না—সে-সব এই ঊর্দ্ধতন অনন্ত সত্তা কর্ত্তৃক প্রকট হইয়াছে, নির্ম্মিত হইয়াছে, এই অনির্ব্বচনীয়, বিশ্বাতীত রহস্যের উপরে সে সব বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। এক আত্ম-অভিব্যক্তির উপরে এই সব বিধৃত রহিয়াছে, তাহা নিজে অব্যক্ত, অচিন্ত্য। এই যে সব সৃষ্টি অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, চলিতেছে, এই সব জীব, সব ভূত, সব জিনিষ, সব জীবন্ত মূর্ত্তি,—ইহারা সকলে মিলিয়া অথবা স্বতন্ত্র ভাবে তাঁহাকে ধারণ করিতে

---

* ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ গীতা ৯।৪

পারে না। তিনি তাহাদের মধ্যে নাই, তাহাদের মধ্যে, তাহাদের দ্বারা তাঁহার জীবন ও কর্ম্মের লীলা চলিতেছে না,—ভগবান এই ভূতজগৎ নহেন। তাহারাই তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, তাহাদেরই জীবন ও কর্ম্মের লীলা তাঁহার মধ্যে চলিতেছে, তাঁহা হইতেই তাহাদের সত্য উদ্ভূত ; তাহারা তাঁহার ভূত (becomings), তিনি তাঁহাদের মূল সত্তা (being), মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ। অন্তহীন দেশ ও কালের মধ্যে এই যে সীমাহীন জগৎ, ভগবান তাঁহার সত্তার অচিন্ত্য দেশকালাতীত অনন্তের মধ্যে ইহাকে এক ক্ষুদ্র ব্যাপার রূপে বিস্তৃত করিয়াছেন।

সব তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, ইহা বলিলেও আবার এ বিষয়ের সমস্ত সত্যটা বলা হয় না, প্রকৃত সম্বন্ধটা সমগ্র ভাবে বলা হয় না ; কারণ, এরূপ বলিলে ভগবানের উপর দেশ-বাচক ভাব আরোপ করা হয়। কিন্তু ভগবান দেশ ও কালের অতীত ‡। দেশ ও কাল, অনুস্যূতি (immanence) ও ব্যাপ্তি (pervasion) ও অতিক্রান্তি (exceeding)—এ-সব তাঁহার চৈতন্যের খেলা। তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তির এক যোগ আছে,—মে যোগঃ ঐশ্বরঃ—সেই যোগের দ্বারা পরম ভগবান তাঁহার আপনার অনন্ত আত্মরূপায়ণের মধ্যে নিজের নানা নামরূপের প্রকাশ করেন, সে আত্মরূপায়ণ জড় নহে, অধ্যাত্ম,— জড়জগৎ সেই আত্মরূপায়ণের কেবল বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি মাত্র। তাহার সহিত তিনি নিজেকে এক করিয়া দেখেন, তাহার সহিত এবং তাহার মধ্যে যাহা কিছু আশ্রয় পাইয়াছে, সেই সকলের সহিত ভগবান

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৯। ৫

একীভূত হন। এই অনন্ত আত্মদর্শন তাঁহার সমগ্র আত্মদর্শন নহে (pantheist মতানুসারে ভগবানের সহিত বিশ্বকে যে এক বলা হয় তাহা ইহা অপেক্ষা আরও সঙ্কীর্ণ)। এই আত্মদর্শনে তিনি যাহা কিছু আছে সবের সহিত এক, আবার সেই সঙ্গেই তিনি সেই সবের অতীত, কিন্তু এই যে আত্মা বা অধ্যাত্মসত্তার বিস্তৃত অনন্ততা যাহা বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াও বিশ্বের অতীত, ভগবান ইহা হইতেও অন্য। তাঁহার বিশ্বচেতন অনন্ত সত্তার মধ্যে এখানে সব কিছুই রহিয়াছে, কিন্তু আবার সেইটিকেও ভগবানের বিশ্বাতীত সত্তা আত্মচেতনার এক সৃষ্টিরূপে ধরিয়া রহিয়াছে,—আমরা বিশ্ব বা সত্তা বা চেতনা বলিতে যাহা বুঝি, ভগবানের সেই বিশ্বাতীত সত্তা সে সকলেরই উপরে। ইহাই ভগবানের সত্তার নিগূঢ় রহস্য যে, তিনি বিশ্বাতীত, অথচ তিনি একেবারেই যে বিশ্বের বাহিরে তাহাও নহে। কারণ এই সবের আত্মারূপে তিনি সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন। ভগবানের এক ভাস্বর মুক্ত আত্মসত্তা,—মম আত্মা—সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে, সর্ব্বভূতের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ, তিনি কেবল আছেন বলিয়াই সকলে বিশ্বলীলায় আবির্ভূত হইতেছে,—ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ। এই জন্যই আমরা দুইটি তত্ত্ব পাইতেছি, সৎ (being) ও সৃষ্টি (becoming), স্বপ্রতিষ্ঠিত আত্মা এবং ইহার উপরে প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বভূত, ভূতানি, ক্ষর সত্তা এবং অক্ষর সত্তা। কিন্তু এই যুগল তত্ত্বের উচ্চতম সত্য এবং তাহাদের মধ্যে বিরোধের সমন্বয় কেবল সেইখানেই পাওয়া যাইতে পারে যাহা এই বিরোধের অতীত, তাহা পরম ভগবান, তিনি তাঁহার যোগমায়ার (অর্থাৎ অধ্যাত্মচেতনার শক্তির) দ্বারা আধার আত্মা এবং আধেয় সর্ব্বভূত এতদুভয়কেই প্রকট করিতেছেন। আমাদের অধ্যাত্মচেতনায়

তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়াই আমরা তাঁহার সত্তার সহিত আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধের সন্ধান পাইতে পারি।

দার্শনিকের ভাষায় গীতার এই শ্লোকগুলির ইহাই অর্থ; কিন্তু তাহাদের ভিত্তি মানসিক যুক্তিতর্কের উপর নহে, পরন্তু অধ্যাত্ম উপলব্ধির উপরে। তাহারা সমন্বয় সাধন করে কারণ অধ্যাত্মচেতনার কতকগুলি সত্য হইতে তাহারা অখণ্ডভাবে উঠিয়াছে। জগতে গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে যে পরম বা বিশ্বব্যাপী সত্তাই থাকুক আমরা যখন তাহার সহিত নিজেদের সচেতন সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করি, তখন বহুপ্রকারের বিভিন্ন উপলব্ধি আমরা পাই, এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকের বুদ্ধি এই বিচিত্র উপলব্ধির কোন একটি বিশেষ দিককে লইয়া জগতের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণায় উপনীত হয়। প্রথমেই আমরা এক ভাগবত সত্তার অস্পষ্ট উপলব্ধি পাই,—তিনি আমাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও মহত্তর, আমরা যে জগতে বাস করিতেছি তাহা হইতেও তিনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও মহত্তর—কেবল এইটুকুই, আর বেশী কিছু উপলব্ধি হয় না যতক্ষণ আমরা আমাদের বাহিরের সত্তার মধ্যে বাস করি এবং আমাদের চতুর্দ্দিকে জগতের প্রতিভাসিক (phenomenal) রূপটাই নিরীক্ষণ করি। কারণ পরম ভগবানের যে পরম সত্য তাহা বিশ্বাতীত, এবং যাহা কিছু বাহিরের, প্রতিভাসিক, মনে হয় সে-সব স্ব-চেতন আত্মার আনন্ত হইতে ভিন্ন, মনে হয় তাহা এক নীচের সত্যের প্রতিচ্ছবি, হয় ত বা একেবারেই মিথ্যা ভ্রম, মায়া। যতক্ষণ আমরা এই ভেদজ্ঞান লইয়া চলি, ততক্ষণ মনে হয় যে, ভগবান বিশ্বের বাহিরে অবস্থিত। তিনি তাই, শুধু এই অর্থে যে, যেহেতু তিনি বিশ্বাতীত সেইহেতু তিনি বিশ্বের মধ্যে এবং বিশ্বের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ

নহেন, কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, এ সব তাঁহার সত্তার বাহিরে ; কারণ সেই এক অনন্ত ও সত্য বস্তুর বাহিরে কিছুই নাই। ভগবান সম্বন্ধে এই প্রথম সত্য আমরা অধ্যাত্মভাবে উপলব্ধি করি যখন আমাদের অনুভূতি হয় যে, আমরা কেবল তাঁহার মধ্যেই বাস করিতেছি, তাঁহার মধ্যেই ঘুরিতেছি, ফিরিতেছি—তাঁহা হইতে আমরা যতই বিভিন্ন হই না কেন, আমাদের অস্তিত্বের জন্য আমরা তাঁহারই উপরে নির্ভর করি—এবং এই বিশ্বজগৎও আত্মারই কেবল একটা প্রকাশ ও লীলা।

কিন্তু আবার ইহা ছাড়াও আরও উপরের অনুভূতি আমরা পাই যে, আমাদের যে আত্মসত্তা তাহা তাঁহার আত্মসত্তার সহিত এক। সর্ব্বভূতের এক আত্মা আমরা উপলব্ধি ক'র এবং সে সম্বন্ধে আমরা চেতনা ও দৃষ্টিলাভ করি। তখন আর আমরা বলিতে পারি না বা ভাবিতে পারি না যে, আমরা তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; কিন্তু বুঝি যে, স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার আছে আত্মা (Self) এবং বহিঃপ্রকাশ (Phenomenon) ; আত্মাতে সকলেই এক, কিন্তু বহিঃপ্রকাশে সকলেই বিভিন্ন। কেবলমাত্র আত্মার সহিত একান্ত আবেগে যোগ সাধনা করিলে আমাদের এমনও অনুভূতি হইতে পারে যে, ব'হঃপ্রকাশটা কেবল একটা স্বপ্নবৎ, অসত্য। কিন্তু আবার দুই দিকেই সমান আবেগ হইলে আমরা একই সঙ্গে দুই রকম অনুভূতি পাইতে পারি, আত্মসত্তায় তাঁহার সহিত এক পরম ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারি, অথচ উপলব্ধি হইতে পারে যে, আমরা তাঁহার সঙ্গে বাস করিতেছি, তাঁহার সহিত নানা ভাবে নিত্য সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া রহিয়াছি, প্রকৃত পক্ষে আমরা তাঁহার সত্তা হইতেই উৎপন্ন। এই বিশ্বজগৎ এবং বিশ্বজগতে আমাদের অস্তিত্ব এ-সবই আমাদের কাছে হয় ভগবানের স্ব-চেতন

সত্তার এক নিত্য ও সত্য রূপ। এই অপেক্ষাকৃত নীচের সত্যে আমরা পাই তাঁহার সহিত পার্থক্যের সম্বন্ধ,—অনন্তের অন্য সমস্ত চেতন বা অচেতন শক্তির সহিত আমাদের পার্থক্যের সম্বন্ধ, বিশ্ব-প্রকৃতিতে তাঁহার যে বিশ্ব-আত্মা রহিয়াছে তাহার সহিত আমাদের ব্যবহারের সম্বন্ধ। এই সকল সম্বন্ধ বিশ্বাতীত সত্য হইতে বিভিন্ন, তাহারা আত্মার চেতনার একটা শক্তির নীচের সৃষ্টি, এবং যেহেতু তাহারা বিভিন্ন এবং যেহেতু তাহারা সৃষ্ট সেইহেতু একমাত্র বিশ্বাতীত পরম বস্তুর উপাসকগণ এ সকলকে আংশিক বা সর্ব্বৈব ভাবেই মিথ্যা, মায়া বলিয়াই ঘোষণা করেন। অথচ এ-সকল তাঁহা হইতেই আসিয়াছে, তাঁহারই সত্তা হইতে উৎপন্ন রূপ—মিথ্যা শূন্য হইতে তাহারা সৃষ্ট হয় নাই। কারণ আত্মা সর্ব্বত্র যাহা দেখিতেছে সে সবই সে নিজে এবং তাহার নিজের রূপ, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কিছুই নহে। আর ইহাও আমরা বলিতে পারি না যে, এই সকল সম্বন্ধের অনুরূপ কিছুই বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে নাই। আমরা বলিতে পারি না যে, সেই মূল হইতে উৎপন্ন চৈতন্যশক্তির দ্বারা তাহারা সৃষ্ট অথচ সেই মূলে এমন কিছুই নাই যাহাতে তাহাদের ভিত্তি ও সার্থকতা, এমন কিছুই নাই যাহা তাঁহার সত্তার এই সকল রূপের সনাতন সত্য এবং উপরের স্বরূপ।

আবার অন্য এক দিকে যদি আমরা আত্মা ও আত্মার রূপ সমূহ এতদুভয়ের পার্থক্যের উপরে জোর দিই, আমাদের উপলব্ধি হইতে পারে যে, আত্মা সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে,—সকলের মধ্যে অনুস্যূত। আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, আত্মা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তথাপি আত্মার রূপসমূহ, যে-সব আকারের মধ্যে আত্মা বিরাজমান, সে-সব যে আমাদের কাছে আত্মা হইতে বিভিন্ন বলিয়াই প্রতিভাত হইতে পারে, অনিত্যরূপ বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে, শুধু তাহাই নহে, সে-সব একেবারে অসত্য

ছায়ামাত্র বলিয়াই মনে হইতে পারে। একদিকে আমরা উপলব্ধি করিতেছি সেই আত্মাকে, সেই অক্ষর পুরুষকে যিনি নিজের দৃষ্টির মধ্যে বিশ্বের ক্ষর লীলাকে চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছেন, অন্যদিকে আমাদের এই অনুভূতিও হইতেছে যে, ভগবান আমাদের মধ্যে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন; এই অনুভূতিটি আগেকার অনুভূতি হইতে পৃথকভাবে হইতে পারে অথবা এক সঙ্গে হইতে পারে, অথবা মিশিয়া হইতে পারে। তথাপি আমাদের মনে হইতে পারে যে, বিশ্বজগৎ তাঁহার ও আমাদের চৈতন্যের একটা বাহ্য রূপ, অথবা একটা প্রতিরূপ বা প্রতীক যাহার দ্বারা আমরা তাঁহার সহিত সার্থক সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে পারি এবং ক্রমশঃ তাঁহার জ্ঞানে গড়িয়া উঠিতে পারি। কিন্তু আবার অন্যদিকে আমাদের আর এক প্রকার অধ্যাত্ম অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান হয় যাহাতে আমরা সব জিনিষকেই একেবারে ভগবান বলিয়া দেখিতেই বাধ্য হই,—এই জগতে এবং ইহার অগণ্য জীবের মধ্যে তিনি অক্ষররূপেই বিরাজিত নহেন, কিন্তু ভিতরে ও বাহিরে যাহা কিছু হইয়াছে সে সবই তিনি। তখন সবই হয় আমাদের কাছে এক দিব্য সত্য বস্তু যাহা আমাদের মধ্যে এবং জগতের মধ্যে আবির্ভূত হইতেছে। যদি কেবল এই অনুভূতিই হয়, তাহা হইলে আমরা সর্ব্বেশ্বরবাদীদের (Pantheists) ঐক্য পাই,—সেই একই সব। কিন্তু, সর্ব্বেশ্বরবাদীদের অনুভূতি কেবল আংশিক অনুভূতি। এই যে বিস্তৃত জগৎ ইহাই ভগবানের সবখানি নহে, ইহা অপেক্ষা মহত্তর এক অনন্ত আছে যাহার দ্বারা ইহার অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে। বিশ্ব ভগবানের সমগ্র চরম সত্য নহে, কেবল একটা আত্মাভিব্যক্তি, তাঁহার সত্তার একটা সত্য কিন্তু নীচের খেলা। এই সব অধ্যাত্ম উপলব্ধি,—প্রথম দৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে যতই বৈসাদৃশ্য বা বিরোধ দেখা যাউক,

তথাপি ইহাদের সমন্বয় করা যায় যদি আমরা ইহাদের মধ্যে কোন একটিরই উপরে সব জোর না দিই এবং যদি আমরা এই সহজ সত্যটি স্বীকার করি যে, ভাগবত সত্তা বিশ্বজগৎ অপেক্ষা বড়, কিন্তু তথাপি সব সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত জিনিষ সেই ভাগবত সত্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে,--সকলেই তাঁহার প্রকাশক বলিতে পারা যায়, তাহাদের কোন অংশে বা সমষ্টিতে তাহারা সেই সমগ্র সত্তা নহে, তথাপি সে-সব তাঁহার প্রকাশক হইতে পারিত না যদি তাহারা ভাগবত সত্তারই উপাদানে নির্ম্মিত না হইয়া অন্য কিছু হইত—সেইটিই সত্য বস্তু; কিন্তু তাহারা তাহার প্রকাশক সত্য বস্তু *।

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" বাক্যের দ্বারা ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে; যাহা কিছু এই বিশ্বজগৎ, যাহা কিছু এই বিশ্বজগতে রহিয়াছে এবং যাহা কিছু বিশ্বের উপরে সে সমুদায়ই ভগবান। গীতা প্রথমে তাঁহার বিশ্বাতীত সত্তার উপরেই ঝোক দিয়াছে। নতুবা মানুষের মন

---

* যদিও আমাদের মনের অনুভূতিতে চরম সত্যের পার্শ্বে এই গুলিকে অপেক্ষাকৃত অসত্য বলিয়াই অনুভূত হইতে পারে। শঙ্করের মায়াবাদে যে যুক্তিতর্ক আছে তাহা বাদ দিয়া, উহার মূলে যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি রহিয়াছে তাহা ধরিলে দেখা যায় যে, উহা এই আপেক্ষিক অসত্যতার অনুভূতিকে লইয়াই বাড়াবাড়ি করিয়াছে। মনের উপরে উঠিলে আর এই গোলমাল থাকে না, কারণ সেখানে ঐ গোলমাল কখনই ছিল না। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়, দার্শনিক সম্প্রদায় বা যোগপন্থার পশ্চাতে বিভিন্ন অনুভূতি রহিয়াছে, মনের ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে যে বিরোধ, গভীরতর অনুভূতির দ্বারা সে-সব বিরোধ দূর হইয়া যায় এবং অতিমানস অনন্তের ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য সাধিত হয়।

তাহার চরম লক্ষ্যকে হারাইয়া ফেলিবে এবং কেবল বিশ্বের দিকেই চাহিয়া থাকিবে, অথবা বিশ্বের মধ্যে ভগবানের কোন আংশিক উপলব্ধিতেই আসক্ত থাকিবে। পরে গীতা তাঁহার বিশ্বসত্তার উপরে জোর দিয়াছে, যাঁহার মধ্যে সকলে চলিতেছে, ফিরিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে। কারণ, ঐটিই বিশ্বলীলার সার্থকতা, ঐটিই ভগবানের বিরাট অধ্যাত্ম আত্ম-জ্ঞান, সেখানে ভগবান নিজেকে কাল-পুরুষ রূপে দেখিয়া তাঁহার বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম করিতেছেন। তাহার পর গীতা বেশ জোর দিয়াই স্বীকার করিতে বলিয়াছে যে, ভগবান মানবদেহের মধ্যে দিব্য অধিবাসীরূপে অধিষ্ঠিত। কারণ, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অধিষ্ঠিত পুরুষ, এবং যদি এই অন্তর্য্যামী পুরুষকে স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে কেবল যে ব্যষ্টিগত সত্তার কোন দিব্য সার্থকতা থাকিবে না এবং আমাদের উচ্চতম অধ্যাত্মজীবন-বিকাশের প্রেরণার শ্রেষ্ঠ শক্তি নষ্ট হইবে শুধু তাহাই নহে, পরন্তু সমাজের মধ্যে জীবের সহিত জীবের সম্বন্ধ থাকিয়া যাইবে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, অহঙ্কৃত। অবশেষে, গীতা বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যে ভগবানের প্রকাশ অতি বিস্তৃত ভাবেই দেখাইয়াছে এবং বলিয়াছে যে, জগতে যাহা কিছু আছে সে-সব এক ভগবানেরই প্রকৃতি, শক্তি ও চৈতন্য হইতে উদ্ভূত। কারণ, এই দৃষ্টিও ভাগবত-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মূলতঃ প্রয়োজনীয়; এই ভিত্তির উপরেই মানুষ তাহার সমগ্র সত্তা ও সমগ্র প্রকৃতিকে ভগবদ্‌ অভিমুখী করে, জগতে ভাগবত শক্তির কার্য্য স্বীকার করে, তাহার নিজের মন এবং ইচ্ছাশক্তিকে দিব্য কর্ম্মের স্বরূপে রূপান্তরিত করিবার সম্ভাবনা স্বীকার করে,—সে কর্ম্মের প্রেরণা আসে উপর হইতে, সে কর্ম্মের দ্বারা বিশ্বের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সে কর্ম্ম ব্যক্তির বা জীবের মধ্য দিয়াই সম্পাদিত হয়।

তাহা হইলে পরাৎপর ভগবান, বিশ্বচৈতন্যের পশ্চাতে অক্ষর পুরুষ, মানুষের মধ্যে ব্যষ্টিগত ভাগবত সত্তা, বিশ্বপ্রকৃতির এবং তাহার সকল কর্ম্ম ও জীবের মধ্যে গোপন ভাবে সচেতন অথবা আংশিক ভাবে প্রকট ভাগবত সত্তা,—এ সকলই এক সত্য বস্তু, এক ভগবান। কিন্তু সেই একই পুরুষের একটি ভাব সম্বন্ধে যে-সকল সত্য আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, তাঁহার অন্য ভাব সম্বন্ধে সে সত্যগুলি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিলে সে গুলি উল্টাইয়া যায় অথবা তাহাদের অর্থের পরিবর্ত্তন হয়। যেমন, ভগবান সব সময়েই ঈশ্বর; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা চারিটী ক্ষেত্রেই তাঁহার মূল ঈশ্বরত্ব ঠিক একই ভাবে, একই অর্থে প্রয়োগ করিতে পারি না। বিশ্ব-প্রকৃতিতে আবির্ভূত ভাগবত সত্তা রূপে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ঐক্যের সহিত কার্য্য করেন। বলিতে পারা যায় যে, তখন তিনি নিজেই প্রকৃতি, কিন্তু সেই প্রকৃতির কার্য্যের মধ্যে থাকে এক অধ্যাত্ম-চেতনা যাহা পূর্ব্ব হইতে সব দেখিতে পায়, পূর্ব্ব হইতে সব সঙ্কল্প করে, ইচ্ছা করে, সব বুঝিতে পারে, নিজের বলে সবকে পরিচালিত করে, কর্ম্ম ও শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মের ফল নিয়ন্ত্রিত করে। আবার সকলের শান্ত দ্রষ্টারূপে তিনি অকর্ত্তা, কেবল প্রকৃতিই কর্ত্তা। তিনি প্রকৃতিকে আমাদের স্বভাব অনুযায়ী এই সকল কর্ম্ম করিতে ছাড়িয়া দেন, স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে, অথচ তিনিই ঈশ্বর,—প্রভু, বিভু, কারণ তিনি আমাদের কর্ম্ম দেখেন, সমর্থন করেন এবং তাঁহার নীরব অনুমতির দ্বারা প্রকৃতিকে কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেন। তাঁহার নিষ্ক্রিয়তা দ্বারা তিনি পরাৎপর ভগবানের শক্তিকে তাঁহার সর্ব্বব্যাপী নিশ্চল অবস্থিতির ভিতর দিয়া প্রেরণ করেন এবং দ্রষ্টা পুরুষের সম-

ভাবের দ্বারা সকল বস্তুতে উহার ক্রিয়াকে সমর্থন করেন। পরাৎপর বিশ্বাতীত ভগবান রূপে তিনিই সকলের মূল স্থষ্টিকর্ত্তা; তিনি সকলের উপরে, সকলকে আবির্ভূত হইতে বাধ্য করেন; কিন্তু তিনি যাহা স্থষ্টি করেন তাহার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলেন না; অথবা তাঁহার প্রকৃতির কর্ম্মে নিজেকে আসক্ত করেন না। প্রকৃতির কর্ম্মে যে অলঙ্ঘ্য নিয়মানুবর্ত্তিতা, তাহার পিছনে অধ্যক্ষরূপে রহিয়াছে তাঁহারই মুক্ত সত্তার ইচ্ছাশক্তি। ব্যষ্টিগত সত্তায় অজ্ঞানের সময় তিনি আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভগবান, সকলকে অবশভাবে প্রকৃতির যন্ত্রে ঘূর্ণায়মান করেন, সেই যন্ত্রের অংশস্বরূপ অহং (ego) ঘুরিতে থাকে, সেই অহং একটা বাধাও বটে আবার সেই সঙ্গে সহায়ও বটে। কিন্তু, প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পূর্ণ ভগবান বিরাজ করিতেছেন, অতএব আমরা অজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া এই অবশতার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠিতে পারি। কারণ, যে এক আত্মা সবকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহার সহিত নিজেদিগকে এক করিয়া আমরা সাক্ষী ও অকর্ত্তা হইতে পারি। অথবা আমরা আমাদের ব্যষ্টি সত্তায় আমাদের অন্তরস্থিত ভগবানের সহিত মানব-জীবের যাহা সত্য সম্বন্ধ তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, আমাদের প্রাকৃত অংশকে সাক্ষাৎ যন্ত্র বা নিমিত্ত করিতে পারি এবং আমাদের অধ্যাত্ম সত্তায় সেই অন্তর্যামী পুরুষের পরম, মুক্ত, আসক্তিহীন প্রভুত্বের ভাগী হইতে পারি। এইটিই আমাদিগকে গীতার মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখিতে হইবে; কোন্ সম্বন্ধের ক্ষেত্র হইতে প্রয়োগ করা হইতেছে সেই অনুসারে একই সত্যের যে এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হয় তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা যেখানে বাস্তবিক

কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই সেখানে আমরা তাহা দেখিতে পাইব, অথবা অর্জ্জুনের ন্যায় বলিতে হইবে, ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেণ বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।

তাই গীতা এই বলিয়া আরম্ভ করিল যে, ভগবান নিজের মধ্যে সবকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে কাহারও মধ্যে নহেন,—মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ। আবার তখনই বলিল, "অথচ সর্ব্বভূত আমার মধ্যে অবস্থিত নহে, আমার আত্মা সর্ব্বভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অবস্থিত নহে।" আবার যেন আত্মবিরোধ করিয়াই গীতা বলিয়াছে যে, ভগবান মানব-শরীরের মধ্যে রহিয়াছেন, মানব-শরীরকে আশ্রয় করিয়াছেন,—মানুষীম্ তনুম্ আশ্রিতম্। বলিয়াছে যে, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের যে পূর্ণ সাধনা, তাহার দ্বারা আত্মার মুক্তি সাধিতে হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই যে-সব কথার পরস্পরের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ এরূপ কোন বিরোধই নাই। ভগবানের যে বিশ্বাতীত সত্তা তাহাই সর্ব্ব-ভূতের মধ্যে অবস্থিত নহে, সর্ব্বভূতও তাহার মধ্যে অবস্থিত নহে। কারণ, আমরা যে ভগবান ও সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রভেদ করি, তাহা কেবল প্রতিভাসিক জগতের লীলাতেই প্রযোজ্য। বিশ্বাতীত সত্তায় সমস্তই শাশ্বত পুরুষ, এবং যদি সেখানেও বহুত্ব থাকে তবে সকলেই শাশ্বত পুরুষ। এক বস্তুর মধ্যে আর এক বস্তু থাকা, এরূপ স্থানবাচক ভাব সেখানে প্রযোজ্য নহে; কারণ বিশ্বাতীত যে-পরম বস্তু তাহা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, ঈশ্বরের যোগমায়ার দ্বারা ইহজগতেই দেশ-কালের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বাতীত সত্তায় "এক সঙ্গে থাকা" (Co-existence)

আধ্যাত্মিক, তাহা দেশ বা কালের অনুযায়ী "এক সঙ্গে থাকা" নহে, সেখানে অধ্যাত্ম ঐক্য ও মিলনই ভিত্তি। কিন্তু অন্য পক্ষে, ব্যক্ত জগতে পরম অব্যক্ত বিশ্বাতীত সত্তা কর্ত্তৃক বিশ্ব দেশ ও কালের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে, সেই বিস্তারে তিনি প্রথমে আত্মা-রূপে আবির্ভূত হন এবং সকলকে ধারণ করেন,—ভূতভৃৎ, তাঁহার সর্ব্বব্যাপী আত্মসত্তায় সর্ব্বভূতকে ধরিয়া থাকেন। এমন কি ইহাও বলা যাইতে পারে যে, পরমাত্মাই এই বিশ্বব্যাপী আত্মার ভিতর দিয়া বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছেন; তিনি ইহার অদৃশ্য অধ্যাত্ম ভিত্তি এবং সর্ব্বভূতের আবির্ভাবের গুপ্ত অধ্যাত্ম কারণ। আমাদের মধ্যে গুপ্ত আত্মা যেমন আমাদের চিন্তা, কর্ম্ম, গতিকে ধরিয়া রহিয়াছে, সেইভাবে তিনিও বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছেন। উপলব্ধি হয় যে, তিনি মন, প্রাণ দেহে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহার উপ-স্থিতির দ্বারা তাহাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু এই যে ব্যাপ্তি ইহা চৈতন্যের একটা ক্রিয়া, ইহা জড় বস্তুর ব্যাপ্তি নহে; এই জড় শরীর ও আত্মার চৈতন্যের একটা নিত্য ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই দিব্য আত্মা সর্ব্বভূতকে ধরিয়া রহিয়াছে, সব তাহার মধ্যে অবস্থিত, মূলতঃ জড়ভাবে নহে, কিন্তু আত্মা অধ্যাত্ম-ভাবে যে নিজেকে বিস্তৃত করিয়াছে তাহারই মধ্যে সকলে অবস্থিত। ঐ অধ্যাত্ম-বিস্তৃতিকে আমাদের জড়ানুগত মন ও ইন্দ্রিয় যে ভাবে দেখে তাহাই জড়জগতে বিস্তৃত দেশ ও কাল। বস্তুতঃ এখানেও সবই অধ্যাত্মভাবে পাশাপাশি, এক হইয়া বা মিলিত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ইহা মূল সত্য,—যতক্ষণ না আমরা সেই পরা চৈতন্যে ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি, ততক্ষণ এ সত্য

আমরা প্রয়োগ করিতে পারি না। ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা কেবল আমাদের মনের একটা ধারণা মাত্র হইয়া থাকিবে, কিন্তু, বাস্তব উপলব্ধিতে ইহার অনুরূপ আমরা কিছুই পাইব না। অতএব এই সব দেশ-কাল-বাচক শব্দ ব্যবহার করিয়াই আমাদিগকে বলিতে হয় যে, এই বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল বস্তু স্বপ্রতিষ্ঠ ভাগবত সত্তার মধ্যে রহিয়াছে, যেমন অন্য সকল জিনিষ আকাশের মধ্যে রহিয়াছে। তাই গুরু এখানে অর্জ্জুনকে বলিলেন "যেমন মহান্ সর্ব্বত্রগামী বায়ু আকাশে অবস্থিত, ভূতগণও সেইরূপ আমাতে অবস্থিত, এই ভাবেই তোমাকে ইহা ধারণা করিতে হইবে।"* বিশ্বসত্তা সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত, এবং স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাও সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত; কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ অনন্ত হইতেছে অচল, স্থির, অক্ষর, আর বিশ্বসত্তা হইতেছে সর্ব্বব্যাপী গতি,—সর্ব্বত্রগঃ। আত্মা এক ভিন্ন বহু নহে; কিন্তু বিশ্বসত্তা সর্ব্বভূতরূপে নিজেকে প্রকট করিতেছে এবং মনে হয় যে, উহা সর্ব্বভূতেরই সমষ্টি। একটি হইতেছে সত্তা, অপরটি সত্তার শক্তি, তাহা সর্ব্বমূল সর্ব্বাধার অক্ষর আত্মার সত্তায় চলিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে। আত্মা এই সকল সৃষ্ট বস্তুতে বা তাহাদের কোন একটিতে অবস্থান করে না, অর্থাৎ, তাহাদের কোন একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে,—ঠিক যেমন এখানে আকাশ কোন রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, যদিও সকল রূপ শেষ পর্য্যন্ত আকাশ হইতেই উৎপন্ন। সকল বস্তুকে একত্র করিলেও ভগবান হয় না বা ভগবানকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, যেমন সর্ব্বত্রগ বায়ুর

* যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৯।৬

মধ্যে আকাশ সীমাবদ্ধ নহে অথবা ঐ বায়ুর রূপ ও শক্তি সকলকে একত্র করিলেও আকাশ হয় না। তথাপি ঐ গতির মধ্যেও ভগবান রহিয়াছেন; তিনি বহুর মধ্যে অবস্থান করিতেছেন প্রত্যেক জীবের ঈশ্বর রূপে। তাঁহার পক্ষে এই দুই প্রকার সম্বন্ধই একই সঙ্গে সত্য। একটি হইতেছে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মসত্তার সহিত বিশ্বলীলার সম্বন্ধ, অপরটি অনুস্যূতি, বিশ্বসত্তার সহিত বিশ্বসত্তার নিজেরই বিভিন্ন রূপের সম্বন্ধ। একটি সত্য হইতেছে সত্তার, তাহা স্বপ্রতিষ্ঠ, নিজের অক্ষরতায় সকলকে ধরিয়া রহিয়াছে, অপর সত্যটী হইতেছে সেই সত্তারই শক্তির, তাহা সত্তারই আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশ-লীলাকে উদ্ভাসিত ও পরিচালিত করিয়া প্রকট হইতেছে।

পরাৎপর ভগবান বিশ্বসত্তার ঊর্দ্ধ হইতে নিজের প্রকৃতির উপর চাপ দেন, তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু একাকালে ব্যক্ত হইয়া আবার অব্যক্ত হইয়াছে সে-সবকে এক অনন্ত ঘূর্ণায়মান চক্রে পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট করেন*। বিশ্বমাঝে সকল সৃষ্ট বস্তু এই সৃষ্টীক্রিয়ার দ্বারা অবশ হইয়া চালিত হয়,—জগতের যে-সব নিয়ম সর্ব্বভূতরূপে প্রকট ভাগবত সত্তার বিশ্বলীলার ছন্দ প্রকাশ করিতেছে—সকল সৃষ্ট বস্তু সেই সব নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয়। এই দিব্যপ্রকৃতির লীলাতেই জীব তাহার যাতায়াতের চক্র অনুসরণ করে,—প্রকৃতিম্ মামিকাম,

---

* প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥৯।৮

স্বাম্ প্রকৃতিম্। প্রকৃতির বিকাশের নিয়মানুসারে জীব কখনও এক রূপ, কখনও অন্য রূপ গ্রহণ করে; দিব্য প্রকৃতিরই একটা আবির্ভাব রূপে জীবের সত্তার যাহা ধর্ম্ম, জীব সকল সময়েই সেই স্বধর্ম্মের রেখা অনুসরণ করিয়া চলে, প্রকৃতির ঊর্দ্ধতন সাক্ষাৎ লীলাতেই হউক বা অধস্তন পরোক্ষ লীলাতেই হউক, অজ্ঞানেই হউক বা জ্ঞানেই হউক; কল্পের অন্তে জীব প্রকৃতির কর্ম্মলীলা হইতে তাহার অচলতা ও নীরবতার মধ্যে ফিরিয়া যায়। জীব যখন অজ্ঞান, তখন সে প্রকৃতির কল্পচক্রের অধীন, নিজে নিজের প্রভু নহে, কিন্তু প্রকৃতির বশে পরিচালিত,—অবশং প্রকতের্ব্বশাৎ। কেবল দিব্য-চৈতন্যে ফিরিয়া গিয়াই জীব ঈশ্বরত্ব ও মুক্তি লাভ করিতে পারে। ভগবানও ঐ কল্প চক্রের অনুসরণ করেন, কিন্তু উহার বশে নহে, উহার প্রকাশক ও পরিচালক আত্মা রূপে, তাঁহার সমগ্র সত্তা উহাতে নিয়োজিত হয় না, কিন্তু তাঁহার সত্তার শক্তির দ্বারা তিনি উহাকে অনুসরণ করেন, পরিচালিত করেন। প্রকৃতির মধ্য দিয়া তাঁহার যে কর্ম্ম চলিতেছে সে কর্ম্মের তিনিই অধ্যক্ষ,—তিনি প্রকৃতির মধ্যে সঞ্জাত কোন সত্তা নহেন, কিন্তু তিনি সেই সত্তা যিনি অধ্যাত্ম স্থষ্টিকর্ত্তা রূপে প্রকৃতিকে সচরাচর বিশ্ব প্রসব করান।‡ তাঁহার শক্তিতে তিনি প্রকৃতির কর্ম্ম অনুসরণ করেন এবং তাঁহার সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হন বটে, কিন্তু তিনি আবার প্রকৃতির বাহিরেও বটেন, যেন প্রকৃতির বিশ্বলীলার উপরে বিশ্বাতীত ঐশ্বরিক সত্তায়

‡ ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥৯।১০

অধিষ্ঠিত থাকেন, কোন বন্ধনহেতু অবশকারী বাসনার দ্বারা তিনি প্রকৃতিতে আসক্ত নহেন, অতএব তাহার কর্ম্মসকলের দ্বারা বদ্ধ নহেন, কারণ তিনি সে-সব অপেক্ষা অনন্তগুণে বড় এবং সে-সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী, কালের চক্রে যে-সব কর্ম্মপরম্পরা চলিতেছে, তাহাদের পূর্ব্বে, তাহাদের সমকালে এবং তাহাদের পরেও তিনি যেমন আছেন ঠিক তেমনই থাকেন।* তাহাদের সকল পরিবর্ত্তনে তাঁহার অক্ষর সত্তার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। যে নীরব অধ্যাত্ম সত্তা বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াছে—তাহা বিশ্বের কোন পরিবর্ত্তনেই বিচলিত হয় না; কারণ যদিও উহা ধরিয়া রহিয়াছে, তথাপি উহা ঐ পরিবর্ত্তনের লীলায় যোগদান করে না। এই মহত্তম পরাৎপর বিশ্বাতীত সত্তাও সে সকলের দ্বারা বিচলিত হয় না, কারণ, ইহা তাহাদের অতীত, চিরকাল তাহাদের উপরে রহিয়াছে।

কিন্তু আবার যেহেতু এই কর্ম্ম দিব্য-প্রকৃতির কর্ম্ম,—স্বাম্ প্রকৃতিম্, এবং দিব্য-প্রকৃতি কখনও ভগবান হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না, দিব্য-প্রকৃতি যাহাই সৃষ্টি করুক না কেন তাহার মধ্যে নিশ্চয় ভগবান অনুস্যূত আছেন। এই যে সম্বন্ধ ইহাই ভগবানের সত্তার সমগ্র সত্য নহে, কিন্তু আবার এই সত্যকে আমরা আদৌ অবহেলাও করিতে পারি না। তিনি মানবদেহের

---

* ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥৯।৯

মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।* যাহারা এখানে ভাগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, মানব-দেহের মধ্যে ভাগবত সত্তা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে যাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, তাহারা প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্যের দ্বারা বিমূঢ় ও প্রতারিত হয়, তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না যে, অন্তরের মধ্যে ভগবান গুপ্ত রহিয়াছেন, অবতারে তিনি সজ্ঞানে মানবদেহ ধারণ করেন, সাধারন মানুষে তিনি তাঁহার মায়ার দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকেন। যাঁহারা মহাত্মা, যাঁহারা অহংভাবের মধ্যে আবদ্ধ নহেন, যাহারা অন্তর্যামী ভগবানের দিকে নিজেদিগকে খুলিয়া ধরিতে পারেন তাঁহারা জানেন যে, মানুষের মধ্যে যে গুপ্ত আত্মা অপূর্ণ মানবীয় প্রকৃতিতে আবদ্ধ বলিয়া মনে হয়, তাহা সেই একই অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি যাহাকে আমরা সকলের উপরে পরাৎপর ভগবান বলিয়া পূজা করি। যেখানে তিনি সর্ব্বভূতের অধিপতি ও ঈশ্বর ভগবানের সেই পরম পদ তাঁহারা জানেন; অথচ তাহারা দেখিতে পান যে, প্রত্যেক ভূতের মধ্যেও তিনি সেই পরাৎপর দেবতা এবং অন্তর্যামী ভগবান। বাকী যাহা কিছু সে-সবই বিশ্বমাঝে প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য বিকাশের জন্য ভগবানের খণ্ড প্রকাশ, ভগবান নিজে নিজেকে খণ্ডিত করেন। তাঁহারা আরও দেখিতে পান যে,

---

* অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্ ॥৯।১১
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥৯।১৩

তাঁহারই প্রকৃতি বিশ্বে যাহা কিছু আছে সব হইয়াছে, সুতরাং ইহসংসারে প্রত্যেক বস্তুই মূলতঃ ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নহে, —বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, এবং তাঁহারা যে তাঁহাকে কেবল বিশ্বাতীত পরাৎপর ভগবান বলিয়া পূজা করেন শুধু তাহাই নহে, কিন্তু ইহসংসারে, তাহার একত্বে এবং প্রত্যেক পৃথক সত্তায় তাঁহাকে পূজা করেন ‡। তাঁহারা এই সত্য দর্শন করেন এবং এই সত্যকে অনুসরণ করিয়া তাঁহারা জীবন যাপন করেন, কর্ম্ম করেন; তাঁহাকেই তাঁহারা উপাসনা করেন, জীবনে অনুসরণ করেন, সকল বস্তুর ঊর্দ্ধে অবস্থিত সত্তা রূপে, আবার বিশ্ব-মাঝে অবস্থিত ভগবান রূপে, এই দুই রূপেই, তাঁহার পূজা করেন, কর্ম্মযজ্ঞের দ্বারা তাঁহাকে সেবা করেন, জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে সন্ধান করেন, সর্ব্বত্র ভগবান ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না, এবং তাঁহাদের আত্মা এবং অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি সহ সমগ্র সত্তাকে তাঁহার দিকে তুলিয়া ধরেন। এইটিকেই তাঁহারা উদার ও প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া জানেন; কারণ এইটীই পরাৎপর বিশ্বব্যাপী এবং ব্যষ্টিগত ভগবান সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত পন্থা।

---

‡ জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥৯।১৫
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৯।৩৪

ইহাই তাহা হইলে সমগ্র সত্য, সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও প্রশস্ত জ্ঞান। ভগবান বিশ্বাতীত, সনাতন পরব্রহ্ম,—তাঁহার নিজেরই সত্তা ও প্রকৃতি যে দেশ ও কালের মধ্যে এই বিশ্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, সে সবকে তিনি তাঁহার দেশ ও কালের অতীত প্রতিষ্ঠার দ্বারা ধরিয়া রহিয়াছেন। তিনি পরমাত্মা, বিশ্বের সকল নামরূপ ও গতিধারার আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি পুরুষোত্তম, এই বিশ্বের বা অন্য সকল বিশ্বের সকল আত্মা ও প্রকৃতি, সকল সত্তা ও বিকাশ তাঁহারই আত্মরূপায়ণ ও আত্মশক্তি-প্রকাশ। তিনি পরমেশ্বর, সকল বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় প্রভু, তিনি তাঁহার নিজের ব্যক্ত শক্তিকে অধ্যাত্মভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জগৎচক্র প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, এবং জগতে সর্ব্বভূতের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ সাধন করিতেছেন। তাঁহা হইতেই জীব এখানে এই জগৎচক্রে আসিয়াছে,—জীব ব্যষ্টিগত অধ্যাত্মসত্তা, প্রকৃতিস্থ পুরুষ; তাঁহারই সত্তায় জীবের অস্তিত্ব, তাঁহারই চেতনার আলোকে জীব সচেতন, তাঁহারই ইচ্ছা ও শক্তি দ্বারা জীব জ্ঞানের, ইচ্ছার, কর্ম্মের ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারই বিশ্বলীলার দিব্য আনন্দে জীব জীবনকে উপভোগ করিতেছে।

মানুষের অন্তরের আত্মা হইতেছে এখানে ভগবানের আংশিক আত্মপ্রকাশ, জগতে তাঁহার প্রকৃতির কার্য্যের জন্য তিনি নিজেকে এইভাবে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন, প্রকৃতিঃ জীবভূতাঃ। ব্যষ্টিগত মানুষ তাহার মূল অধ্যাত্ম সত্তায় ভগবানের সহিত এক। দিব্য

প্রকৃতির ক্রিয়ায় সে ভগবানের সহিত এক, অথচ কার্য্যতঃ একটা ভেদ আছে, এবং প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত ভগবান ও বিশ্বপ্রকৃতির উর্দ্ধে অবস্থিত ভগবান এতদুভয়ের মধ্যে অনেক প্রকার সম্বন্ধ আছে। প্রকৃতির নীচের খেলায় অজ্ঞান ও অহঙ্কারমূলক ভেদনীতির বশে মনে হয় যেন মানুষ সেই এক ভগবান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এবং এই ভেদ চেতনার মধ্যে থাকিয়াই সে চিন্তা করে, ইচ্ছা করে, কর্ম্ম করে, ভোগ করে, নিজের ক্ষুদ্র অহংয়ের তৃপ্তির জন্য, জগতে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন এবং অন্যান্য মানুষের সহিত নিজের বাহ্যিক সম্বন্ধের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য। কিন্তু বস্তুতঃ তাহার সমস্ত সত্তা, সমস্ত চিন্তা, তাহার সমস্ত ইচ্ছা ও কর্ম্ম ও আনন্দভোগ এ-সবই ভগবানের সত্তার, ভগবানের চিন্তা, ইচ্ছা, কর্ম্ম ও প্রকৃতি-উপভোগের প্রতিচ্ছায়া, যতক্ষণ সে অজ্ঞানের মধ্যে বাস করে ততক্ষণ অহঙ্কারের দ্বারা খণ্ডিত ও বিকৃত। তাহার নিজের এই সত্যে ফিরিয়া যাওয়াই তাহার মুক্তিলাভের সোজা পথ, অজ্ঞানের অধীনতা হইতে পরিত্রাণ পাইবার সর্ব্বাপেক্ষা নিকট ও প্রশস্ত দ্বার। মানুষ প্রকৃতিযুক্ত আত্মা, এবং তাহার প্রকৃতিতে রহিয়াছে মন ও বুদ্ধি, ইচ্ছা ও কর্ম্ম, চিত্তাবেগ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং জীবনের আনন্দ উপভোগ করিবার নিমিত্ত প্রাণের আকাঙ্খা; সুতরাং এই সকল শক্তিকে ভগবদভিমুখী করিয়াই তাহার নিজের উচ্চতম সত্যে ফিরিয়া যাওয়া সম্পূর্ণভাবে সম্ভব করা যাইতে পারে। পরম আত্মা ও ব্রহ্মের জ্ঞান তাহাকে লাভ করিতে হইবে; তাহার প্রেম ও ভক্তিকে পরমপুরুষের দিকেই ফিরাইতে হইবে; তাহার ইচ্ছা ও কর্ম্মকে পরম জগদীশ্বরের অধীন করিতে হইবে। তখন সে নীচের প্রকৃতি হইতে দিব্য প্রকৃতিতে উঠিয়া যাইতে পারিবে, তখন সে তাহার

অজ্ঞানের চিন্তা, ইচ্ছা ও কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া ভগবানের সহিত ঐক্যে, সেই এক আত্মারই আত্মা, শক্তি, জ্যোতি হইয়া চিন্তা করিতে, ইচ্ছা করিতে কর্ম্ম করিতে পারিবে; তখন সে ভিতরে ভগবানের সমস্ত অনন্ততা উপভোগ করিবে, আর তাহাকে কেবল এই সব বাহিরের স্পর্শ, ছদ্মবেশ ও বাহ্যরূপের ভোগ লইয়াই থাকিতে হইবে না। এইরূপে দিব্য জীবন যাপন করিয়া, এইরূপে তাহার সমগ্র আত্মা, সত্তা ও প্রকৃতিকে ভগবদভিমুখী করিয়া, সে পরমব্রহ্মের সত্যতম সত্যের মধ্যে গৃহীত হইবে।

বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, বাসুদেবই সব, ইহা জানা এবং এই জ্ঞানের মধ্যে বাস করা, ইহাই নিগূঢ় রহস্য। সে জানে যে, তিনি আত্মা, অক্ষর, আধাররূপে সকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন আবার সকল জিনিষের মধ্যেই অনুস্যূত রহিয়াছেন। নীচের প্রকৃতির বিশৃঙ্খল ও অশান্ত খেলা হইতে সরিয়া আসিয়া সে স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মার নিস্তব্ধতা এবং অবিচ্ছেদ্য শান্তি ও জ্যোতির মধ্যে বাস করে। সে সেখানে ভগবানের এই আত্মার সহিত নিত্য ঐক্য উপলব্ধি করে, সে আত্মা সর্ব্বভূতের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং জগতের সকল গতি, ক্রিয়া ও ব্যাপারকে ধরিয়া রহিয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতের ভিত্তি স্বরূপ এই যে সনাতন অপরিবর্ত্তনশীল অধ্যাত্ম সত্তা, ইহা হইতে সে উপরে মহত্তর সনাতন, বিশ্বাতীত, পরম সত্য বস্তুর দিকে চাহিয়া দেখে। সে জানে যে, যাহা কিছু আছে সে-সবেরই মধ্যে তিনি দিব্য অধিবাসী, মানুষের হৃদ্দেশে তিনি গুহ্য ঈশ্বররূপে বর্ত্তমান, এবং তাহার প্রাকৃত সত্তা ও এই অভ্যন্তরীন অধ্যাত্ম প্রভুর মধ্যে যে মায়ার আবরণ রহিয়াছে সে সেই আবরণকে অপসৃত করিয়া কর্ম্মকে দেখে। সে তাহার ইচ্ছা চিন্তা, কর্ম্মকে জানে ঈশ্বরের ইচ্ছা, চিন্তা, ও কর্ম্মের

সহিত এক করিয়া দেয়, অন্তর্যামী ভগবানকে সে সকল সময় অনুভব করে এবং তাহার সমস্ত ইচ্ছা, চিন্তা, কর্ম্ম সেই নিত্য ভগবদনুভূতির সহিত এক সুরে বাঁধা হইয়া যায়, সকলের মধ্যে সে ভগবানকে দেখে ও ভজনা করে, এবং সমস্ত মানবীয় কর্ম্মকে দিব্য প্রকৃতির উচ্চতম আদর্শে রূপান্তরিত করে। সে জানে যে, বিশ্বজগতে তাহার চারিদিকে যাহা কিছু রহিয়াছে সে-সবের মূল ও সার সত্তা তিনি—সংসারের সমস্ত জিনিষকে সে দেখে যে, তাহাদের বাহ্যরূপে সে সব হইতেছে Veils—ছদ্মবেশ, আবার সেই সঙ্গেই দেখে যে, তাহাদের নিগূঢ় মর্ম্মে তাহারা হইতেছে সেই এক অচিন্ত্য সত্যবস্তুর আত্মপ্রকাশের উপলক্ষ্য ও উপায়; যে ঐক্য, ব্রহ্ম, পুরুষ, আত্মা, বাসুদেব, যে-সত্তা এই সর্ব্বভূত হইয়াছে, সে সর্ব্বত্র তাহাকে দেখিতে পায়। সেই জন্যই তাহার সমগ্র অভ্যন্তরীন জীবন অনন্তের সহিত এক সুরে ও ছন্দে গাঁথা হইয়া যায়, সে-অনন্ত তখন হয় সকল জীবে, তাহার ভিতরে ও চতুর্পার্শে সকল বস্তুতে স্বপ্রকাশ, এবং তাহার সমগ্র বাহ্য জীবন বিশ্ব-উদ্দেশ্য সাধনের বিশুদ্ধ যন্ত্রে পরিণত হয়। অন্তরাত্মার ভিতর দিয়া উপরে সে সেই পরব্রহ্মের দিকে চাহিয়া দেখে, যিনি এখানে এবং সেখানে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থিত ঈশ্বরের ভিতর দিয়া উপরে সে সেই পরম পুরুষের দিকে চাহিয়া দেখে যিনি তাঁহার উচ্চতম প্রতিষ্ঠায় সকল আবাসের উপরে। বিশ্বমাঝে যে-ঈশ্বর আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহার ভিতর দিয়া উপরে সেই পরমেশ্বরের দিকে সে চাহিয়া দেখে যিনি তাঁহার সকল সৃষ্টি, সকল প্রকাশের উপরে থাকিয়া সবকে পরিচালিত করিতেছেন। এইরূপে জ্ঞানের সীমাহীন বিকাশ এবং উর্দ্ধমুখী দৃষ্টি ও আস্পৃহার (**aspiration**) ভিতর দিয়া সে তাহাতেই উঠিয়া যায় যাহাকে

সে একান্ত সমগ্রভাব, সর্ব্বভাবেন, ভজনা করিয়াছে।

এই যে জীবের সমগ্রভাবে ভগবদভিমুখী হওয়া, ইহাকেই গীতা জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়ের মহান্ ভিত্তি করিয়াছে। ভগবানকে এইরূপ সমগ্রভাবে জানার অর্থ, আত্মায়, সমস্ত জগতে এবং সমস্ত জগতের অতীতে, তাঁহাকে এক বলিয়া জানা,—জানা যে, ভগবান একই সঙ্গে এই সবই। অথচ শুধু আবার এই ভাবে জানাই যথেষ্ট নহে, যদি সেই সঙ্গেই হৃদয় ও আত্মাকে প্রগাঢ়ভাবে ভগবানের দিকে তুলিয়া ধরা না হয়, যদি তাহা একাগ্র এবং সেই সঙ্গেই সর্ব্বতোমুখী প্রেম, ভক্তি, আস্পৃহাকে উদ্বুদ্ধ না করে। বস্তুতঃ যে-জ্ঞানের সঙ্গে আস্পৃহা নাই, যাহা হৃদয়ের ঊর্দ্ধমুখীভাবের দ্বারা সঞ্জীবিত নহে, তাহা সত্য জ্ঞান নহে, তাহা কেবল তর্কবুদ্ধির খেলা, শুষ্ক বিচারের নিষ্ফল প্রয়াস। ভগবানের দর্শন প্রকৃতভাবে লাভ কবিলে তাহা নিশ্চয়ই ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং ভগবানকে পাইবার জন্য তীব্র আবেগ আনিয়া দেয়,—ভগবানের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার প্রতি, আবার আমাদের মধ্যে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহারও প্রতি গাঢ় অনুরাগ আনিয়া দেয়। বুদ্ধি দ্বারা জানা মানে, শুধু বুঝা; এইভাবে আরম্ভ করা কার্য্যকরী হইতে পারে, আবার নাও হইতে পারে,—কার্য্যকরী হইবেই না যদি ঐ জানার মধ্যে কোন আন্তরিকতা না থাকে, অভ্যন্তরীন উপলব্ধি লাভের জন্য ইচ্ছার কোনও অনুপ্রেরণা না থাকে, ভিতরের সত্তার উপর কোনও প্রভাব না হয়, আত্মায় কোনও সাড়া না আসে; কারণ তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, মস্তিষ্ক বাহ্যিকভাবে বুঝিয়াছে কিন্তু আত্মা অভ্যন্তরীন ভাবে কিছুই দেখি নাই। সত্য জ্ঞান হইতেছে ভিতরের সত্তার দ্বারা জানা, এবং যখন ঐ ভিতরের সত্তায় আলোকের স্পর্শ লাগে,

তখন সে যাহা দেখে সেটিকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হয়, সেটিকে লাভ করিতে বাসনা করে, সেটিকে নিজের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে এবং নিজে তাহাতে গড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করে, যে-সত্যের মহিমা সে দর্শন করিয়াছে তাহার সহিত এক হইয়া যাইবার জন্য সাধনা করে। এইরূপ জ্ঞানের অর্থ হইতেছে, একাত্মতার উপলব্ধি; আর ঐ ভিতরের সত্তা নিজেকে পূর্ণ করিয়া তোলে চৈতন্য ও আনন্দের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, নিজের যাহাই সে দর্শন করিয়াছে তাহাকে লাভ করিয়া তাহার সহিত ঐক্যের দ্বারা, সুতরাং এই জ্ঞান যখনই জাগিয়া উঠে তখনই তাহা এই সত্য ও একমাত্র পরিপূর্ণ সিদ্ধি-লাভের অদম্য প্রেরণা নিশ্চয়ই আনিয়া দেয়। এই জ্ঞানে যাহাকে জানা যায় তাহা বাহ্য বস্তু নহে, তাহা দিব্য পুরুষ; আমরা যাহা কিছু তিনি সেই সবের আত্মা ও ঈশ্বর। তাঁহাতে সমগ্র সত্তার আনন্দ এবং তাঁহার প্রতি গভীর ও প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসা এই জ্ঞানের প্রাণ ও অবশ্যম্ভাবী ফল। এবং এই ভক্তি শুধুই হৃদয়ের কামনা মাত্র নহে, ইহা হইতেছে সমগ্র জীবনের সমর্পণ। অতএব ইহা উৎসর্গের রূপও নিশ্চয়ই গ্রহণ করে; এখানে আছে আমাদের সকল কর্ম্ম ঈশ্বরকে অর্পণ করা, এখানে আছে আমাদের সমগ্র বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ সক্রিয় প্রকৃতিকে সমস্ত ভিতরের খেলায় এবং সমস্ত বাহিরের খেলায় আমাদের ভক্তির পাত্র ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গ করা। আমাদের অন্তরের সমস্ত ক্রিয়া তাঁহারই মধ্যে চলিতে থাকে, সে-সব তাঁহাকে, সেই ঈশ্বর ও আত্মাকেই, তাঁহাদের শক্তির ও প্রচেষ্টার মূল উৎস ও লক্ষ্যরূপে সন্ধান করে। আমাদের বাহিরের সমস্ত ক্রিয়া জগতের মধ্যে অবস্থিত তাঁহার দিকেই প্রসারিত হয়, জগতের মধ্যেই ভগবানের সেবার আয়োজন

করে, সে-সেবা ও কর্ম্মের নিয়ামক শক্তি হইতেছেন আমাদের অন্তরস্থিত ভগবান, তাঁহাতেই আমরা বিশ্ব ও বিশ্বের সকল জীবের সহিত এক আত্মা। কারণ জগৎ ও আত্মা, প্রকৃতি এবং তাহার মধ্যে স্থিত জীব উভয়েই সেই একমেবাদ্বিতীয়মের চৈতন্যের দ্বারা উদ্ভাসিত, উভয়েই সেই বিশ্বাতীত পুরুষোত্তমের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক শরীর। এই ভাবে সেই এক আত্মার মধ্যে মন, হৃদয় ও ইচ্ছার সমন্বয় হয় এবং সেই সঙ্গে এই সমগ্র মিলনে, এই সর্ব্বতোমুখী ভগবদুপলব্ধিতে, এই দিব্য যোগে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় হয়।

কিন্তু এই দিব্য যোগের সাধনা আরম্ভ করাও অহং-ভাবে বদ্ধ জীবের পক্ষে কঠিন—শুধু তাহাই নহে, যাহারা আবার শেষ পর্য্যন্ত আর সব ছাড়িয়া চিরকালের মত এই যোগের পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের পক্ষেও ইহার পূর্ণ সার্থকতা ও সামঞ্জস্যে পৌছান সহজ নহে—মর্ত্ত্য মানুষের মন অজ্ঞানের বশে ছায়া ও বাহ্যরূপের উপর নির্ভর করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে; ইহা শুধু মানুষের বাহ্যিক শরীর, বাহ্যিক মন, বাহ্যিক জীবনধারাকেই দেখে কিন্তু জীবের মধ্যে যে দেবতা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে কোনও মুক্তিপ্রদ দৃষ্টি লাভ করিতে পারে না। নিজেরই মধ্যে যে দেবতা রহিয়াছেন তাঁহাকে সে অগ্রাহ্য করে, এবং অপর মনুষ্যের মধ্যেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না, এবং যদিও ভগবান মানুষের মধ্যে নিজেকে অবতার ও বিভূতিরূপে প্রকাশিত করেন তথাপি সে অন্ধ থাকে এবং মানবরূপের অন্তরালে অবস্থিত ভগবানকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করে, অবজানন্তি মাম্ মূঢ়া

মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।* আর যদি সে জীবন্ত মানুষের মধ্যেই ভগবানকে অগ্রাহ্য করে তাহা হইলে বাহ্যজগতে ভগবানকে দেখা তাহার পক্ষে আরও অসম্ভব হয়। কারণ এই বাহ্যজগৎকে সে দেখে তাহার ভেদাত্মক অহংভাবের কারাগার হইতে, তাহার সীমাবদ্ধ মনের রুদ্ধ গবাক্ষের ভিতর দিয়া। বিশ্বের মধ্যে সে ভগবানকে দেখিতে পায় না; যে পরম ভগবান এই বিচিত্র সৃষ্টিপূর্ণ জগৎসমূহের অধীশ্বর এবং তাহাদের মধ্যে বাস করিতেছেন তাঁহার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না; যে-দৃষ্টির দ্বারা জগতের সকল বস্তু দিব্যভাব প্রাপ্ত হয় এবং জীব নিজের অন্তর্নিহিত দেবত্বে জাগ্রত—হইয়া উঠে এবং ভগবানের হয়, ভগবত্তুল্য হয়, সে-দৃষ্টি সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অন্ধ মানুষের যে অহং ক্ষুদ্র জিনিষের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, শুধু সেই সবকেই পাইতে চাইতেছে এবং তাহাদের দ্বারা মন, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয়ের পার্থিব ক্ষুধা মিটাইতে চাহিতেছে—সেই অহংয়ের জীবনটীকেই সে সহজে দেখিতে পায় এবং তাহাতে তীব্র ভাবে আসক্ত হইয়া পড়ে। চিত্তের এই বহির্মুখী গতির দিকে যাহারা অতিমাত্রায় সমগ্র ভাবে নিজেদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহারা নীচের প্রকৃতির কবলে পতিত হয়, সেইটীকেই একান্ত ভাবে ধরিয়া থাকে এবং নিজেদের জীবনের ভিত্তি করে। মানুষের মধ্যে যে রাক্ষসী ‡ প্রকৃতি রহিয়াছে তাহারা তাহারই অধীন হইয়া পড়ে, এরূপ মানুষে প্রাণের তাড়নার

---

* অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ গীতা ৯।১১

‡ মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ৯।১২

বশে ইন্দ্রিয়পরায়ণ অহংয়ের উগ্র ও অপরিমিত তৃপ্তির জন্য সব কিছুকেই উৎসর্গ করে এবং সেই অহংকেই তাহার ইচ্ছা, চিন্তা, কর্ম্ম ও ভোগের তমোময় দেবতা করিয়া তোলে। অথবা আসুরী প্রকৃতির দাম্ভিক অহঙ্কার, স্বাভিমানী চিন্তা, স্বার্থপর কর্ম্ম এবং ভোগের আত্মতৃপ্ত অথচ চির-অতৃপ্ত মানসিক ক্ষুধা—এই সবের দ্বারা তাড়িত হইয়া তাহারা বৃথা চক্রে ঘুরিয়া মরে। কিন্তু ভগবান ও আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন এই অহং-চৈতন্যের মধ্যে অবিরত বাস করিতে থাকিলে, এবং ইহাকেই আমাদের সকল কর্ম্মের কেন্দ্র করিয়া তুলিলে—আমরা প্রকৃত আত্ম-জ্ঞানকে একেবারেই ধরিতে পারিব না। আত্মার বিপথগ্রস্ত যন্ত্রগুলির উপর ইহা যে মোহ বিস্তার করে তাহা জীবনকে নিষ্ফল ভাবে ঘুরায়। এই অহং-চৈতন্যের সমস্ত আশা, কর্ম্ম, জ্ঞানকে যখন দিব্য ও সনাতন আদর্শের তুলনায় বিচার করা যায় তখন সে-সব শূন্য, ব্যর্থ বলিয়া প্রতীত হয়, কারণ ইহা মহত্তর আশার পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়, মুক্তিপ্রদ কর্ম্মকে বহিষ্কার করে, সত্য জ্ঞানের আলোককে নির্ব্বাসিত করে। এই জ্ঞান শুধু বাহ্যদৃশ্য দেখে কিন্তু ভিতরের সত্যকে দেখে না অতএব ইহা মিথ্যা জ্ঞান, এই আশা অনিত্যের পশ্চাতে ছুটে কিন্তু নিত্য বস্তুর সন্ধান করে না অতএব ইহা মিথ্যা আশা, ক্ষতির দ্বারা এই কর্ম্মের সমস্ত লাভ নষ্ট হইয়া যায় অতএব এই কর্ম্ম অন্তহীন পণ্ডশ্রম।

মানুষের পক্ষে যে উচ্চতর দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করা সম্ভব সেই দৈবী প্রকৃতির আলোক ও বিশালতার অভিমুখে যে-সব মহাত্মারা নিজেদিগকে খুলিয়া ধরেন কেবল তাঁহারাই মুক্তি ও পূর্ণ সিদ্ধি লাভের পথে উঠিয়াছেন, সে-পথ প্রথমে সঙ্কীর্ণ কিন্তু

পরিশেষে এমনই প্রশস্ত যে ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না *। মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ, ইহাই মানুষের প্রকৃত কাজ; এই আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত দৈবী প্রকৃতির দিকে ফিরান, ইহাই মানবজীবনের সুরক্ষিত গুপ্ত রহস্য। এই দেবত্ব যতই পরিবর্দ্ধিত হয়, ততই মায়ার আবরণ খসিয়া পড়ে এবং জীব কর্ম্মের মহত্তর সার্থকতা এবং জীবনের প্রকৃত সত্য দেখিতে পায়। মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রতি, জগতের মধ্যে ভগবানের প্রতি দৃষ্টি তখন খুলিয়া যায়; সেই দৃষ্টি অন্তরের দিক দিয়া দেখে ও বাহিরের দিক দিয়া জানে সেই অসীম আত্মাকে, সেই অবিনাশী সত্তাকে যাঁহা হইতে সকল সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে, যিনি সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন এবং যাঁহার মধ্যে ও যাঁহার দ্বারা সব-কিছুই নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে। অতএব যখন এই দৃষ্টি, এই জ্ঞান মানবাত্মাকে অধিকার করে, তখন, তাহার জীবনের সমস্ত আস্পৃহা ভগবান ও অনন্তের প্রতি সর্ব্বাতিরেকী প্রেম এবং অপরিসীম ভক্তিতে পরিণত হয়। সেই নিত্য, সনাতন, অধ্যাত্ম, জীবন্ত, বিশ্বব্যাপী সত্য বস্তুতে মন অনন্য ভাবে আসক্ত হয়, সেই সত্য বস্তু ছাড়া তাহার কাছে আর কোন জিনিষেরই কোনও মূল্য থাকে না, একমাত্র সেই সর্ব্বানন্দময় পরম পুরুষেই সে পরম প্রীতি লাভ করে। যে সর্ব্বব্যাপী মহত্ত্ব, জ্যোতি, সৌন্দর্য্য, শক্তি ও সত্য আপন মহিমায় আপনাকে মানবাত্মার নিকটে প্রকাশিত করিয়াছে, তাঁহার গুণকীর্ত্তন করা এবং সেই

---

* মহাত্মনাস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ৯।১৩

পরম আত্মা ও অনন্ত পুরুষের উপাসনা করা, ইহাই হয় তখন সকল বাক্য, সকল চিন্তার একান্ত লক্ষ্য *। ভিতরের সত্তা সকল আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য এত কাল যে চেষ্টা করিয়াছে এখন সে-সব চেষ্টা অন্তরাত্মায় ভগবানকে পাইবার এবং প্রকৃতিতে ভাগবত ভাব বিকাশ করিবার অধ্যাত্ম সাধনা ও আস্পৃহাতে পরিণত হয়। সমস্ত জীবন হয় সেই ভগবানের সহিত এই মানবাত্মার নিত্যযোগ ও মিলন। ইহাই পূর্ণভক্তির ধারা; নিবেদিত হৃদয়ের উৎসর্গের দ্বারা উহা আমাদের সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতিকে নিত্য সনাতন পুরুষোত্তমের দিকে উহা একাগ্রভাবে তুলিয়া দেয়।

যাঁহারা জ্ঞানের উপরেই বেশী ঝোঁক দেন তাঁহারাও তাঁহাদের আত্মা ও প্রকৃতির উপর ভগবদ্ জ্ঞান, ভগবদ্দর্শনের যে নিত্য-বর্দ্ধন-শীল, সর্ব্বতোমুখী, অনতিক্রম্য প্রভাব তদ্দ্বারা সেই একই স্থানে উপনীত হন †। তাঁহাদের যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ, জ্ঞানের অনির্ব্বচনীয় আনন্দের দ্বারা তাঁহারা পুরুষোত্তমকে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হন, জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে। এই যে ব্যাপক জ্ঞান, সমগ্র সত্তাই ইহার যন্ত্র এবং অখণ্ড সমগ্রতাই ইহার লক্ষ্য। ইহা পরম সত্তাকে কেবল শূন্যময় ঐক্যে কিম্বা সকল সম্বন্ধের অতীত অনির্দ্দেশ্য সত্তারূপে চাওয়া নহে। ইহা হইতেছে সেই পরম ও বিশ্বপুরুষকে হৃদয়াবেগের

---

* সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥৯।১৪

† জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥৯।১৫

সহিত সন্ধান ও লাভ করা, ইহা হইতেছে অনন্তকে তাঁহার অনন্ততায় পাওয়া আবার যাহা কিছু সান্ত আছে সে-সবের মধ্যেও তাঁহাকে পাওয়া, এককে তাঁহার একত্বে দেখা ও আলিঙ্গন করা আবার তাঁহাকে তাহার সকল বিভিন্ন তত্ত্বে, তাঁহার অসংখ্য মূর্ত্তিতে, শক্তিতে, রূপে, এখানে, সেখানে, সর্ব্বত্র, কালাতীত অবস্থায় আবার কালের মধ্যে, বহুধা, তাঁহার ঈশ্বরত্বের অনন্তভাবে, অসংখ্য জীবে তাঁহাকে দেখা ও আলিঙ্গন করা,· একত্বেন, পৃথকৃত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্। সহজেই এই জ্ঞান হইয়া উঠে উপাসনা, উদার ভক্তি, বিশাল আত্মদান, সমগ্র আত্মসমর্পণ কারণ ইহা হইতেছে এমন এক আত্মার জ্ঞান, এমন সত্তার স্পর্শ, এমন এক পরম ও বিশ্বপুরুষের সহিত আলিঙ্গন, যিনি আমাদের সব-কিছুর উপরেই দাবি রাখেন, আবার আমরা যখন তাঁহার সমীপে যাই তিনি তাঁহার অনন্ত আনন্দলীলার সমস্ত সম্পদ আমাদের উপরে অবিরতধারে ঢালিয়া দেন।

কর্ম্মের পথও ভক্তি ও প্রেমপূর্ব্বক আত্মদানে পরিণত হয় কারণ ইহা হইতেছে আমাদের সকল ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম্ম পূর্ণভাবে সেই এক পুরুষোত্তমের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা। বেদের বাহ্যিক যজ্ঞানুষ্ঠান একটি শক্তিশালী রূপক, ইহার উদ্দেশ্য খুব উচ্চ না হইলেও, তাহা স্বর্গাভিমুখী; কিন্তু প্রকৃত যজ্ঞ হইতেছে ভিতরের, ইহাতে সর্ব্বময় ভগবান নিজেই হন যজ্ঞক্রিয়া, যজ্ঞ এবং যজ্ঞের প্রত্যেক আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান *। সেই অন্তর্যজ্ঞের সমস্ত ক্রিয়া ও রূপ হইতেছে আমাদের মধ্যে তাঁহারই শক্তির আত্মবিধান ও আত্মপ্রকাশ, সেই-যে শক্তি আমাদের আস্পৃহাকে আশ্রয় করিয়া

---

* অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥৯।১৬

আপন উৎসের দিকে উঠিয়া চলিয়াছে। অন্তর্য্যামী ভগবান নিজেই অগ্নি, নিজেই হব্য, অহমগ্নিরহং হুতম্, কারণ ঐ অগ্নি ভগবদ্‌মুখী ইচ্ছাশক্তি এবং এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের মধ্যে স্বয়ং ভগবান। আর ভগবানের যে রূপ ও শক্তি উপাদানস্বরূপ আমাদের প্রকৃতি ও সত্তায় বর্ত্তমান, তাহাই অগ্নিতে অর্পিত হব্য; ভগবানের নিকট হইতে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহা সমগ্রভাবেই আপনার সত্তার, আপনার পরম সত্য ও মূলের সেবায় ও পূজায় উৎসর্গ করা হয়। মনীষী ভগবান নিজেই হন পবিত্র মন্ত্র, মন্ত্র ভগবদ্‌মুখী চিন্তায় প্রকট ভাগবতসত্তারই জ্যোতি, ঐ চিন্তার নিগূঢ় তত্ত্ব-পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় শ্রুতবাক্যে ও মানুষের নিকট প্রকাশিত অনন্তের ছন্দে সেই মন্ত্র সজীব হইয়া উঠে। জ্ঞানময় ভগবান নিজেই বেদ, আবার বেদে যাহা কিছু জানা যায়, বেদ্য, তাহাও তিনি। তিনি জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ই। ঋক্, যজুঃ, সাম, যে জ্ঞানের বাণী মনকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে, যে শক্তির বাণী কর্ম্মকে যথার্থভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, যে শান্তি ও সুসমঞ্জস সিদ্ধির বাণী আত্মার দিব্যবাসনার তৃপ্তি আনিয়া দেয়, এই সবই ব্রহ্ম, সবই ভগবান।* দিব্যচৈতন্যের মন্ত্র জ্ঞানজ্যোতি অনিয়া দেয়, দিব্য শক্তির মন্ত্র কার্য্যকরী ইচ্ছা-শক্তি অনিয়া দেয়, দিব্য আনন্দের মন্ত্র জীবনে অধ্যাত্ম আনন্দের পূর্ণতা অনিয়া দেয়। সকল বাক্য ও চিন্তা মহান্ ওঁ-এরই পরিস্ফুরণ, ওঁ-ই সনাতন বাক্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বস্তুর রূপের মধ্যে প্রকটিত ওঁ, সকল বস্তু ও রূপ যে সৃজনশীল আত্মবিকাশরূপ চৈতন্য লীলার প্রকাশ তাহার মধ্যে প্রকটিত ওঁ, সকলের পশ্চাতে অনন্তের যে

---

* পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেবচ ॥৯।১৭

আত্মসমাহিত পরাচেতন শক্তি তাহার মধ্যে প্রকটিত ওঁ—ওঁ ই সকল বস্তু ও ভাবের, সকল নাম ও রূপের পরম উৎস, বীজ, আশয়,—ইহা নিজেই সমগ্রভাবে পরম স্পর্শাতীত সত্তা, আদি ঐক্য, কালাতীত পরম রহস্য, সকল ব্যক্তজগতের উর্দ্ধে বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে স্বপ্রতিষ্ঠিত *। অতএব এই যে যজ্ঞ, ইহা একই সঙ্গে কর্ম্ম ও ভক্তি ও জ্ঞান।

এইরূপে যে জানে, ভজনা করে, নিজের সমস্ত কর্ম্মকে এক পরম আত্মোৎসর্গে অনন্তের নিকট সমর্পণ করে; তাহার পক্ষে ভগবানই সব, এবং সবই ভগবান। সে ভগবানকে এই জগতের পিতা বলিয়া জানে, তিনি তাঁহার সন্তানগণকে পোষণ করিতেছেন, পালন করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন। সে ভগবানকে জগন্মাতা বলিয়া জানে, যিনি আমাদিগকে তাঁহার বুকের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের উপর তাঁহার প্রেমের মাধুরী অবিরতধারে বর্ষণ করিতেছেন এবং বিশ্বজগৎ তাঁহার দিব্য সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিতে ভরিয়া দিতেছেন। সে ভগবানকে এই জগতের আদি, প্রথম স্রষ্টিকর্ত্তা, পিতামহ বলিয়া জানে; দেশ, কাল ও সম্বন্ধের মধ্যে উৎপাদন ও সৃষ্টি করিতে যাহারা ব্রতী রহিয়াছে তাহারা সকলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূত। সে ভগবানকে সকল বিশ্বগত ও প্রত্যেক ব্যক্তিগত বিধানের ঈশ্বর ও বিধাতা বলিয়া জানে। যে মানুষ নিজেকে অনন্তের নিকট সমর্পণ করিয়াছে, জগৎ বা নিয়তি বা অনিশ্চয় সম্ভাবনা কোন কিছুই তাহাকে আর আতঙ্কিত করিতে

* ওঁ-অ, উ, ম্—অ, বাহ্য ও স্থূলের মূল সত্তা, বিরাট; উ, সূক্ষ্ম অভ্যন্তরীনের মূল সত্তা, তৈজস; ম্ নিগূঢ় পরাচেতন মহত্ত্বের সত্তা, প্রজ্ঞা; ওঁ,—সর্ব্বাতীত পরম বস্তু, তুরীয়।

—মাণ্ডুক্যোপনিষদ্

পারে না; দুঃখ ও অশুভ দেখিয়া সে আর বিভ্রান্ত হয় না। যাহার দৃষ্টি আছে তাহার পক্ষে ভগবানই পথ এবং ভগবানই গতি, গন্তব্য-স্থল, ণ সে পথে নিজেকে হারাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই; সেই গন্তব্যের দিকে তাহার সদ্‌বুদ্ধি-পরিচালিত পদক্ষেপ প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে নিশ্চিতভাবেই লইয়া যায়। সে জানে ভগবান তাহার এবং সকলের প্রভু, তাহার প্রকৃতির আধার, প্রাকৃত-জীবের পতি, প্রণয়ী, ভর্ত্তা, তাহার সকল চিন্তা ও কর্ম্মের অন্তর্য্যামী সাক্ষী। ভগবানই তাহার আবাস, তাহার গৃহ ও স্বদেশ, তাহার আশা আকাঙ্ক্ষার আশ্রয়স্থল, সকল জীবের জ্ঞানী অন্তরঙ্গ হিতৈষী বন্ধু। দৃশ্য জগতের সকল সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তাহার দৃষ্টি ও অনুভূতিতে সেই একেরই খেলা; চিরন্তন পুনরাবর্ত্তনলীলায় পুনঃপুনঃ তিনি নিজের আত্মপ্রকাশকে দেশ ও কালে প্রকট করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন আবার প্রত্যাহার করিতেছেন। একমাত্র তিনিই অবিনাশী বীজ, যাহা-কিছুর উৎপত্তি ও ধ্বংস হইতেছে বলিয়া মনে হয় তিনি সে-সবের মূল, আবার অব্যক্ত অবস্থায় সে-সব তাঁহার মধ্যেই চির-বিশ্রাম লাভ করে, নিধানং বীজমব্যয়ম্। সূর্য্য ও অগ্নির তাপের ভিতর দিয়া তিনিই উত্তাপ প্রদান করেন; তিনিই বর্ষার প্রাচুর্য্য আবার তিনিই শোষণ; এই জড়প্রকৃতি এবং ইহার সমুদয় ক্রিয়া তিনিই।* মৃত্যু তাঁহার মুখস্, এবং অমৃতত্ব তাঁহার আত্মপ্রকাশ। যাহা কিছু আমরা আছে বলি, সৎ, সে-সবই তিনি, আবার

---

* গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥৯।১৮
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥৯।১৯

যাহা কিছু নাই, অসৎ, বলিয়া আমরা মনে করি সে-সবও গুপ্ত-ভাবে অনন্তের মধ্যে বিরাজমান এবং অনির্ব্বচনীয় ভগবানের পরম রহস্যময় সত্তার অংশভূত।

উচ্চতম জ্ঞান ও ভক্তি ব্যতীত, যিনিই সব সেই পরম পুরুষের নিকট পূর্ণ আত্মদান ও সমর্পণ ব্যতীত আর কিছুই আমাদিগকে সেই পরম পুরুষের নিকট লইয়া আসিতে পারিবে না। অন্য ধর্ম্ম, অন্য উপাসনা, অন্য জ্ঞান, অন্য সাধনা সকল সময়েই যথাযথ ফল প্রদান করে, কিন্তু এ-সব ফল ক্ষণস্থায়ী, ভগবানের প্রতীক ও আভাসের উপভোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমাদের মানসিক অবস্থানুযায়ী সকল সময়েই আমাদের সন্মুখে দুইটি পথ খোলা আছে, বাহ্যিক জ্ঞান বা অন্তরতম জ্ঞান, বাহ্যিক সাধনা বা নিগূঢ় অন্তরতম সাধনা। বাহ্যিক ধর্ম্ম হইতেছে বাহিরের কোনও দেবতাকে ভজনা করা এবং বাহ্যিক কোনও সুখময় অবস্থা প্রার্থনা করা: এই পথের সাধকেরা তাহাদের চরিত্রকে নির্ম্মল পাপশূন্য করে, এবং শাস্ত্রের বাহ্য বিধান পালন করিবার জন্য নৈতিক ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করে; তাহারা প্রতীক-স্বরূপ বাহ্যিক যোগের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে *। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে পার্থিক জীবনের অনিত্য

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুন্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥৯।২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥৯।২১

নশ্বর সুখ দুঃখের অন্তে স্বর্গলোকের আনন্দলাভ করা, সে-সুখ পৃথিবীর সুখের চেয়ে মহত্তর কিন্তু তথাপি তাহা ব্যক্তিগত ও লৌকিক ভোগ, যদিও সে লোক এই ক্ষুদ্র দুঃখময় পৃথিবীর অপেক্ষা বড়। আর এই যে-ভোগ তাহারা কামনা করে, শ্রদ্ধা ও সদাচারের দ্বারা তাহারা তাহা প্রাপ্ত হয়, কারণ কেবল এই জড়জীবন এবং এই পার্থিব সংসারলীলাই আমাদের ব্যক্তিগত সম্ভাবনার চরম নহে বা বিশ্বজগতের সমগ্র ধারা নহে। অন্যান্য লোক ও জগৎও আছে এবং সে-সব পৃথিবী হইতে আরও বিশালতর সুখের ক্ষেত্র, স্বর্গলোকং বিশালম্। এইরূপে প্রাচীন কালের বৈদিক আনুষ্ঠানিক বেদত্রয়ের বহিরঙ্গ অর্থ আয়ত্ত করিতেন, পাপ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতেন, দেবতাদের সহিত যোগের মদিরা সোম পান করিতেন, এবং যজ্ঞ ও সৎকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গফল প্রার্থনা করিতেন। পরলোকে এই দৃঢ়বিশ্বাস এবং এক দিব্যতর লোকে গমনের আকাঙ্ক্ষা জীবকে এমন শক্তি দেয় যাহার দ্বারা সে মৃত্যুর পর তাহার শ্রদ্ধা ও আকাঙ্ক্ষার একান্ত লক্ষ্য-স্বরূপ স্বর্গের ভোগ লাভ করিতে পারে; কিন্তু আবার এই মর্ত্ত্য জীবনেই তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়, কারণ এই জীবনের যে সত্য লক্ষ্য সেইটির সন্ধান বা সিদ্ধি সে লাভ করিতে পারে নাই। অন্য কোথাও নহে, এইখানেই সর্ব্বোত্তম ভগবানকে লাভ করিতে হইবে, অপূর্ণ জড় মানবীয় প্রকৃতি হইতেই জীবের দিব্য প্রকৃতির বিকাশ করিতে হইবে, এবং ভগবান ও মানব ও বিশ্বের সহিত ঐক্যের ভিতর দিয়া জীবনের সমগ্র বিশাল সত্যকে জানিতে হইবে, সেই সত্য অনুসারে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেন জীবনের মাঝেই তাহার অত্যাশ্চর্য্য প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইভাবেই

আমাদের দীর্ঘ পুনরাবর্ত্তন-চক্রের পরিসমাপ্তি হইবে এবং আমরা এক পরম সিদ্ধির অধিকারী হইব; মানবজন্মে জীবকে এই সুযোগই দেওয়া হইয়াছে এবং যতক্ষণ না ইহা সম্পন্ন হইতেছে ততক্ষণ জন্ম জন্মান্তরের শেষ কিছুতেই হইতে পারে না। বিশ্বজগতে আমাদের জন্মের এই যে চরম প্রয়োজন, তাহার সিদ্ধির জন্য ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি একান্ত প্রেম ও ভক্তির ভিতর দিয়া সর্ব্বদা সেই উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হয়, সেই ভক্তির দ্বারা পরম বিশ্বপুরুষকেই সে তাহার জীবনের সমগ্র লক্ষ্য করে,—এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র অহং এর ভোগ বা স্বর্গভোগকে নহে; পরম বিশ্বপুরুষকেই সে তাহার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত জ্ঞানের সমগ্র লক্ষ্য করে ঃ ভগবান ব্যতীত আর কিছুই না দেখা, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া থাকা, সকল জীবের মধ্যে তাঁহাকে ভালবাসা এবং সকল বস্তুতে তাঁহারই আনন্দ গ্রহণ করা,—ইহাই হয় তাহার অধ্যাত্মজীবনের সমগ্র স্বরূপ। তাহার ভগবদ্দর্শন তাহাকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করে না, অথবা জীবনের পূর্ণতার বিন্দুমাত্র হইতেও সে বঞ্চিত হয় না; কারণ ভগবান আপনা হইতেই তাহাকে সকল কল্যাণ, সকল যোগক্ষেম * আনিয়া দেন, যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। সে যাহা পায়, স্বর্গের সুখ বা পৃথিবীর সুখ তাহার সামান্য ছায়া মাত্র, কারণ সে যেমন ভাগবতভাবে গড়িয়া উঠে, তেমনই ভগবানও তাঁহার অনন্তজীবনের অজস্র জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ লইয়া তাহার মধ্যে নামিয়া আসেন।

ঃ অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ৯।২২

যে-সব বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ নাই তাহাদের প্রাপ্তিকে যোগ বলা যায়, এবং সেই লব্ধ সম্পদ রক্ষাই ক্ষেম।—অনুবাদক

সাধারণ ধর্ম্ম হইতেছে আংশিক দেবগণের পূজা, পূর্ণ ভগবানের পূজা নহে। পুরাতন বৈদিক ধর্ম্মের যে বহিরঙ্গ দিক তখন বিকশিত হইয়াছিল তাহা হইতেই গীতা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছে; গীতা এই বহিরঙ্গের উপসনাকে বলিয়াছে অন্যদেবতার প্রতি যজ্ঞ*; অন্যদেবতা যথা দেবান্, পিতৃন্, ভূতানি। মানুষ ভগবানের আংশিক শক্তি বা ভাবসকলকে যেমন দেখে বা ধারণা করে সেই সবের নিকটেই সাধারণতঃ তাহাদের জীবন ও কর্ম্মকে উৎসর্গ করে,—মানুষ বা প্রকৃতির মধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান জিনিষ সহজেই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রধানতঃ সেই সবের অন্তর্দেবতারূপে অধিষ্ঠিত শক্তি ও ভাব সকলের উপাসনা তাহারা করিয়া থাকে, অথবা যে সব শক্তি ও ভাব উচ্চ দিব্য প্রতীকের ভিতর দিয়া তাহাদের নিজেদের মানবীয়তাকেই প্রতিফলিত করে সেই সবের পূজা করিয়া থাকে। যদি তাহারা শ্রদ্ধার সহিত ইহা করে, তবে তাহাদের সে শ্রদ্ধা সার্থক হয়; কারণ ভক্তের মনে ভগবানের যে প্রতীক, রূপ বা কল্পনা বর্ত্তমান থাকে, ভগবান তাহাই স্বীকার করেন, যং যং তনুম্ শ্রদ্ধয়া অর্চ্চতি, এবং তাহার মধ্যে যেরূপ শ্রদ্ধা আছে তদনুসারেই তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন। সকল আন্তরিক ধর্ম্মবিশ্বাস ও উপাসনা বস্তুতঃ সেই এক পরম বিশ্বপুরুষেরই উপাসনা; কারণ তিনিই মানুষের সকল যজ্ঞ ও তপস্যার প্রভু, তাহার সকল সাধনা ও উপাসনার অনন্ত ভোক্তা‡। পূজার ধরন-

* যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥৯ ২৩

‡ অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥৯।২৪

ধারণ যতই ছোট বা নীচ হউক, আত্মদান ও শ্রদ্ধা যতই অপূর্ণ হউক, নিজের অহংকে পূজা ও সেবা করিবার মায়া ও জড় প্রকৃতির বন্ধন ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা যতই সামান্য হউক, তবু ইহার দ্বারাই মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং একটা সাড়াও পাওয়া যায়। তথাপি জ্ঞান, শ্রদ্ধা ও অর্পণ যেমনটী হয় ঐ সাড়াও তদনুরূপই হয়, সেই পূজা-উপাসনার ফলপ্রাপ্তি তদনুযায়ীই হয়, এ-সবের সীমাকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং একমাত্র যে মহত্তর ভগবদ্‌জ্ঞান জীবনলীলার সমগ্র সত্য দিতে পারে তাহার সহিত তুলনায় এই নীচের পূজা যজ্ঞের সত্য ও উচ্চতম বিধি অনুসারে অর্পিত হয় না। পরম ভগবদ্‌পুরুষকে তাঁহার সমগ্র সত্তায় ও তাঁহার আত্মবিকাশের সকল তত্ত্বে যে জানা সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ভিত্তির উপর এই অর্পণ প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা শুধু বহিরঙ্গের ও আংশিক আভাসের উপরেই অনুরক্ত, ন মাং অভিজানন্তি তত্ত্বতঃ। সেই জন্য এই যজ্ঞের উদ্দেশ্যও পরিচ্ছিন্ন; প্রধানতঃ অহং এর সেবাই ইহার লক্ষ্য, ইহার ক্রিয়া ও অর্পণ আংশিক ও ভ্রান্ত, যজন্তি অবিধিপূর্ব্বকম্। সজ্ঞানে সমগ্রভাবে আত্মসমর্পন করিতে হইলে চাই ভগবানকে সমগ্রভাবে দর্শন করা; নতুবা কেবল অপূর্ণ ও আংশিক জিনিষই পাওয়া যায় এবং সে-সবকে ছাড়াইয়া উঠিতে না পারিলে মহত্তর সাধনা ও প্রশস্ততর ভগবদ্ উপলব্ধির মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিতে পারা যায় না। কিন্তু যাহারা পরম বিশ্বপুরুষকেই একান্ত ও সমগ্রভাবে অনুসরণ করে, তাহারা অন্যান্য সাধনালব্ধ সমস্ত জ্ঞান ও ফল লাভ করে, কিন্তু কোনও এক বিশেষ ভাবের মধ্যে বদ্ধ হয় না, যদিও সকল ভাবের মধ্যেই ভগবান সম্বন্ধে কি সত্য আছে তাহা তাহারা দেখিতে পায়। এই সাধনা পরম পুরুষোত্তমের দিকে

যাইবার পথে ভগবানের সমস্ত ভাব, সমস্ত রূপকেই আলিঙ্গন করে ❋।

যে ভক্তি গীতা-কৃত সমন্বয়ের চূড়া, এই পূর্ণতম আত্মদান, এই ঐকান্তিক আত্মসমর্পণই সেই ভক্তি। সমস্ত কর্ম্ম ও চেষ্টা এই ভক্তির দ্বারা পরম বিশ্বপুরুষের নিকট অর্পণে পরিণত হয় *। "তুমি যে কর্ম্ম কর, যাহা ভোগ কর, যে যজ্ঞ কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর সে সকলই আমাতে অর্পণ কর।" এইরূপে জীবনের ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম ঘটনা, নিজ হইতে বা নিজের যাহা কিছু তাহা হইতে নিতান্ত মূল্যহীন দান, ক্ষুদ্রতম কর্ম্ম—সমস্তই তখন এক দিব্য সার্থকতা লাভ করে, সে অর্পণ ভগবানের গ্রহণ-যোগ্য হয়, সেইটিকেই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি ভগবদ্ভক্তের আত্মা ও জীবনকে অধিকার করেন। বাসনা ও অহং কর্ত্তৃক সৃষ্ট সমস্ত ভেদ তখন দূর হয়। কর্ম্মের শুভ ফল লাভ করিবার জন্য উদ্বেগ থাকে না, অশুভ ফল এড়াইবার চেষ্টা থাকে না, কিন্তু সকল কর্ম্ম ও সকল ফল সেই পরম পুরুষে সমর্পণ করা হয় যিনি জগতের সমস্ত কর্ম্ম ও সমস্ত ফলের চির-অধিকারী, সুতরাং আর

❋ যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥৯।২৫

* পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতম্ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥৯।২৬-২৮

কর্ম্মবন্ধন থাকে না। কারণ পূর্ণতম আত্মসমর্পনের দ্বারা সমস্ত অহংমুখী বাসনা হৃদয় হইতে দূর হইয়া যায় এবং জীব অভ্যন্তরীন সন্ন্যাসের দ্বারা স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া ভগবানের সহিত পূর্ণভাবে যুক্ত হয়। সকল ইচ্ছা, সকল কর্ম্ম, সকল ফল ভগবানের হয়, শুদ্ধ ও বুদ্ধ প্রকৃতির ভিতর দিয়া দিব্যভাবে ক্রিয়া করে, সে-সব আর সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত অহংএর থাকে না। সীমাবদ্ধ প্রকৃতি এইভাবে সমর্পিত হইলে অসীমের মুক্ত অবাধ যন্ত্র হয়; জীব তাহার অধ্যাত্ম সত্তা লইয়া অজ্ঞান ও সীমাবন্ধন হইতে উঠিয়া দাঁড়ায়, অনন্তের সহিত তাহার ঐক্যে ফিরিয়া যায়। সনাতন ভগবান জগতের সকল বস্তুর মধ্যেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; তিনি সর্ব্বভূতে সমান এবং সমানভাবে সকল জীবের বন্ধু, পিতা, মাতা, স্রষ্টা, প্রণয়ী, ভর্ত্তা *। তিনি কাহারও শত্রু নহেন, কাহারও প্রতি তাঁহার পক্ষপাতী প্রেম নাই, কাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করেন নাই, কাহাকেও তিনি চিরকালের জন্য দণ্ডিত করেন নাই। বিনাকারণে খেয়ালী স্বেচ্ছাচারিতার বশে তিনি কাহাকেও কৃপা দেখান নাই; অজ্ঞান মায়ার মধ্যে ঘোরাঘুরি শেষ হইলে শেষপর্য্যন্ত সকলে সমানভাবে তাঁহার নিকট উপনীত হয়। কিন্তু কেবল এই পূর্ণতম ভক্তির দ্বারাই মানুষের মধ্যে ভগবানের বাস এবং ভগবানের মধ্যে মানুষের বাস সম্বন্ধে সজ্ঞান সচেতন হওয়া যায় এবং তাহা সর্ব্বোতোমুখী পূর্ণতম মিলনে পরিণত হয়। উচ্চতম ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের যে প্রেম, তাহার দ্বারাই সর্ব্বোপেক্ষা সরল পথে ও সত্বরে ভাগবত ঐক্যে পৌঁছিতে পারা

* সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥৯।২৯

যায়। আমাদের সকলের মধ্যে সমান ভাবে যে ভগবান অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন তিনি প্রথমতঃ আর কিছুই চাহেন না, যদি এই সমগ্র আত্মসমর্পণ শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা ও পরিপূর্ণতার সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। সকলের পক্ষেই এই দ্বার উন্মুক্ত, সকলেই এই মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে; সেই বিশ্বপ্রেমিকের আলয়ে আমাদের লৌকিক ভেদবৈষম্য সমস্ত দূর হইয়া যায়। সেখানে পুণ্যবানকে বেশী আদর করা হয় না, পাপীকে ভগবদ্‌সান্নিধ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় না; এই পথ দিয়া পুণ্যবান সদাচারী ব্রাহ্মণ এবং অস্পৃশ্য পাপজন্মা চণ্ডাল সকলে এক সঙ্গেই যাইতে পারে এবং দেখিতে পায় যে, চরম মুক্তি ও অনন্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীবনলাভের দ্বার সকলের পক্ষেই সমান ভাবে উন্মুক্ত। ভগবানের সম্মুখে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই সমান অধিকার; কারণ পরমাত্মা ব্যক্তিত্বের বা সামাজিক ভেদাভেদের কোনও খাতির করেন না; সকলেই সোজাভাবে তাঁহার নিকট যাইতে পারে, সেজন্য কোনও মধ্যস্থতার, কোনও বাধাসূচক সর্ত্তপূরণের প্রয়োজন হয় না। গুরু ভগবান, বলিলেন, * "অত্যন্ত দুরাচারও যদি অনন্যভাক্ হইয়া আমাকে ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকে সাধু বলিয়াই বিবেচনা করা উচিত, কারণ সে-ব্যক্তির সাধনায় যে অবিচলিত সঙ্কল্প তাহা সত্য ও অখণ্ড। সে ব্যক্তি শীঘ্রই

---

* অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৯।৩০,৩১

ধর্ম্মাত্মা হইয়া উঠে এবং চিরশান্তি প্রাপ্ত হয়।” অন্য কথায়, পূর্ণ আত্মসমর্পনের যে সুদৃঢ় সঙ্কল্প তাহা আত্মার সকল দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় এবং প্রতিদানে লইয়া আসে মানুষের নিকট ভগবানের পূর্ণ অবতরণ ও আত্মদান, এবং তাহাই আমাদের নীচের প্রকৃতিকে দ্রুত দিব্যপ্রকৃতিতে রূপান্তরিত করিয়া আমাদের আধারের সকল অংশকে দিব্যজীবনের আদর্শে অবিলম্বে গড়িয়া তুলে। আত্ম-সমর্পণের ইচ্ছার যে শক্তি তাহা ভগবান ও মানুষের মধ্যস্থিত,-মায়ার আবরণ ঘুচাইয়া দেয়, ইহা সকল ভ্রান্তিকে নাশ করে, সকল বাধাকে ধ্বংস করে। যাহারা নিজেদের মানবীয় শক্তিতে জ্ঞান পুণ্যকর্ম্ম বা কৃচ্ছ আত্মসংযমের দ্বারা উর্দ্ধগতি লাভ করিতে চায়, তাহারা অতিকষ্টে সাতিশয় সংশয়ের সহিত অনন্তের দিকে অগ্রসর হয়; কিন্তু মানুষ যখন নিজের অহংকে, নিজের সমস্ত কর্ম্মকে ভগবানে সমর্পণ করে তখন ভগবান নিজে আমাদের কাছে আসেন এবং আমাদের ভার গ্রহণ করেন। অজ্ঞানীকে তিনি দিব্যজ্ঞানের আলোক আনিয়া দেন, দুর্ব্বলকে তিনি ভাগবত ইচ্ছা শক্তির বল আনিয়া দেন, পাপীকে তিনি দিব্য পবিত্রতার মুক্তি আনিয়া দেন, দীন দুঃখীকে তিনি অনন্ত অধ্যাত্ম সুখ ও আনন্দ আনিয়া দেন। তাহাদের দুর্ব্বলতায়, তাহাদের মানবীয় শক্তির ত্রুটি বিচ্যুতিতে কিছুই আসিয়া যায় না। ভগবান বলিতেছেন, “নিশ্চয় জেনো, অর্জ্জুন, আমাকে যে ভালবাসে তাহার বিনাশ নাই।” পূর্ব্ব চেষ্টা ও উদ্যোগ, ব্রাহ্মণের শুচিতা ও পুণ্য, কর্ম্মে ও জ্ঞানে মহান্ রাজর্ষির জ্ঞানদীপ্ত শক্তি, এ-সবেরই মূল্য আছে কারণ দুর্ব্বল অপূর্ণ মানুষের পক্ষে এই উদার দৃষ্টি ও আত্মসমর্পণে উপনীত হওয়া এই সবের দ্বারা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, কিন্তু এরূপ উদ্যোগ না

শ্রীঅরবিন্দের গীতা

চতুর্থ খণ্ড

(শ্রীঅরবিন্দের Essays on the Gita হইতে অনূদিত)
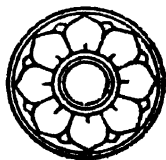
ডি, এম্, লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সূচীপত্র

১। গীতার পরম বাক্য ১

২। বিভূতিরূপে ভগবান ৩২

৩। বিভূতি তত্ত্ব ৫০

৪। বিশ্বরূপ দর্শন (১) ৬৯

৫। বিশ্বরূপ দর্শন (২) ৯২

৬। পথ ও ভক্ত ১০৭

শ্রীঅরবিন্দের গীতা

—:*:—

গীতার পরম বাক্য

এখন আমরা গীতোক্ত যোগের অন্তরতম সারাংশে, উহার শিক্ষার সমগ্র জীবন্ত কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছি। এখন আমরা অতি স্পষ্টভাবেই দেখিতে পাইতেছি যে, সীমাবদ্ধ মানবাত্মা যখন অহং ও নীচের প্রকৃতি হইতে নিবৃত্ত হইয়া শান্ত, নীরব, অচল-প্রতিষ্ঠ অক্ষর আত্মার মধ্যে উঠে, সে ঊর্দ্ধগতি কেবল একটা প্রথম ধাপ, একটা প্রারম্ভিক পরিবর্ত্তন মাত্র। আর এখন আমরা ইহাও বুঝিতে পারিতেছি, কেন গীতা প্রথম হইতেই ঈশ্বরের উপরে, মানবরূপী ভগবানের উপরে এত ঝোঁক দিয়াছে; তিনি সর্ব্বদাই নিজেকে লক্ষ্য করিয়া (অহং, মাম্) এমনভাবে কথা বলিতেছেন যেন তিনি এক মহান্ গুহ্য ও সর্ব্বব্যাপী সত্তা, জগৎ-সকলের ঈশ্বর, মানবাত্মার প্রভু; এমন কি প্রাকৃত বিশ্ব-জগতের আন্তরিক ও বাহ্যিক বিষয়সমূহ যাহাকে কখন স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সেই চির-শান্ত, অবিচল, অক্ষর, স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা অপেক্ষাও মহত্তর।

সকল যোগই হইতেছে ভগবানের সন্ধান, অনন্তের সহিত মিলনের প্রয়াস। ভগবান ও অনন্ত সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি যত পূর্ণ হয়, তদনুযায়ীই হয় সেই সন্ধানের ধারা, সেই মিলনের গভীরতা ও পূর্ণতা এবং সেই সিদ্ধির সমগ্রতা। মানুষ মনোময় পুরুষ, তাহাকে তাহার সান্ত মনের ভিতর দিয়াই অনন্তের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়, এই সান্তেরই কোন সন্নিহিত দ্বার অনন্তের দিকে খুলিয়া ধরিতে হয়। সে এমন কোনও পরিকল্পনার সন্ধান করে যেটিকে তাহার মন ধরিতে পারে, তাহার প্রকৃতির এমন কোনও শক্তিকে সে বাছিয়া লয় যাহা নিজেকে পরমে উন্নীত করিয়া অনন্ত সত্যের দিকে প্রসারিত হইতে পারে, তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে, যে সত্যের স্বরূপ তাহার মনের ধারণার অতীত সত্য অনন্ত, সেই জন্যই তাহার আছে অগণ্য মুখ, তাহার অর্থের অগণ্য বাক্য, অগণ্য ব্যঞ্জনা, সেই অনন্ত সত্যের কোনও একটি মুখকে সে দেখিবার চেষ্টা করে, যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ অনুভূতির ভিতর দিয়া, সেইটি যাহার একটি রূপ সেই অপরিমেয় সত্যে সে পৌঁছিতে পারে। সে দ্বার যতই সঙ্কীর্ণ হউক, যদি তাহা তাহার আকাঙ্ক্ষিত অনন্ততার দিকে কতকটা দৃষ্টি খুলিয়া দেয়, তাহার আত্মাকে যে আহ্বান করিয়াছে তাহার অপরিসীম গভীরতা ও দুরারোহ শিখরের দিকে তাহাকে পথ দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলেই সে পরিতুষ্ট হয়। আর যে-ভাবে সে তাহার দিকে অগ্রসর হয়, সেও তাহাকে সেইভাবেই গ্রহণ করে, যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে।

দার্শনিক চিন্তাশীল মন ব্যতিরেকী (Abstractive) জ্ঞানের দ্বারা অনন্তে পৌঁছিতে চায়। জ্ঞানের কার্য্য—অবধারণ করা, আর সান্ত বুদ্ধির

পক্ষে ইহার অর্থ হইতেছে বিশেষ লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করা, সীমা-নির্দ্ধারণ করা। কিন্তু অনির্দ্দেশ্য বস্তুকে নির্দ্দেশ করিবার একমাত্র পন্থা হইতেছে কোন প্রকার সর্ব্বতোমুখী নেতি নেতি। অতএব আমাদের ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হয় এমন সকল জিনিষকেই মন অনন্তের পরিকল্পনা হইতে বাদ দিতে অগ্রসর হয়। আত্মা ও অনাত্মাকে সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া দেখা হয়; এক শাশ্বত অক্ষর অনির্দ্দেশ্য স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা ও সকল সৃষ্ট জিনিষ, ব্রহ্ম ও মায়া, অনির্ব্বচনীয় সদ্বস্তু ও যাহা কিছু তাহাকে প্রকট করিতে চাহিতেছে কিন্তু পারিতেছে না,—এই সবকে পরস্পরের বিরোধী বলিয়া গণ্য করা হয়; কর্ম্ম ও নির্ব্বাণ, একদিকে বিশ্ব-শক্তির অবিরত অথচ চির-পরিবর্ত্তনশীল কর্ম্মধারা, অন্যদিকে এক অনির্ব্বচনীয় পরম নিষ্ক্রিয়তা, যেখানে কোনও জীবন নাই, মনোবৃত্তি নাই, কর্ম্মের আর কোনই উপযোগিতা নাই,—ইহাদিগকে সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া ধারণা করা হয়। শাশ্বতের দিকে জ্ঞানের এই প্রবল বেগ মানুষকে অনিত্য ও অস্থায়ী সব কিছু হইতেই সরাইয়া লইয়া যায়। জীবনের উৎসে ফিরিবার জন্য উহা জীবনকেই অস্বীকার করে, আমরা যে রূপে প্রতীয়মান হই সে সমস্তই বর্জ্জিত করা হয়, যেন ইহাদের উপরে আমাদের সত্তার যে নামরূপের অতীত সত্য সেখানে পৌছিতে পারা যায়। হৃদয়ের বাসনা, ইচ্ছাশক্তির কর্ম্ম, মনের পরিকল্পনা সবই বর্জ্জিত হয়; এমন কি পরিশেষে জ্ঞানও পরম অজ্ঞেয় ও নির্ব্বিশেষ সত্তার মধ্যে নির্ব্বাপিত, নিমজ্জিত হইয়া যায়। এই যে ক্রমবর্দ্ধমান নিবৃত্তি ও নিশ্চেষ্টতার পথ শেষ পর্য্যন্ত চরম নিষ্ক্রিয়তায় লইয়া যায়, ইহার দ্বারা মায়া-সৃষ্ট আত্মা, অথবা যে সংস্কার-সমষ্টিকে

আমরা "আমরা" বলিয়া অভিহিত করি, নিজের ব্যক্তিত্বভাবের লয় সাধন করে, জীবন-রূপ মিথ্যার অবসান করে, নির্ব্বাণের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কিন্তু এই যে আত্ম-নির্ব্বাণের কঠিন ব্যতিরেকী প্রণালী, ইহা দুই চারিজন অসাধারণ প্রকৃতির লোককে আকৃষ্ট করিলেও, মানুষের মধ্যে দেহধারী আত্মাকে সর্ব্বত্র তৃপ্ত করিতে পারে না, কারণ পূর্ণতম শাশ্বতের অভিমুখে যাইবার জন্য তাহার বহুমুখী প্রকৃতির মধ্যে যে প্রবল আগ্রহ রহিয়াছে, ইহা সে-সবকে কোনও পথ দেখাইয়া দেয় না। কেবল তাহার ব্যতিরেকী ধ্যানী বুদ্ধিই নহে, তাহার পিপাসু হৃদয়, তাহার কর্ম্মপর ইচ্ছা, তাহার যে ব্যবহারিক মন এমন কোনও সত্যের সন্ধান করিতেছে তাহার নিজের জীবন এবং বিশ্বের জীবন যাহার বিচিত্র প্রকাশ,—এই সবেরই আছে শাশ্বত ও অনন্তের দিকে যাইবার প্রয়াস, তাহার মধ্যেই তাহাদের দিব্য উৎস এবং তাহাদের জীবন ও প্রকৃতির সার্থকতা তাহারা পাইতে চায়। এই প্রয়োজন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ভক্তিমূলক ও কর্ম্মমূলক ধর্ম্মসকল, তাহাদের শক্তি হইতেছে এই যে, তাহারা আমাদের মানবতার সর্ব্বাপেক্ষা সক্রিয় ও বিকশিত বৃত্তিসকলকে তৃপ্ত করে, ভগবানের দিকে লইয়া যায়, কারণ ইহাদিগকে লইয়া আরম্ভ করিয়াই জ্ঞান ফলপ্রসূ হইতে পারে। এমন কি বৌদ্ধধর্ম্ম আভ্যন্তরীণ আত্মা ও বাহ্য বস্তু উভয়কেই কঠোর ও অকুণ্ঠভাবে "নেতি" করা সত্ত্বেও নিজেকে প্রথমতঃ কর্ম্মের দিব্য সাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং ভক্তির স্থলে এক সার্ব্বজনীন প্রেম ও অনুকম্পার অধ্যাত্ম ভাবালুতা আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, কারণ কেবল এই ভাবেই তাহার পক্ষে

মানবজাতির জন্য এক সিদ্ধিপ্রদ পন্থা হওয়া, এক বস্তুতঃ মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। এমন কি মায়াবাদ যে অতিমাত্রায় যুক্তিতর্কের অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম ও মানসিক সৃষ্টিসকলের প্রতি তীব্র অসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছে, সেও মানুষকে, বিশ্বকে এবং বিশ্বে ভগবানকে একটা সাময়িক ও ব্যবহারিক সত্তা দিতে বাধ্য হইয়াছে যেন প্রথমে দাঁড়াইবার মত একটা স্থান, ধরিবার মত একটা সূত্র পাওয়া যায়; মানুষের বন্ধন এবং তাহার মুক্তির সাধনাকে কতকটা বাস্তবতা দিবার জন্য মায়াবাদ যেটিকে অস্বীকার করে সেইটিকেই স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

কিন্তু কর্ম্মমুখী ও হৃদয়াবেগমূলক ধর্ম্মসমূহের দুর্ব্বলতা এই যে, তাহারা ভগবানের কোনও একটি বিশেষ ব্যক্তিরূপে এবং সান্তেরই দিব্য ভাবসকলে অতিমাত্রায় নিমগ্ন হইয়া যায়। আর যদি কখনও তাহাদের অনন্ত ভগবদ্‌সত্তা সম্বন্ধে কোনও পরিকল্পনা থাকে, তাহারা আমাদিগকে জ্ঞানের পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না, কারণ তাহারা ইহার পরম ও ঊর্দ্ধতম পরিণতি পর্য্যন্ত যাইতে চাহে না। শাশ্বতের মধ্যে যে পূর্ণ নিমজ্জন এবং একাত্মতার দ্বারা পূর্ণতম মিলন, এই সকল ধর্ম্ম ততদূর পর্য্যন্ত যায় না, —অথচ, সেই একাত্মতাতে মানবাত্মাকে একদিন পৌঁছিতেই হইবে, যদি নেতিমূলক পন্থায় না হয়, যে কোনও উপায়ে, কারণ সেইখানেই রহিয়াছে সকল একত্বের ভিত্তি। অন্যপক্ষে, শুধু ধ্যানপরায়ণ নিবৃত্তিমূলক আধ্যাত্মিকতার দুর্ব্বলতা হইতেছে এই যে তাহা এই পরিণতিতে উপস্থিত হয় অতিরিক্ত নেতির দ্বারা, এবং শেষকালে তাহা মানবাত্মাকে একটা অবস্তু বা মিথ্যা কল্পনামাত্র করিয়া তোলে, অথচ বরাবর এই আত্মার আকাঙ্ক্ষার জন্যই ঐ মিলন প্রয়াস, নতুবা তাহার কোন অর্থই থাকে না

কারণ আত্মাকে এবং আত্মার আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়িয়া দিলে মুক্তি ও মিলন সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই চিন্তাধারা মানবজীবনের অন্যান্য শক্তিকে যতটুকু স্বীকার করে, তাহাকে সে প্রথম অবস্থায় নিম্নতর ক্রিয়ার জন্য রাখিয়া দেয়, শাশ্বত ও অনন্তের মধ্যে আসিয়া সে-ক্রিয়া কখনই কোন পূর্ণ বা সন্তোষজনক পরিণতি লাভ করিতে পায় না। অথচ এই যে সব জিনিষকে তাহা অসঙ্গতভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে, —সমর্থ ইচ্ছাশক্তি, প্রেমের তীব্র আবেগ, সচেতন মানস সত্তার ব্যবহারিক দৃষ্টি ও সর্ব্বতোমুখী সাক্ষাতোপলব্ধি, এ-সবও আসিয়াছে ভগবান হইতে, তাহারা ভগবানেরই মূল শক্তিসকলের প্রতিরূপ, তাহাদের উৎপত্তিস্থলে তাহাদের একটা সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে, এবং ভগবানেরই মধ্যে তাহাদের পূর্ণতালাভের একটা জীবন্ত সাধনাও আছে। তাহাদের চূড়ান্ত দাবী পূরণ না করিলে কোনও ভগবদ্‌জ্ঞানই সমগ্র, পূর্ণ বা সর্ব্বতোভাবে সন্তোষজনক হইতে পারে না। ভগবদ্ সত্তার এই সকল ভাবের পিছনে যে অধ্যাত্ম বস্তু রহিয়াছে, বৈরাগ্যমুখী জিজ্ঞাসার সঙ্কীর্ণতায় তাহাকে নেতি করিয়া অথবা শুদ্ধ জ্ঞানের গর্ব্বে তাহাকে তুচ্ছ করিয়া কোন বিজ্ঞতাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞ হইতে পারে না।

গীতার যে মুখ্য চিন্তাধারায় গীতার সকল সূত্রগুলি সংগৃহীত ও মিলিত হইয়াছে, তাহার মহত্ত্ব হইতেছে এমন একটি পরিকল্পনার সমন্বয়মূলক শক্তি যাহা বিশ্ব মাঝে মানবাত্মার সমগ্র প্রকৃতিটিরই হিসাব লয়; আর মানুষ পূর্ণতা ও অমৃতত্বের সন্ধানে, কোনও এক ঊর্দ্ধতম আনন্দ, শক্তি ও শান্তির সন্ধানে যে পরম ও অনন্ত সত্য, শক্তি, প্রেমের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহার সেই বহুমুখী প্রয়োজনকে উদার ও যথাযথ ঐক্য

সাধনের দ্বারা সার্থকতা দেওয়া হয়। এখানে রহিয়াছে ভগবান, মানব ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে এক ব্যাপক অধ্যাত্ম দৃষ্টিলাভের দিকে একটা সতেজ ও উদার প্রয়াস। অবশ্য এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যেই সব জিনিষকে নিঃশেষে ধরা হইয়াছে, আর কোনও অধ্যাত্ম সমস্যার সমাধান হইতে বাকী নাই, এমন নহে; তথাপি এমন এক প্রশস্ত কাঠামো দেওয়া হইয়াছে, যেটিকে কেবল পূরণ করিয়া, পরিস্ফুট করিয়া, সামান্য পরিবর্ত্তিত করিয়া, ইঙ্গিতসকলের অনুসরণ করিয়া, অস্পষ্ট স্থানগুলিকে আলোকিত করিয়া, আমরা আমাদের বুদ্ধির অন্যান্য সমস্যারও সূত্র আবিষ্কার করিতে পারি, আমাদের আত্মার অন্যান্য প্রয়োজনও সিদ্ধ করিতে পারি। গীতা নিজে তাহার উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর কোনও সম্পূর্ণ নূতন সমাধান উপস্থিত করে নাই। যে ব্যাপকতা তাহার লক্ষ্য তাহাতে উপনীত হইতে গীতা বিখ্যাত দর্শনগুলিকে ছাড়াইয়া তাহাদের পশ্চাতে উপনিষদের যে মূল বেদান্ত রহিয়াছে সেইখানেই ফিরিয়া গিয়াছে, কারণ সেইখানেই আমরা পাই আত্মা ও মানব ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে প্রশস্ততম ও গভীরতম সমন্বয়ের দৃষ্টি। কিন্তু উপনিষদগুলিতে অন্তর্জ্ঞানমূলক দৃষ্টি এবং রূপকাত্মক ভাষার জ্যোতির্ম্ময় আচ্ছাদনে আবরিত থাকায় যাহা বুদ্ধির নিকট অনধিগম্য, তাহাকেই গীতা পরবর্ত্তী বুদ্ধিবৃত্তিমূলক চিন্তা ও বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছে।

ব্যতিরেকী চিন্তার দ্বারা যাহারা অনির্দ্দেশ্যের, চির-অব্যক্ত অক্ষরের সন্ধান করে, যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে, গীতা নিজের সমন্বয়ের কাঠামোর মধ্যে তাহাদের পন্থাকেও স্থান দিয়াছে। যাহারা এই পন্থার অনুসরণ করে তাহারাও পুরুষোত্তমকে, পরম দিব্য পুরুষকে, সর্ব্বভূতের

পরম আত্মাকে, ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব। কারণ তাঁহার যে উর্দ্ধতম স্ব-প্রতিষ্ঠ ভাব তাহা অচিন্ত্যই, অচিন্ত্যরূপম্, তাহা এক কল্পনাতীত সদ্বস্তু, সারাৎসার পরাৎপর, বুদ্ধির নির্দ্ধারণের বহু উর্দ্ধে। যে নেতিমূলক নিষ্ক্রিয়তা, নীরব নিশ্চলতা, জীবন ও কর্ম্মবর্জ্জনের পন্থা দ্বারা মানুষ এই বোধাতীত নিরুপাধিক বস্তুর সন্ধান করে, গীতার দার্শনিক চিন্তায় তাহা স্বীকৃত ও অনুমোদিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল একটা গৌণ অনুমতি মাত্র। এই নেতিমূলক জ্ঞান সত্যের কেবল একটা দিককে ধরিয়া শাশ্বতের দিকে অগ্রসর হয়, আর সেই দিকটার অনুসরণ হইতেছে দেহধারী প্রাকৃত জীবের পক্ষে অতিশয় কঠিন, দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ; ইহা এক অতিশয় সঙ্কীর্ণ, এমন কি অনাবশ্যক দুষ্করতার পথ অবলম্বন করিয়া চলে, ক্ষুরস্য ধারাঃ নিশিতৈব দুরত্যয়া। সকল সম্বন্ধকে অস্বীকার করিয়া নহে, পরন্তু সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই মানুষ স্বাভাবিকভাবে অনন্ত ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সর্ব্বাপেক্ষা সহজভাবে, ব্যাপকভাবে, অন্তরঙ্গভাবে তাঁহাকে ধরিতে পারে। এই যে বিশ্বমাঝে মানুষের মন, প্রাণ, দেহের জীবনের সহিত সকল সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়া পরমেশ্বরকে দেখা, অব্যবহার্য্যম, এইটিও বস্তুতঃ প্রশস্ততম ও সত্যতম সত্য নহে ; আর যাহাকে বস্তু-সকলের ব্যবহারিক সত্য বলা হয়, সম্বন্ধ-মূলক সত্য, সেইটিও উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের, পরমার্থের, সম্পূর্ণ বিপরীত নহে। বরঞ্চ সহস্র সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই আমাদের মানব-জীবনের সহিত পরম শাশ্বত বস্তুর নিগূঢ় স্পর্শ ও সংযোগ রহিয়াছে, আর আমাদের প্রকৃতির এবং বিশ্বের প্রকৃতির সকল মূলধারাকে ধরিয়াই, সর্ব্বভাবেন, সেই স্পর্শকে

সুস্পষ্ট করিয়া তোলা যায়, ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধির নিকট সত্য করিয়া তোলা যায়। অতএব এই অপর পন্থাটি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ, সুখম্ আপ্তুম্। ভগবান নিজেকে এমন করিয়া রাখেন নাই যাহাতে তাঁহাকে পাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয়, কেবল একটি মাত্র জিনিষের প্রয়োজন, একটি দাবী পূরণ করা চাই, চাই আমাদের অজ্ঞানের আবরণকে দীর্ণ করিবার একাগ্র অদম্য সঙ্কল্প, যাহা সকল সময়েই আমাদের নিকটে রহিয়াছে, আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, যাহা আমাদের মূল সত্তা ও অধ্যাত্মসার, আমাদেব ব্যক্তিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতার, আমাদের আত্মা ও প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব, চাই তাহাকে মন ও হৃদয় ও প্রাণ দিয়া সমগ্রভাবে, অবিরতভাবে সন্ধান করা। আমাদের পক্ষে কেবল এই একটি জিনিষই কঠিন, বাকী যা কিছু, আমাদের জীবনের পরম অধীশ্বর নিজেই সব দেখিবেন, নিজেই সব সম্পন্ন করিয়া দিবেন, অহম্ ত্বাম্ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

গীতার সমন্বয়-মূলক শিক্ষা যেখানে শুদ্ধ জ্ঞানের দিকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঝোঁক দিয়াছে, আমরা দেখিয়াছি যে ঠিক সেইখানেই গীতা অবিরত এই পূর্ণতর সত্যের ও অধিকতর ফলদায়ক উপলব্ধির পথ পরিষ্কার করিয়াছে। বস্তুতঃ, গীতা স্ব-প্রতিষ্ঠ অক্ষর সত্তার উপলব্ধিকে যে-রূপ দিয়াছে তাহাতেই উহা উপলক্ষিত হইয়াছে। মনে হয় বটে যে, সর্ব্বভূতের সেই অক্ষর আত্মা প্রকৃতির কর্ম্মপরম্পরায় সাক্ষাৎভাবে যোগদান না করিয়া সরিয়া রহিয়াছে ; কিন্তু সেই অক্ষর আত্মা একেবারে সকল সম্বন্ধ-শূন্য নহে, সকল প্রকার সংযোগ হইতে সুদূরে নহে। তাহা আমাদের সাক্ষী ও ভর্ত্তা; নীরবে, নৈর্ব্যক্তিকভাবে অনুমতি

দিতেছে, এমন কি উদাসীনভাবে ভোগের আনন্দও গ্রহণ করিতেছে। জীব যখন সেই শান্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠায় অবস্থিত, তখনও প্রকৃতির বহুমুখী ক্রিয়া সম্ভব, কারণ সাক্ষী আত্মা হইতেছে অক্ষর পুরুষ, আর প্রকৃতির সহিত পুরুষের সকল সময়েই কিছু সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু এই যে নিশ্চেষ্টতা ও সক্রিয়তা একই সঙ্গে দুইটা দিক, ইহার সম্পূর্ণ অর্থটি এক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে,—কারণ নিষ্ক্রিয় সর্ব্বব্যাপী আত্মা ভগবানের কেবল একটা দিকের সত্য মাত্র। যিনি এক অপরিবর্ত্তনীয় আত্মারূপে জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া ইহার সকল পরিবর্ত্তনকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই আবার মানুষের মধ্যে অবস্থিত ভগবান, সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর, আমাদের সকল আভ্যন্তরীন বিকাশ, এবং সকল অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী বাস্তব কর্ম্মধারার সচেতন কারণ ও প্রভু। যিনি যোগীদের ঈশ্বর, তিনিই জ্ঞান-পন্থীদের ব্রহ্ম, এক পরম ও বিশ্বব্যাপী আত্মা, এক পরম ও বিশ্বব্যাপী ভগবান।

লৌকিক ধর্ম্মসকলের যে সীমাবদ্ধ সগুণ ভগবান, এই ভগবান তাহা নহেন; কারণ সে-সব হইতেছে ইঁহার কেবল আংশিক ও বাহ্যিক রূপায়ণ; ভগবানের সত্তার যে পরিপূর্ণ সত্য ইনি তাহারই সগুণতার দিক, স্রষ্টা ও পরিচালক। ইনি হইতেছেন অদ্বিতীয় পরম পুরুষ, আত্মা, সত্তা,—সকল দেবতারা তাঁহার এক একটি দিক, সকল ব্যষ্টিগত রূপ বিশ্ব-প্রকৃতিতে তাঁহারই খণ্ড বিকাশ। ভক্তের যে ইষ্ট-দেবতা, ভক্ত তাহার বুদ্ধি দিয়া ভগবানের যে বিশিষ্ট নামরূপের পরিকল্পনা করে, বা যে বিগ্রহ তাহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী, ইনি তাহা নহেন। যিনি সকল ভক্তের, সকল ধর্ম্মের ঈশ্বর, এই সমস্ত নাম-রূপ সেই এক

দেবের বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন মুখ; কিন্তু ইনি নিজেই সেই বিশ্ব-দেব, দেব-দেব। এই ঈশ্বর ভ্রমাত্মিকা মায়ায় নির্গুণ অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মের প্রতিবিম্বমাত্র নহেন; কারণ সকল বিশ্বের অতীতে থাকিয়া, আবার ইহার মধ্যেও থাকিয়া তিনি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, এবং তিনি জগৎ-সকলের এবং জাগতিক জীবসকলের অধীশ্বর। তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই পরমেশ্বর কারণ তিনি পরম আত্মা ও পরম পুরুষ, এবং তাঁহার উর্দ্ধতম মূল সত্তা হইতে তিনি এই বিশ্বকে উৎপন্ন করিতেছেন, পরিচালিত করিতেছেন, নিজেকে মোহাবিষ্ট করিয়া নহে, পরন্তু সর্ব্ববিদ্ সর্ব্বশক্তি-মত্ত্ব লইয়া। আর বিশ্বমাঝে তাঁহার দিব্য প্রকৃতির যে লীলা সেটিও তাহার কিম্বা আমাদের চেতনার একটা ভ্রান্তিমাত্র নহে। একমাত্র ভ্রমাত্মিকা মায়া হইতেছে নীচের প্রকৃতির অজ্ঞান; তাহা এক অদ্বিতীয় অনির্দ্দেশ্যের অলক্ষ্য ভূমিকার উপরে অসদ্‌বস্তুসকল সৃষ্টি করিতেছে না, পরন্তু তাহার ক্রিয়া অন্ধ, ভারাক্রান্ত, সীমাবদ্ধ, সেইজন্য সৃষ্টির গভীরতর সত্যসকলকে সে অহংয়ের রূপের, মন, প্রাণ, জড়ের অন্যান্য অসম্পূর্ণ-রূপের ভিতর দিয়া বিকৃতভাবে মানব-মনের সম্মুখে ধরিতেছে। এক পরা ভগবদ্-প্রকৃতি আছে, তাহাই এই বিশ্বের প্রকৃত সৃজনকর্ত্রী। সকল জীব, সকল বস্তু সেই একই ভগবদ্ সত্তার বিভিন্ন রূপ; সকল জীবন-লীলা একই ঈশ্বরের শক্তির লীলা; সকল প্রকৃতি একই অনন্তের অভিব্যক্তি। তিনি মানুষের অন্তরে ভগবান; জীব তাঁহারই সত্তার সত্তা। তিনি বিশ্বের মধ্যে ভগবান; এই দেশ ও কালের জগৎ তাহারই প্রাতিভাসিক আত্ম-বিস্তার।

সৃষ্টির ও সৃষ্টির অতীত সত্য সম্বন্ধে দৃষ্টির এই ব্যাপকতার জন্যই

গীতোক্ত যোগ তাহার সমন্বয়মূলক সার্থকতা ও অতুলনীয় পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। যাহা কিছু আছে সে-সবের মধ্যে এই পরম ভগবান অপরিবর্ত্তনীয়, অবিনশ্বর আত্মা, অতএব এই পরিবর্ত্তনরহিত, বিনাশরহিত আত্মার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে মানুষকে জাগ্রত হইতে হইবে, এবং ইহার সহিত তাহার আভ্যন্তরীণ নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে যুক্ত করিতে হইবে। তিনি মানুষের অন্তরস্থিত ভগবান, মানুষের সকল ক্রিয়া উৎপাদন করিতেছেন, পরিচালন করিতেছেন; অতএব মানুষকে তাহার অন্তরস্থিত ভগবান সম্বন্ধে জাগ্রত হইতে হইবে, যে ভাগবৎ সত্তাকে সে ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহাকে জানিতে হইবে, যাহা কিছু ইহাকে আবৃত করিয়া রাখে, আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সে-সবকেই ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে, এবং তাহার আত্মার এই অন্তরতম আত্মার সহিত যুক্ত হইতে হইবে, তাহার চৈতন্যের মহত্তর চৈতন্য, তাহার সকল ইচ্ছা সকল কর্ম্মের প্রচ্ছন্ন অধীশ্বর, তাহার মধ্যে এই যে সত্তা অবস্থিত রহিয়াছে—যাহা তাহার বিভিন্ন আত্ম-প্রকাশের মূল ও লক্ষ্য, তাহার সহিত তাহাকে যুক্ত হইতে হইবে। ভগবান তিনি, তাঁহার যে দিব্য প্রকৃতি আমরা যাহা কিছু সেই সমুদয়ের মূল, তাহা এই সব নীচের প্রাকৃত সৃষ্টির দ্বারা গভীরভাবে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অতএব মানুষকে তাহার নীচের আপাতদৃশ্য জীবন হইতে, এই অপূর্ণ ও মৃত্যুময় জীবন হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাহার সেই মূল অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে যাহার স্বরূপ অমৃতত্ব ও পূর্ণতা। এই ভগবান যাহা কিছু আছে সকল বস্তুর মধ্যে এক, তিনি সেই আত্মা যাহা সর্ব্বভূতের মধ্যে রহিয়াছে এবং যাহার মধ্যে সর্ব্বভূত রহিয়াছে, চলিতেছে, ফিরিতেছে; অতএব মানুষকে আবিষ্কার করিতে হইবে সকল

জীবের সহিত তাহার অধ্যাত্ম ঐক্য, সর্ব্বভূতকে আত্মার মধ্যে এবং আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতকে দেখিতে হইবে, এমন কি সকল বস্তু সকল জীবকে আপনার মত করিয়াই দেখিতে হইবে, আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র, এবং তদনুযায়ী তাহার সকল মনে, ইচ্ছায়, জীবনে চিন্তা করিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, কর্ম্ম করিতে হইবে। এখানে বা অন্যত্র যাহা কিছু আছে, এই ভগবানই সে সমুদয়ের আদি, এবং তিনি তাঁহার প্রকৃতির দ্বারা এই অসংখ্য স্পষ্ট বস্তু হইয়াছেন, অভূৎ সর্ব্বভূতানি; অতএব মানুষকে চেতন অচেতন সকল বস্তুর মধ্যেই সেই এক অদ্বিতীয়কে দেখিতে হইবে, আরাধনা করিতে হইবে, সূর্য্যে, নক্ষত্রে, পুষ্পে তাঁহার যে প্রকাশ, মানুষ এবং প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে তাঁহার যে প্রকাশ, প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন গুণ ও শক্তির মধ্যে তাঁহার যে প্রকাশ, সবেরই পূজা করিতে হইবে, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি। দিব্য দৃষ্টি ও দিব্য ঐক্যানুভূতির দ্বারা এবং সর্ব্ব শেষে নিবিড় আভ্যন্তরীণ একত্বের দ্বারা তাহাকে বিশ্বের সহিত এক বিশ্ব-ব্যাপকত্ব লাভ করিতে হইবে। নিশ্চেষ্ট, সকল সম্বন্ধ-রহিত একত্বের মধ্যে প্রেম ও কর্ম্মের কোনও স্থান নাই, কিন্তু এই যে বৃহত্তর ও পূর্ণতর ঐক্য, ইহা কর্ম্ম ও শুদ্ধ হৃদয়াবেগের ভিতর দিয়া নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তোলে, ইহাই হইয়া উঠে আমাদের সকল কর্ম্মের, সকল অনুভবের, উৎস, সারবস্তু, প্রেরণা, দিব্য উদ্দেশ্য। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম, কোন্ দেবতাকে আমরা আমাদের সমগ্র জীবন ও কর্ম্ম অর্পণ করিব? ইনিই সেই ভগবান, সেই ঈশ্বর, যিনি আমাদের আত্মবলি দাবী করিতেছেন। নিশ্চেষ্ট, সকল সম্বন্ধ-শূন্য যে একত্ব, তাহার মধ্যে পূজা ও ভক্তির আনন্দের কোনও স্থান নাই; কিন্তু এই যে সমৃদ্ধতর,

পূর্ণতর, নিবিড়তর মিলন, ইহার আত্মা ও হৃদয় ও শীর্ষ হইতেছে ভক্তি। এই ভগবানই আমাদের পিতা, মাতা, প্রেমাস্পদ, বন্ধু সকল সম্বন্ধের পূর্ণ পরিণতি, সকল জীবের আত্মার আশ্রয়। তিনিই গুহ্যবিদ্যার বিষয় সেই এক পরম ও বিশ্ব-দেব, আত্মা, পুরুষ, ব্রহ্ম, ঈশ্বর। তিনি তাঁহার দিব্য যোগের দ্বারা এই সকল ভাবেই জগৎকে নিজের মধ্যে প্রকট করিয়াছেন। ইহার অসংখ্য সত্তা সকল তাঁহার মধ্যে এক এবং তিনি তাঁহাদের মধ্যে নানারূপে, নানাভাবে এক। মানুষের দিক দিয়া সেই দিব্য যোগ হইতেছে, যুগপৎ তাঁহার এই সকল ভাবে আত্ম-প্রকাশ সম্বন্ধে জাগ্রত হওয়া।

এইটিই যে তাহার শিক্ষার পরম ও পূর্ণ সত্য, তিনি যাহা প্রকাশ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এইটিই যে সেই সমগ্র জ্ঞান, তাহা সম্পূর্ণ ও নিঃসন্দেহভাবে স্পষ্ট করিবার জন্ম অবতার-পুরুষ এতক্ষণ যাহা বলিতেছিলেন তাহার সার সঙ্কলন করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, ইহাই তাহার পরম বাক্য, ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে, ভূয়ঃ এব শৃনু মে পরমম্ বচঃ। আমরা দেখিতে পাই গীতার এই পরম বাক্য হইতেছে, প্রথমতঃ, এই স্পষ্ট ঘোষণা যে, সৃষ্টিতে যাহা কিছু রহিয়াছে সে-সবেরই পরম ও দিব্য উৎস-রূপে, সকল বস্তু যাহার সত্তা হইতে উদ্ভূত, জগতের এবং জগৎবাসী সকল জীবের মহান্ অধীশ্বর-রূপে শাশ্বতকে জানা ও আরাধনা করা,—ইহাই হইতেছে শাশ্বতের উচ্চতম জ্ঞান, উচ্চতম আরাধনা। দ্বিতীয়তঃ, ইহা হইতেছে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়কে শ্রেষ্ঠতম যোগ বলিয়া ঘোষণা। শাশ্বত ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে হইলে, মানুষের পক্ষে এইটিই হইতেছে নির্দ্ধারিত ও স্বাভাবিক পন্থা। পন্থাটির এই সংজ্ঞাকে আরও

অর্থগৌরবপূর্ণ করিবার নিমিত্ত, এবং এই যে-ভক্তি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানের দিকে উন্মুক্ত এবং ভগবদ্‌নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের ভিত্তি ও অনুপ্রেরণা-শক্তিস্বরূপ, ইহার শ্রেষ্ঠতাকে সুস্পষ্ট করিবার নিমিত্ত, শিষ্যের হৃদয় ও মন দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করার প্রয়োজন এখানে সূচিত হইল ; এই ধারার অনুসরণ করিয়াই অতঃপর মানব-যন্ত্র অর্জ্জুনের প্রতি কর্ম্মের চরম আদেশ প্রদত্ত হইবে। ভগবান বলিলেন,* "তোমার আত্মার কল্যাণকামনায় এই পরম বাক্য আমি তোমাকে বলিব, কারণ তোমার হৃদয় এখন আমাতেই প্রীতি অনুভব করিতেছে", তে প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি। কারণ ভগবানে হৃদয়ের এই যে প্রীতি, ইহাই হইতেছে যথার্থ ভক্তির সমগ্র সার ও উপাদান। পরম বাক্যটি উচ্চারিত হইবামাত্র অর্জ্জুনকে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইল এবং জিজ্ঞাসা করিতে হইল, কি উপায়ে ব্যবহারতঃ প্রকৃতির সকল বস্তুতেই ভগবানকে দেখিতে পারা যায়। এই প্রশ্নের সাক্ষাৎ ও সহজ পরিণাম হইল ভগবানকে বিশ্বের আত্মা-রূপে দর্শন, এবং সেই সঙ্গেই জগতের যুগান্তর-কারী কর্ম্মের জন্য মহান্ আদেশ সংঘোষিত হইল।

গীতা ভগবান সম্বন্ধে যে পরিকল্পনাকে সৃষ্টির সমগ্র রহস্য বলিয়া, মুক্তিপ্রদ জ্ঞান বলিয়া জোর দিয়াছে, তাহার দ্বারা বিশ্বাতীত আনন্দের সহিত কালাধীন বিশ্ব-লীলার সমন্বয় সাধিত হয়, অথচ উভয়ের কোনটিকেই অস্বীকার করা হয় না, কাহারও বাস্তবতা কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ

---

* ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যৎ তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাময়া ॥ ১০।১

করা হয় না। সর্ব্বেশ্বরবাদ তত্ত্ব, ঈশ্বরবাদ তত্ত্ব, উচ্চতম বিশ্বাতীত সত্তা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব, আমাদের আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি উপলব্ধির এই সকল বিভিন্ন ধারার মধ্যে গীতা সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে। ভগবান অজ, শাশ্বত, অনাদি; যাহা হইতে তাঁহার উৎপত্তি হইতে পারে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী এমন কোনও বস্তু নাই, থাকিত পারে না, কারণ তিনি এক অদ্বিতীয় ও কালাতীত ও পূর্ণতম পরম বস্তু। "কি দেবগণ, কি মহর্ষিগণ, কেহই আমার উৎপত্তি অবগত নহেন···যিনি আমাকে অজ অনাদি বলিয়া জানেন"*···এইগুলিই হইতেছে সেই পরম বাক্যের প্রথম কথা। আর তাহা এই সমুচ্চ আশ্বাস দিতেছে যে, এই জ্ঞান সঙ্কীর্ণ মানসিক জ্ঞান নহে, পরন্তু শুদ্ধ অধ্যাত্ম জ্ঞান,—কারণ তাঁহার রূপ ও প্রকৃতি (যদি বিশ্বাতীত পুরুষ সম্বন্ধে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা চলে) মনের ধারণার অতীত, অচিন্ত্যরূপ,—এই জ্ঞান মর মানবকে অজ্ঞানের সকল মোহ হইতে এবং পাপের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। যে মানবাত্মা এই পরম অধ্যাত্মজ্ঞানের জ্যোতিতে বাস করিতে পারে, সে ইহার দ্বারা বিশ্বের মনঃকল্পিত ভাবমূর্ত্তি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ সকলের ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হয়। সে এমন এক ঐক্যের অনির্ব্বচনীয় শক্তির মধ্যে উঠিয়া যায় যাহা সব কিছুকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে, অথচ সকলকেই সার্থক

---

* ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ় স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১০।২, ৩

করিয়া তুলিতেছে; তাহা এখানেও যেমন, ঊর্দ্ধেও তেমনিই। বিশ্বাতীত অনন্ত সম্বন্ধে এই যে অধ্যাত্ম উপলব্ধি, ইহার দ্বারা সর্ব্বেশ্বরবাদের (Pantheism) সঙ্কীর্ণতা অতিক্রমিত হয়। যে অদ্বৈতবাদ ভগবানকে বিশ্বের সহিত এক বলিয়া দেখে, সে তাহার পরিকল্পিত অনন্ত ভগবানকে তাঁহার বিশ্ব-প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়, এবং সেইটিকেই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায় বলিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়; কিন্তু ঐ যে উপলব্ধি, উহা আমাদিগকে দেশ ও কালের অতীত শাশ্বতের মধ্যে মুক্তি দেয়। অর্জ্জুন প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "কি দেব, কি দানব, কেহই তোমার অভিব্যক্তি জানে না", সমগ্র বিশ্ব, এমন কি অসংখ্য বিশ্ব মিলিয়াও তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিতে পারে না, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি, অনন্ত মহত্ত্ব ধারণ করিতে পারে না। অন্যান্য নিম্নতর যে ভগবদ্‌জ্ঞান, বিশ্বাতীত ভগবানের চির অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় সত্তাকে ধরিয়াই তাহারা প্রকৃত সত্য হয়।

কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার ইহাও সত্য যে, বিশ্বাতীত ভগবদ্ সত্তা কেবল একটা নেতি নহে, অথবা বিশ্বের সহিত সকল সম্বন্ধশূন্য নির্ব্বিশেষ তৎস্বরূপ নহে। তাহা এক পরম সদ্বস্তু, সকল পূর্ণতার পূর্ণতা। বিশ্বের সকল সম্বন্ধ এই পরম হইতেই উদ্ভূত; সকল বিশ্ব-সৃষ্টি তাঁহার মধ্যেই ফিরিয়া যায় এবং কেবল তাঁহার মধ্যে গিয়াই তাহাদের সত্য এবং অপরিমেয় সত্তা প্রাপ্ত হয়। "কারণ আমিই দেবগণের ও মহর্ষিগণের সর্ব্বথা উৎপত্তির হেতু।" দেবতাগণ হইতেছেন সেই সকল অক্ষয় শক্তিপুঞ্জ ও অমর ব্যক্তি, যাঁহারা সজ্ঞানে বিশ্বের আন্তরিক ও বাহিক শক্তিসমূহকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন, গঠন করিতেছেন, পরিচালিত করিতেছেন।

দেবতাগণ হইতেছেন শাশ্বত ও আদি দেবের আধ্যাত্মিক রূপ, তাঁহারা তাঁহা হইতেই নামিয়া আসিয়াছেন জগতের বহুমুখী ক্রিয়ার মধ্যে। দেবতারা বহু ও বিশ্বরূপী,—তাঁহারা সত্তার মূল তত্ত্বগুলি এবং তাহার সহস্র বৈচিত্র্য লইয়া একের এই নানামুখী লীলা রচনা করিতেছেন। তাঁহাদের নিজেদের অস্তিত্ব, প্রকৃতি, শক্তি, ক্রিয়া, সমস্তই সর্ব্বপ্রকারে, সকল স্তরে এবং প্রত্যেক অংশে সেই বিশ্বাতীত অনির্ব্বচনীয় সত্তা হইতে আসিতেছে। এই দিব্য প্রতিনিধিগণের দ্বারা এখানে কিছুই স্বাধীনভাবে সৃষ্ট হয় না, কোনও জিনিষই নিরপেক্ষভাবে উদ্ভাবিত হয় না; প্রত্যেক বস্তুর মূল ও কারণ, তাহার সত্তার ও আত্মপ্রকাশ প্রবৃত্তির আধ্যাত্মিক হেতু রহিয়াছে বিশ্বাতীত ভগবানের মধ্যেই, অহম্ আদিঃ সর্ব্বশঃ। বিশ্বের কোনও জিনিষেরই প্রকৃত কারণ বিশ্বের মধ্যে নাই, সমস্তই আসিতেছে সেই বিশ্বাতীত সত্তা হইতে।

যে-সকল মহর্ষিকে বেদের ন্যায় এখানেও সপ্ত আদি ঋষি বলা হইয়াছে,* মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে, তাঁহারা হইতেছেন ভগবদ্ প্রজ্ঞার ধী-শক্তি; সেই প্রজ্ঞা নিজের আত্ম-চেতন অনন্ততা হইতে সকল বস্তুকে উৎপন্ন করিয়াছে, প্রজ্ঞা পুরাণী,—নিজের মূল সত্তার সাতটি ধারার ক্রম অনুসারে বিকশিত করিয়াছে। এই ঋষিগণ হইতেছেন, বেদের সপ্ত ধীয়াঃ, সর্ব্ব-ধারক, সর্ব্ব-উদ্ভাসক, সর্ব্ব-প্রকাশক সপ্ত ধী-শক্তির বিগ্রহ-মূর্ত্তি— উপনিষদ সকল জিনিষকেই বর্ণনা করিয়াছে সপ্তে সপ্তে সাজানো।

* মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্‌ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ১০।৬

ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে মানবের পিতা চারি শাশ্বত মনু, চত্বারো মনবস্তথা,—কারণ ভগবানের যে কর্ম্মপরা প্রকৃতি তাহা চতুর্মুখী, এবং মানুষ তাহার চতুর্মুখী স্বভাবের ভিতর দিয়া এই প্রকৃতিকে প্রকাশ করিতেছে। ইহারাও মানসিক সত্তা, ইহাদের নাম হইতেই তাহা প্রকাশ পায়। জীবনের যে-সব ক্রিয়া আমরা দেখিতে পাই, তাহারা নির্ভর করিতেছে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট মনের উপর; উহারা হইতেছেন এই সমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, জগতের এই সকল সজীব প্রাণী তাঁহাদের দ্বারাই উদ্ভূত হইয়াছে; সকলেই তাঁহাদের সন্তান, যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ। আর এই সকল মহর্ষি এবং এই চারি মনু, ইঁহারা নিজেরাও হইতেছেন পরমাত্মার নিত্য মানস সৃষ্টি, মদ্‌ভাবা মানসা জাতা, তাঁহার বিশ্বাতীত অধ্যাত্ম সত্তা হইতে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে আবির্ভূত,—তাঁহারা স্রষ্টা, কিন্তু বিশ্বের যত স্রষ্টা তিনিই তাঁহাদের স্রষ্টা। সকল অধ্যাত্ম সত্তার অধ্যাত্ম সত্তা, সকল অন্তরাত্মার অন্তরাত্মা, মনের মন, প্রাণের প্রাণ, সকল রূপের আভ্যন্তরীন সার বস্তু, এই বিশ্বাতীত পরম পুরুষ আমরা যাহা কিছু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত একটা কিছু নহেন, অন্য পক্ষে আমাদের ও জগতের, সত্তার ও প্রকৃতির, সকল সূত্র, সকল শক্তি তাঁহার দ্বারাই সৃষ্ট, তাঁহার দ্বারাই উদ্ভাসিত।

আমাদের জীবনের এই যে বিশ্বাতীত উৎস, তাঁহার ও আমাদের মধ্যে কোনও অনতিক্রমণীয় ব্যবধানের বিচ্ছেদ নাই, যে-সকল জীব তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তিনি তাহাদিগকে অস্বীকার করেন না, অথবা তাহাদিগকে কেবল মায়ার বিজৃম্ভন বলিয়া উড়াইয়া দেন না। তিনি সৎ (the Being), আর সব কিছু তাঁহারই প্রকাশ (becomings).

তিনি একটা শূন্য হইতে, একটা "নাস্তি" হইতে, অথবা একটা অবাস্তব স্বপ্নের মধ্য হইতে সৃষ্টি করেন না। তিনি নিজের মধ্য হইতেই সৃষ্টি করেন, নিজেই সৃষ্ট হন; সকলেই তাঁহার সত্তার মধ্যে, সকলেই তাঁহার সত্তার অংশ। এই যে সত্য, ইহা সর্ব্বেশ্বরবাদমূলক দৃষ্টিকে স্বীকার করিয়াও অতিক্রম করিয়া যায়। বাসুদেবই সব, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, কিন্তু বিশ্বে যাহা কিছু আবির্ভূত সে সমুদয়ই বাসুদেব এই জন্য যে, যাহা কিছু এখানে আবির্ভূত হয় নাই, যাহা কিছু কখনও প্রকট হয় না সে-সবও তিনি। তাঁহার সত্তা তাঁহার প্রকাশের দ্বারা কোনোরূপে খণ্ডিত হয় না; এই সম্বন্ধের জগতের দ্বারা তিনি এতটুকুও সম্বদ্ধ নহেন। যখন তিনি সব কিছু হইতেছেন তখনও তিনি বিশ্বাতীত; যখন তিনি সান্ত রূপ গ্রহণ করিতেছেন তখনও তিনি নিত্য অনন্ত। প্রকৃতি (Nature) তাহার মূল সত্তায় তাঁহারই অধ্যাত্ম শক্তি, আত্মশক্তি; এই অধ্যাত্ম আত্মশক্তি বস্তুসকলের প্রকাশের জন্য তাহাদের আভ্যন্তরীন প্রকৃতি স্বরূপ অসংখ্য মূল গুণ সৃষ্টি করে এবং তাহাদিগকেই বাহিরের রূপে ও কর্ম্মে প্রকট করে। কারণ সে শক্তির যে মৌলিক, নিগূঢ়, দিব্য ক্রম-বিন্যাস তাহাতে প্রত্যেক বস্তুরই অধ্যাত্ম সত্যটি আসে প্রথমে, তাহা হইতেছে প্রকৃতির গভীরতম একত্বের জিনিষ; যে গুণ ও প্রকৃতি তাহাদের মনস্তত্ত্বের সত্য তাহার মধ্যে যথার্থ বস্তু যাহা আছে সে-সব নির্ভর করিতেছে ঐ অধ্যাত্ম সত্যের উপর, তাহা আত্মা হইতেই উদ্ভূত; রূপ ও কর্ম্মের যে বাহ্যিক সত্য প্রয়োজনীয়তায় ন্যূনতম এবং ক্রমবিন্যাসে সর্ব্বশেষ, তাহা প্রকৃতির আভ্যন্তরীন গুণ হইতে উদ্ভূত, এবং বাহ্য জগতে এই সকল বিচিত্র প্রকাশের জন্য সর্ব্বতোভাবে তাহারই উপর নির্ভর

করে। অথবা অন্য কথায় বলা যাইতে পারে যে, বাহিরের সত্য হইতেছে কেবল অন্তরাত্মার শক্তিসমষ্টির বহিপ্র্রকাশ, এবং সর্ব্বদাই তাহাদের পিছনে তাহাদের বহিপ্র্রকাশের অধ্যাত্ম কারণটি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই যে সান্ত বাহ্য সৃষ্টি, ইহার ভিতর দিয়া অনন্ত ভগবানই প্রকটিত হইতেছেন। অপরা প্রকৃতি প্রকৃতির গৌণরূপ; অনন্তের মধ্যে সংযোজনার যে বহু সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত কয়েকটির একটা অধস্তন পরিণতি হইতেছে এই অপরা প্রকৃতি। সত্তার আত্মপ্রকাশের যে মূল গুণ ও ধারা তাহা হইতে উদ্ভূত এই সকল সংযোজনা, রূপ ও শক্তির, কর্ম্ম ও গতির সংযোজনা, ইহারা জগৎ ঐক্যের মধ্যে রহিয়াছে সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ সম্বন্ধ ও পারস্পরিক অনুভূতি উপলব্ধির জন্য। আর এই নীচের বাহ্যিক পরিদৃশ্যমান ব্যবস্থায়, ভগবানের প্রকাশ-শক্তি-রূপা প্রকৃতি এক মোহাচ্ছন্ন বিশ্ব-গত অবিদ্যার বিকৃতির দ্বারা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এবং আমাদের মানসিক ও প্রাণিক অনুভূতির জড়ানুগত, ভেদাত্মক ও অহংভাবমূলক ক্রিয়ায় নিজের দিব্য সত্যসকলকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তথাপি এখানেও সব কিছুই ভগবান হইতে আসিতেছে, সব কিছুই হইতেছে প্রভাব, ভাব, প্রবৃত্তি, বিশ্বাতীত সত্তার মধ্য হইতে প্রকৃতির ক্রিয়ার ভিতর দিয়া বিকাশ-ধারা। অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে; "আমি সকলের উৎপত্তিস্থল, আমা হইতে বাহির হইয়া সকলে কর্ম্ম ও গতির বিকাশে চলিয়াছে।" আর ইহা কেবল সেই সব জিনিষের পক্ষেই প্রযুজ্য নহে যাহাদিগকে আমরা ভাল বলি, প্রশংসা করি এবং দিব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, যে-সব হইতেছে জ্যোতির্ম্ময়, সাত্ত্বিক, নৈতিক, শান্তিপ্রদ,

অধ্যাত্মভাবে আনন্দপ্রদ,* "বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপস্যা ও দান।" পরন্তু ইহা সেই সব বিপরীত জিনিষ সকলের পক্ষেও সত্য যাহারা মর মানবের মনকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে এবং অজ্ঞান ও তাহার সংমোহ লইয়া আসে, "সুখ ও দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যু, ভয় ও অভয়, যশ ও অযশ" আর এইরূপ বাকী যাহা কিছু জ্যোতি ও অন্ধকারের সংমিশ্রণ হইতে উত্থিত, যে-সব অসংখ্য মিশ্রিত তন্ত্রী এমনই বেদনায় স্পন্দিত হইতেছে, অথচ আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অধীন মন ও তাহার অজ্ঞান ভাব সকলে জড়িত হইয়া অনবরত উত্তেজনায় শিহরিত হইতেছে। জীবগণের এই সব পৃথক পৃথক ভাব এক মহান্ আত্ম-প্রকাশধারার অন্তর্গত, এবং যিনি ইহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন তাঁহা হইতেই তাহারা তাহাদের উদ্ভব ও সত্তা লাভ করিয়াছে। বিশ্বাতীত সত্তা এই সমুদয় জিনিষকে জানেন এবং সৃষ্টি করেন, কিন্তু এই পৃথগ্‌ভূত জ্ঞানে জড়িত হইয়া পড়েন না, নিজের সৃষ্টির দ্বারা অভিভূত হন না। এখানে আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে ভূ ধাতু (to become, হওয়া) হইতে উৎপন্ন তিনটি কথাকে কেমন একত্র করিয়া জোর দেওয়া হইয়াছে, ভবন্তি, ভাবাঃ, ভূতানাম্। ভগবান নিজেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছেন, ভূতানি; সমস্ত আভ্যন্তরীন অবস্থা ও ক্রিয়া তাঁহার

* বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ॥ ১০।৪, ৫

এবং তাহাদের মানসিক ভাব, ভাবাঃ। এই সকলও,—যেমন আমাদের উচ্চতম অধ্যাত্ম ভাবসকল ঠিক তেমনিই আমাদের নিম্নতর আভ্যন্তরীন ভাবসকল এবং তাহাদের পরিদৃশ্যমান পরিণামসকল, সমস্তই পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ভবন্তি মত্ত এব*। গীতা সত্তা এবং তাহার প্রকাশ এই দুইয়ের প্রভেদ স্বীকার করিয়াছে এবং এই প্রভেদের উপর জোর দিয়াছে, কিন্তু এই প্রভেদকে বিরোধ বলিয়া প্রতিপন্ন করে নাই। কারণ তাহা হইলে বিশ্বগত একত্বকে উড়াইয়া দেওয়া হয়। ভগবান এক, তাঁহার বিশ্বাতীত সত্তায় এক, বস্তুসকলের এক সর্ব্বব্যাপী আধার-রূপে এক, তাঁহার বিশ্ব-প্রকৃতির একত্বে এক। এই তিনই এক অদ্বিতীয় ভগবান; সকলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূত, সকলেই তাঁহার সত্তার প্রকট রূপ, সকলেই শাশ্বতের সনাতন অংশ অথবা কালাধীন প্রকাশ। যদি আমাদিগকে গীতার অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে বিশ্বাতীত পরম সত্তার মধ্যে সকল জিনিষের চরম নির্ব্বাণ অনুসন্ধান করা চলিবে না, পরন্তু সেইখানেই তাহাদের রহস্যের সুমীমাংসা সন্ধান করিতে হইবে, তাহাদের জীবনের সমন্বয়সাধক সত্যের সন্ধান করিতে হইবে।

কিন্তু অনন্তে আরও একটি পরম সত্য আছে, সেইটিকেও মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের অপরিহার্য্য অংশরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সেই সত্য হইতেছে এই যে, বিশ্বের দিব্য নিয়ন্তা তাঁহার বিশ্বাতীত পদ হইতে বিশ্বকে নিরীক্ষণ

* যথা উপনিষদে, আত্মা এব অভূৎ সর্ব্বভূতানি, আত্মাই সর্ব্বভূত হইয়াছে; এখানে শব্দগুলির নির্ব্বাচনে এই ব্যঞ্জনা নিহিত রহিয়াছে যে, স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তাই এই সর্ব্বভূত হইয়াছে।

করিতেছেন, আবার ইহার মধ্যেও নিবিড়ভাবে অনুস্যূত রহিয়াছেন : যে পরমেশ্বর নিজে এই সমুদয় সৃষ্টি হইয়াছেন, অথচ ইহাকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, তিনি সৃষ্টি হইতে নিবৃত্ত কোনো ইচ্ছাশক্তি-শূন্য কারণ মাত্র নহেন। এমন নহেন যে, এই জগৎ তাঁহার অনিচ্ছাকৃত সৃষ্টি এবং তাঁহার বিশ্ব-শক্তির এই সকল পরিণামের জন্য তিনি কোনরূপ দায়িত্ব স্বীকার করেন না, অথবা তাঁহার চৈতন্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক ভ্রমাত্মিকা চৈতন্যের উপর, মায়ার উপর, ঐ সবকে আরোপ করেন, কিম্বা সৃষ্টিকে এক যন্ত্রবৎ অন্ধনিয়মের বশে, অথবা কোনো প্রতিনিধির হস্তে, অথবা পাপ ও পুণ্যের চির-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছাড়িয়া দেন। এমন নহে যে, তিনি উদাসীন সাক্ষীরূপে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন, নির্ব্বিকারভাবে অপেক্ষা করিতেছেন কখন সব কিছু নিজদিগকে লুপ্ত করিয়া দিবে, অথবা তাঁহার অবিচল আদি তত্ত্বের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। তিনি জগৎ ও জনসমূহের মহান্ ঈশ্বর, লোকমহেশ্বরম্, তিনি শুধু জগতের মধ্যে থাকিয়াই নহে, পরন্তু ঊর্দ্ধ হইতেও, তাঁহার পরম বিশ্বাতীত পদ হইতেও জগতকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত নহে, এমন কোনো শক্তির দ্বারা বিশ্ব পরিচালিত হইতে পারে না। জগতের উপর এক দিব্য নিয়মের রাজত্ব চলিতেছে, ইহা বলিলে বুঝায় যে, ইহার উপরে এক সর্ব্বশক্তিমান নিয়ন্তার প্রভুত্ব রহিয়াছে, কোনো যন্ত্রবৎ শক্তির বা বিশ্বের আপাতদৃশ্য রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনো অলজ্ঘ্য অন্ধ নিয়তির নহে। এইটিই হইতেছে জগৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরবাদমূলক (theistic) দৃষ্টি, কিন্তু যে ঈশ্বরবাদ সঙ্কোচের সহিত অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হয় এবং জগতের বৈপরীত্যসকলের দিকে সোজাভাবে চাহিয়া দেখিতে ভয় পায়,

ইহা সেরূপ ঈশ্বরবাদ নহে, ইহা দেখে ভগবান সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান, এক অদ্বিতীয় আদিদেব, তিনি শুভ অশুভ, সুখ দুঃখ, জ্যোতি অন্ধকার সব কিছুই নিজের সত্তার উপাদান-রূপে নিজের মধ্যে প্রকট করিতেছেন, এবং নিজের মধ্যে যাহা প্রকট করিয়াছেন, নিজেই তাহা পরিচালন করিতেছেন। ইহার বৈপরীত্যসকল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, নিজের সৃষ্টির দ্বারা তিনি কোনোরূপে সীমাবদ্ধ হন না, প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়াও তিনি তাহার সহিত অতি নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত এবং তাহার জীবগণের সহিত অতি অন্তরঙ্গভাবে এক, তাহাদের মূল অধ্যাত্ম সত্তা, আত্মা, ঊর্দ্ধতম চিৎশক্তি, তাহাদের প্রভু, প্রণয়ী, বন্ধু, আশ্রয়, তিনি তাহাদের মধ্যে থাকিয়া আবার ঊর্দ্ধ হইতেও মর্ত্ত্যজগতে পরিদৃশ্যমান অজ্ঞান ও দুঃখ ও পাপ ও অশুভের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা পরিচালিত করিতেছেন, প্রত্যেককে তাহার প্রকৃতির ভিতর দিয়া এবং সকলকে বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতর দিয়া এক পরম জ্যোতি ও আনন্দ ও অমৃতত্ব ও পরম পদের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। এইটিই হইতেছে মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের সমগ্রতা। ভগবান আমাদের মধ্যে ও জগতের মধ্যে অবস্থিত, আবার সেই সঙ্গেই তিনি বিশ্বের অতীত অনন্ত সত্তা, ইহাই সেই সমগ্র জ্ঞান। পরাৎপর তিনি, তাঁহার দিব্য প্রকৃতির, তাঁহার অধ্যাত্ম সত্তার কার্য্যকরী শক্তির দ্বারা তিনি সর্ব্বমিদং হইয়াছেন, তাঁহার লোকাতীত পরম পদ হইতে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তিনি প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে অবস্থিত, বিশ্বের সকল ঘটনা পরম্পরার কারণ, নিয়ন্তা, পরিচালক, অথচ তিনি এত উচ্চ, মহান্ ও অনন্ত যে তাঁহার কোনো সৃষ্টিই তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না।

এই জ্ঞানের স্বরূপ তিনটি পৃথক আশ্বাসপূর্ণ শ্লোকে সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। ভগবান বলিলেন,* "যে আমায় অজ, অনাদি ও সর্ব্বলোকের মহান্ ঈশ্বররূপে জানে, সে মর্ত্ত্যলোকে মোহশূন্য হইয়া বাস করে এবং সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে আমার এই বিভূতি, এই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরত্ব এবং আমার এই যোগ (ঐশ্বর যোগ, যাহার দ্বারা বিশ্বাতীত ভগবান সকল সৃষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তর হইয়াও সকলের সহিত এক, সকলের মধ্যে বাস করিতেছেন এবং সকলকে স্বীয় প্রকৃতির পরিণামরূপে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন) যথার্থরূপে জানে সে অবিকম্পিত যোগে আমার সহিত যুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি সকলের উৎপত্তি-স্থল, আমা হইতেই সকলের কর্ম্ম ও গতি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, ইহা জানিয়া জ্ঞানীগণ আমার ভজনা করেন···এবং আমি তাহাদিগকে বুদ্ধি-যোগ প্রদান করি, যাহার দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন এবং আমি তাঁহাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দিই।" ঐ জ্ঞানের স্বরূপ হইতেই, এবং যে যোগসাধনার দ্বারা ঐ জ্ঞান অধ্যাত্মবিকাশ,

---

* এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০।৭
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব সমন্বিতাঃ॥ ১০।৮
তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১০।১১

অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে পরিণত হয় সেই যোগের স্বরূপ হইতেই এই সকল ফল অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ মানুষের মনের ও কর্ম্মের সকল ভ্রান্তি, তাহার মন, ইচ্ছা, নৈতিক প্রবৃত্তির, তাহার হৃদয়ের, ইন্দ্রিয়ের, প্রাণের প্রেরণার যত স্খলন, অনিশ্চয়তা ও সন্তাপ, সমুদয়েরই মূল হইতেছে তাহার সম্মোহ; এই সম্মোহ, এই তমসাচ্ছন্ন ও ভ্রান্তিময় জ্ঞান ও কর্ম্মই মর দেহে অবস্থিত ইন্দ্রিয় কর্তৃক বিমূঢ় মনের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যখন সে সকল বস্তুর দিব্য উৎসটিকে দেখিতে পায়, যখন সে বিশ্বের দৃশ্যমান রূপ হইতে বিশ্বাতীত সদ্বস্তুর দিকে অবিচলিত ভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, এবং সেই সদ্বস্তু হইতে আবার এই দৃশ্যমান রূপে ফিরিয়া আসে, তখন সে মন, ইচ্ছা, হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ের এই সম্মোহ হইতে মুক্তিলাভ করে, জ্ঞানদীপ্ত ও মুক্ত হইয়া বিচরণ করে, অসংমূঢ় মর্ত্ত্যেষু। প্রত্যেক জিনিষকে তাহার পরম ও যথার্থ স্বরূপে সে দেখে, আর শুধুই তাহার বর্ত্তমান ও আপাতদৃশ্য রূপে নহে; এইভাবে সে প্রচ্ছন্ন যোগসূত্র ও সম্বন্ধসকল দেখিতে পায়, সে সজ্ঞানে সমস্ত জীবনকে পরিচালিত করে, তাহাদের মহান্ ও সত্য লক্ষ্য অনুসারে কর্ম্ম করে এবং নিজের অন্তরস্থিত ভগবান হইতে যে শক্তি ও জ্যোতি তাহার নিকট আসে তাহার দ্বারাই সে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করে। এইভাবেই সে ভ্রান্ত জ্ঞান হইতে, মন ও ইচ্ছার ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া হইতে, ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ইন্দ্রিয়প্রেরণা হইতে মুক্ত হয়, আর এই সবই হইতেছে এখানকার সকল পাপ, ভ্রান্তি ও দুঃখের মূল, সর্ব্ব-পাপৈঃ প্রমুচ্যতে। কারণ এইভাবে বিশ্বাতীত ও বিশ্বব্যাপী সত্তার মধ্যে বাস করিয়া সে নিজের ও আর সকলের ব্যষ্টিগত সত্তাকে তাহাদের মহত্তর স্বরূপে

দেখিতে পায়, এবং তাহার ভেদাত্মক ও অহমাত্মক ইচ্ছা ও জ্ঞানের মিথ্যা ও ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হয়। এইটিই হইতেছে অধ্যাত্ম মুক্তির সার তত্ত্ব।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে গীতার মতে মুক্ত পুরুষের যে জ্ঞান তাহা জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন এবং সকল সম্বন্ধ-শূন্য নৈর্ব্যক্তিকতার চৈতন্য নহে, একটা কিছু-না-করা শান্ত অবস্থা নহে। কারণ মুক্ত পুরুষের মন ও আত্মায় সকল সময়েই এই বোধ, এই সমগ্র অনুভূতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে যে, বিশ্বের ঈশ্বর ভগবান সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া সব কিছুকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করিতেছেন, এতাং বিভূতিং মম যো বেত্তি।* তিনি জানেন যে তাঁহার আত্মা বিশ্ব-জগতের অতীত সত্তা, কিন্তু তিনি ইহাও জানেন যে, ঐশ্বরিক যোগের দ্বারা তিনি এই বিশ্বের সহিত এক, যোগম্ চ মম। এবং তিনি বিশ্বাতীত সত্তা, বিশ্ব-সত্তা ও ব্যষ্টি-সত্তা প্রত্যেকটি দিক পরম সত্যের সহিত যথার্থ সম্বন্ধে দেখেন এবং সবকে ঐশ্বরিক যোগের ঐক্যের মধ্যে যথাক্রমে সন্নিবেশিত করেন। তিনি আর জিনিষসকলকে পৃথক পৃথক করিয়া দেখেন না,—এইরূপ পার্থক্যে দেখিলে কোনো জিনিষেরই সুব্যাখ্যা হয় না অথবা শুধু একটা দিকই দেখা হয়। আবার তিনি যে সকল জিনিষকে গোলমালে একাকার করিয়া দেখেন তাহাও নহে,—এরূপ গোলমাল করিয়া দেখার ফল হইতেছে ভ্রান্ত দৃষ্টি ও বিশৃঙ্খল কর্ম্ম। তিনি বিশ্বাতীত সত্তায়

* এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০।৭

নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত, আর তিনি বিশ্বের দ্বন্দ্বে এবং কাল ও ঘটনাচক্রের গণ্ডগোলে কিছুমাত্র বিক্ষুব্ধ হন না। এই সকল সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যেও তিনি অবিচলিত, তাঁহার আত্মা বিশ্বমাঝে শাশ্বত ও অধ্যাত্মের সহিত অটল অচল নিষ্কম্প যোগে নিবিষ্ট। এই সবের ভিতর দিয়া তিনি লক্ষ্য করেন যে, যোগেশ্বরের দিব্য সঙ্কল্পই অব্যর্থভাবে পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে, এবং তিনি শান্ত বিশ্বব্যাপকত্ব ও সকল বস্তু, সকল প্রাণীর সহিত একত্বের বোধ লইয়া কর্ম্ম করেন। আর এই যে সকল বস্তুর সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ, ইহার অর্থ নহে যে, তাঁহার আত্মা ও মন ভেদাত্মক নীচের প্রকৃতিতে বদ্ধ; কারণ তাঁহার অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিত্তি নীচের প্রাতিভাসিক রূপ ও ক্রিয়া নহে, পরন্তু তাহা হইতেছে আভ্যন্তরীন সর্ব্বব্যাপী আত্মা এবং পরম বিশ্বাতীত সত্তা। তিনি তাঁহার প্রকৃতিতে ও সত্তার ধর্ম্মে ভগবানেরই সদৃশ হন, সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ, আত্মার বিশ্ব-ব্যাপকত্বের মধ্যেও তিনি বিশ্বাতীত, মন প্রাণ দেহের ব্যষ্টিত্বের মধ্যেও তিনি বিশ্বব্যাপী। এই যোগ একবার সিদ্ধ, অটল, সুদৃঢ় হইলে, তিনি প্রকৃতির যে কোনো ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারেন, যে কোনো মানবীয় অবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন, যে কোনো বিশ্ব-কর্ম্ম করিতে পারেন, তাহাতে আর তিনি ভগবদ্ আত্মার সহিত ঐক্য হইতে কিছুমাত্র স্খলিত হন না, সর্ব্বভূতমহেশ্বরের সহিত তাহার নিত্য মিলন বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় না, সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে।

ভাব ও হৃদয়াবেগের ক্ষেত্রে এই জ্ঞান সেই ভগবানের প্রতি শান্ত প্রেম ও প্রগাঢ় ভক্তিতে পরিণত হয় যিনি আমাদের উর্দ্ধে বিশ্বাতীত আদিদেব, আর এখানে সকল বস্তুর অধীশ্বর, মানুষের মধ্যে ভগবান,

প্রকৃতির মধ্যে ভগবান। প্রথম প্রথম ইহা হয় শুধু বুদ্ধির একটা জ্ঞান, কিন্তু ইহার সহিত যুক্ত হয় হৃদয়ের আবেগময় অধ্যাত্মভাব, বুধা ভাব-সমন্বিতাঃ। হৃদয় ও মনের এই যে পরিবর্ত্তন, ইহাই সমগ্র প্রকৃতির পূর্ণ রূপান্তরের সূচনা। এক নূতন আভ্যন্তরীন জন্ম ও বিকাশ আমাদিগকে আমাদের প্রেম ও ভক্তির পরম পাত্রের সহিত একত্বের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে, মদ্‌ভাবায়। এই যে-ভগবান তখন জগতের সর্ব্বত্র এবং ইহার ঊর্দ্ধে দৃষ্ট হন, তাঁহার মহত্ব, সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতায় প্রগাঢ় প্রেমানন্দ, প্রীতি, অনুভূত হয়। মন যে জগতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বাহ্য সুখের সন্ধান করিতেছে, এই গভীরতর আনন্দোল্লাস তাহার স্থান গ্রহণ করে, অথবা বলিতে পারা যায় যে, উহা আর সকল আনন্দকে নিজের মধ্যেই টানিয়া লয় এবং এক অত্যাশ্চর্য্য রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা মনের ও হৃদয়ের অনুভবসকলকে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়। সমগ্র চিত্ত ভগবদ্‌ময় হইয়া উঠে এবং ভগবদ্ চৈতন্যের সাড়ায় ভরিয়া উঠে; সমগ্র জীবন আনন্দানুভূতির এক সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়। এইরূপ ভগবদ্ প্রেমিকগণের সকল বাক্য ও চিন্তা হয় পরস্পরের সহিত ভগবদ্ বিষয়ে আলাপন, ভগবদ্‌তত্ত্ব অনুধাবন। সেই একই আনন্দে সত্তার সকল তৃপ্তি, প্রকৃতির সকল লীলা, সকল সুখ কেন্দ্রীভূত হয়। চিন্তায় ও স্মৃতিতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিত্য মিলন হয়, আত্মায় একত্বের অনুভূতি কখনও কোনক্রমে ছিন্ন হয় না। আর যে মুহূর্ত্তে এই আভ্যন্তরীন অবস্থা আরম্ভ হয়, ইহা যখন অপূর্ণ রহিয়াছে তখনও ভগবান পূর্ণ বুদ্ধিযোগের দ্বারা ইহাকে দৃঢ় করিয়া দেন। তিনি আমাদের মধ্যে ভাস্বর জ্ঞানের দীপ প্রজ্জ্বলিত

করিয়া তোলেন, ভেদাত্মক মন ও বুদ্ধির অজ্ঞানকে ধ্বংস করিয়া দেন, মানবাত্মার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া তিনি দণ্ডায়মান হন।* কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রদীপ্ত সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিযোগের দ্বারা আমাদের নীচের বিক্ষুব্ধ মানসিক স্তর হইতে সক্রিয় প্রকৃতির উর্দ্ধে সাক্ষী আত্ম-পুরুষের অক্ষর শান্তির মধ্যে উন্নয়ন সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই যে মহত্তর বুদ্ধিযোগ সর্ব্বব্যাপক জ্ঞানের সহিত প্রেম ও ভক্তির প্রদীপ্ত সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার দ্বারা এখন মানবাত্মা এক বিশাল আনন্দে সর্ব্বউদ্ভবকর্ত্তা পরমেশ্বরের সমগ্র লোকাতীত সত্যের মধ্যে উঠিয়া যায়। ব্যষ্টিগত আত্মা ও ব্যষ্টিগত প্রকৃতির মধ্যে শাশ্বতের প্রকাশ পূর্ণ হয়; ব্যষ্টিগত আত্মা কালাধীন জন্ম হইতে শাশ্বতের অনন্তত্বের মধ্যে উর্দ্ধগতি লাভ করে।

---

* মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১০।৯-১১

বিভূতিরূপে ভগবান

এখন একটি অতি প্রয়োজনীয় স্থানে উপস্থিত হওয়া গিয়াছে, অধ্যাত্মমুক্তি এবং দিব্যকর্ম্ম সম্বন্ধে গীতা যে শিক্ষা পরিস্ফুট করিতেছিল তাহার সহিত গীতার দার্শনিক তত্ত্বগত সমন্বয়ের বিবৃতি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্জ্জুনের বুদ্ধিতে ভগবান প্রকটিত হইয়াছেন; মনের অনুসন্ধান ও হৃদয়ের দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহাকে পরম ও বিশ্বব্যাপী সত্তারূপে, পরম ও বিশ্বব্যাপী পুরুষরূপে, আমাদের জীবনের অন্তর্যামী ঈশ্বররূপে গোচর করান হইয়াছে; মানুষের জ্ঞান, ইচ্ছা ও ভক্তি তাঁহাকেই অজ্ঞান কুহেলিকার ভিতর দিয়া অনুসন্ধান করিতেছিল। এখন কেবল বাকী রহিয়াছে বহুলরূপী বিরাট পুরুষের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ, তাহা হইলেই দিব্য প্রকাশনটির নানা দিকের আর একটি দিক পূর্ণ হইবে।

তাত্ত্বিক সমন্বয়টি সম্পূর্ণ হইয়াছে। আত্মাকে নীচের প্রকৃতি হইতে পৃথক করিবার জন্য সাংখ্যকে স্বীকার করা হইয়াছে, এই পার্থক্য সাধন করিতে হইবে বিবেকবুদ্ধির ভিতর দিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া এবং সেই প্রকৃতির উপাদান স্বরূপ গুণত্রয়ের বশ্যতা হইতে উপরে উঠিয়া। পরম পুরুষ ও পরাপ্রকৃতির ঐক্য উদারভাবে প্রকট করিয়া সাংখ্যকে সম্পূর্ণ করা হইয়াছে এবং তাহার সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করা হইয়াছে। অহংকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রাকৃত ভেদাত্মক ব্যক্তিরূপ গড়িয়া উঠে তাহার

আত্মবিলোপ সাধনের জন্য দার্শনিকদের বেদান্তকে স্বীকার করা হইয়াছে। উদার নৈর্ব্যক্তিকতার দ্বারা ক্ষুদ্র ব্যক্তিকতার নিরসন করিতে, ব্রহ্মের ঐক্যে ভেদাত্মক ভ্রান্তির ধ্বংস করিতে এবং অহংয়ের অন্ধ দৃষ্টির পরিবর্ত্তে সর্ব্বভূতকে এক আত্মায় এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতে দেখিবার সত্যতর দৃষ্টি লাভ করিতে বেদান্তের প্রণালী প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বেদান্তের প্রণালীকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পরব্রহ্মকে নিরপেক্ষভাবে প্রকট করা হইয়াছে, তাহা হইতে সচল ও অচল, ক্ষর ও অক্ষর, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম উভয়ই উদ্ভূত। ইহার মধ্যে যে-সকল সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়া সম্ভব সে-সব অতিক্রম করিতে পরমাত্মা ও ঈশ্বরকে নিবিড়ভাবে প্রকট করা হইয়াছে, তিনিই সমস্ত প্রকৃতিতে আবির্ভূত হইতেছেন, সকল ব্যক্তিরূপের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন এবং সকল কর্ম্মেই তাঁহার প্রকৃতির শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। ইচ্ছাশক্তি, মন ও হৃদয়কে, সমগ্র আভ্যন্তরীণ সত্তাকে ঈশ্বরের নিকট, প্রকৃতির দিব্য অধীশ্বরের নিকট সমর্পণ করিবার জন্য যোগকে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে বিশ্বের পরম অধীশ্বরকে আদিদেব বলিয়া প্রকট করা হইয়াছে, জীব প্রকৃতিতে তাঁহারই আংশিক সত্তা, মমৈবাংশ। এক অখণ্ড অধ্যাত্ম ঐক্যের জ্যোতিতে সকল বস্তুকেই ঈশ্বর বলিয়া অন্তরাত্মার যে-দৃষ্টি তাহার দ্বারা এই যোগের সকল সম্ভাব্য সঙ্কীর্ণতা অতিক্রমিত হইয়াছে।

ফলে হইয়াছে ভগবদ্-সত্তা সম্বন্ধে এক অখণ্ড দৃষ্টি, তাহা একই সঙ্গে বিশ্বের বিশ্বাতীত উৎপত্তিস্থল স্বরূপ পরম সত্তা, বিশ্বের শান্ত আধার স্বরূপ সর্ব্বভূতের নিরুপাধিক আত্মা, আবার সকল জীবে, ব্যক্তিতে, শক্তিতে, গুণে অনুস্যূত ভগবান; সেই অনুস্যূত ভগবদ্ সত্তাই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা,

কার্য্যকরী প্রকৃতি এবং আন্তর ও বাহ্য প্রকাশধারা। এক অদ্বিতীয়কে এইরূপ অখণ্ডভাবে দেখিয়া ও জানিয়াই জ্ঞানযোগ তাহার পরম পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কর্ম্মযোগ তাহার পূর্ণতম পরিণতি লাভ করিয়াছে সকল কর্ম্মকে তাহাদের অধীশ্বরের নিকট সমর্পণ করিয়া, কারণ প্রাকৃত যে মানব সে এখন কেবল তাঁহার ইচ্ছার একটি যন্ত্রমাত্র, নিমিত্ত মাত্র; ভক্তিযোগের প্রশস্ততম রূপগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্মের যে প্রগাঢ় সমন্বয়, প্রেম তাহাকে আত্মার সহিত পরমাত্মার উর্দ্ধতম, উদারতম, সমৃদ্ধতম মিলনের মধ্যে লইয়া গিয়া পূর্ণ পরিণতি প্রদান করে। সেই মিলনে জ্ঞানের প্রকাশসকল যেমন বুদ্ধির নিকটে তেমনিই হৃদয়ের নিকটেও সত্য হইয়া উঠে। সেই মিলনে যন্ত্ররূপে কর্ম্মকরার দুষ্কর আত্মবলি এক জীবন্ত ঐক্যের সহজ স্বচ্ছন্দ ও আনন্দময় অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়। অধ্যাত্ম মুক্তির সমগ্র পন্থাটি দেওয়া হইয়াছে; দিব্য কর্ম্মের সমগ্র ভিত্তিটি রচিত হইয়াছে।

দিব্যগুরু এইরূপে যে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জুনকে দিলেন, অর্জ্জুন তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। তাঁহার মন ইতিমধ্যেই সংশয় ও অন্বেষণ হইতে মুক্ত হইয়াছে; তাঁহার হৃদয় এখন জগতের বাহ্যদিক হইতে, ইহার বিভ্রান্তকারী বাহ্যদৃশ্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইহার পরম অর্থ ও উৎপত্তির দিকে, ইহার আভ্যন্তরীণ সত্যসকলের দিকে ফিরিয়াছে, ইতিমধ্যেই শোক ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছে, এবং এক দিব্য দৃষ্টির অনির্ব্বচনীয় আনন্দের স্পর্শ লাভ করিয়াছে। অর্জ্জুন যে ভাষায় তাঁহার স্বীকৃতি ব্যক্ত করিলেন তাহাতে পুনরায় এই জ্ঞানের সুগভীর সমগ্রতা এবং ইহার সর্ব্বতোমুখী শ্রেষ্ঠতা ও পূর্ণতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। যে অবতার, নর-রূপী

ভগবান, তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন, প্রথমতঃ, তাঁহাকে তিনি পরম ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, তিনি বিশ্বাতীত সর্ব্বাত্মক সত্তা, পরাৎপর, জীব যখন এই ব্যক্তজগৎ ও এই আংশিক প্রকাশ হইতে উঠিয়া তাহার মূলে ফিরিয়া যায় তখন সে তাঁহার মধ্যে বাস করে, পরং ধাম*। তাঁহাকে তাঁহার চিরমুক্ত সত্তার পরম পবিত্রতায় তিনি স্বীকার করিয়া লইলেন, পবিত্রম্ পরমম্; অক্ষর আত্মার চিরশান্ত ও স্থির নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে অহংকে লুপ্ত করিয়া দিয়া মানুষ এই পরম পবিত্রতায় উপনীত হয়। তাহার পর তিনি তাঁহাকে শাশ্বত সনাতন দিব্য পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, পুরুষম্ শাশ্বতম্ দিব্যং। তাঁহার মধ্যেই তিনি আদিদেবকে অভিবাদন করিলেন, যে অজাত পুরুষ সকল বিশ্বের সর্ব্বব্যাপী, অন্তর্যামী আত্ম-প্রসারী প্রভু তাঁহার স্তব করিলেন, আদিদেবমজং বিভুম্। যিনি সকল বর্ণনার অতীত, কারণ কিছুই তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিতে পারে না, ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ,† কি দেব, কি দানব কেহই তাঁহার অভিব্যক্তি জানে না, সেই আশ্চর্য্যময় পুরুষরূপেই যে তিনি তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইলেন শুধু তাহাই নহে, পরন্তু তিনি তাঁহাকে সর্ব্বভূতের অধীশ্বর এবং তাহাদের সকল রূপায়নের এক দিব্য কারণ বলিয়াও মানিয়া লইলেন,

---

* পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১০।১২

† সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ॥ ১০।১৪

তিনি দেবতাদেরও দেবতা, তাঁহা হইতেই সকল দেবতার উৎপত্তি, তিনি জগতের পতি, ঊর্দ্ধ হইতে তাঁহার পরম ও বিশ্বগত প্রকৃতির দ্বারা ইহাকে প্রকট করিতেছেন, পরিপালনও করিতেছেন, ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে*। অবশেষে তিনি তাঁহাকে আমাদের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত সেই বাসুদেব বলিয়া মানিয়া লইলেন যিনি তাঁহার বিশ্বব্যাপী সর্ব্বত্র-বিরাজিত সর্ব্ব-সংগঠনকারী বিভূতিসকলকে আশ্রয় করিয়া ইহ-সংসারের সকল বস্তু হইয়াছেন†।

এই সত্যকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি দিয়া, তাঁহার ইচ্ছাশক্তির আনুগত্য দিয়া, তাঁহার বুদ্ধির ধারণা দিয়া। এই জ্ঞানে এবং এই আত্মসমর্পণের সহিত ভগবানের যন্ত্ররূপে কর্ম্ম করিতে তিনি ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু এক স্থায়ী গভীরতর অধ্যাত্ম অনুভূতির জন্য তাঁহার হৃদয়ে ও ইচ্ছায় আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। এই যে সত্য ইহা কেবল পরমাত্মার কাছে তাঁহার নিজের আত্মজ্ঞানেই প্রকট—কারণ অর্জ্জুন বলিয়া উঠিলেন "কেবল তুমি, হে পুরুষোত্তম, নিজেকে দিয়া নিজেকে জান" স্বয়মেবাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম। এই যে জ্ঞান ইহা আসে আধ্যাত্মিক ঐক্যোপলব্ধির দ্বারা এবং প্রাকৃত মানবের হৃদয় ইচ্ছা বুদ্ধি বিনা সহায়ে নিজেদের ক্রিয়া দ্বারা ইহা লাভ করিতে সক্ষম হয় না, কেবল অসম্পূর্ণ মানসিক প্রতিচ্ছায়া পাইতে পারে, তাহাতে

* স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১০।১৫

† বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাং স্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১০।১৬

যত প্রকাশিত হয় তাহা অপেক্ষা আবরিত ও বিকৃত হয় অধিক। এই গুহ্য বিদ্যা শুনিতে হয় সেই সব ঋষির নিকট হইতে যাঁহারা সাক্ষাৎ সত্যকে দেখিয়াছেন, ইহার বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন এবং সত্তায় ও আত্মায় ইহার সহিত এক হইয়াছেন। "সকল ঋষি, দেবর্ষি নারদ অসিত দেবল ব্যাস প্রভৃতি তোমাকে এইরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন"*। অথবা যে অন্তর্যামী ভগবান আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের জ্বলন্ত দীপ তুলিয়া ধরেন তাঁহার নিকট হইতে দিব্য দৃষ্টি ও দিব্য শ্রুতি সহায়ে এই সত্যকে অন্তরের মধ্যেই লাভ করিতে হয়। স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে, "এবং তুমি স্বয়ংই আমাকে এইরূপ বলিতেছ।" একবার এই সত্য প্রকটিত হইলে, মনের সম্মতি, ইচ্ছাশক্তির সম্মতি এবং হৃদয়ের আনন্দ ও আনুগত্যসহ তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে; পরিপূর্ণ মানসিক শ্রদ্ধা এই তিনটিকে লইয়াই গঠিত। অর্জ্জুন ঠিক এইভাবেই সত্যটিকে গ্রহণ করিয়াছেন; সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব, "হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা যাহা কহিলে আমার মন সে-সমস্তই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে।" কিন্তু ইহা ছাড়াও প্রয়োজন আমাদের নিগূঢ় অধ্যাত্ম সত্তায় এই সত্যকে আয়ত্ত করা; আমাদের অন্তরতম অন্তরাত্মা চায় অলঙ্ঘনীয় অনির্ব্বচনীয় অধ্যাত্ম উপলব্ধি—মানসিক অনুভূতি তাহার কেবল উপক্রমণিকা বা ছায়ামাত্র, এবং সেই অধ্যাত্ম উপলব্ধি ব্যতীত অনন্তের সহিত পূর্ণ মিলন হওয়া সম্ভব নহে।

---

* আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১০।১৩

এখন সেই উপলব্ধি কেমন করিয়া লাভ করা যায় অর্জ্জুনকে সেই পন্থাই দেওয়া হইতেছে। মহান স্বতঃসিদ্ধ যে-সব দিব্য তত্ত্ব, সে-সব মনকে বিভ্রান্ত করে না। পরম পুরুষ ভগবানের ধারণা, অক্ষর পুরুষের অনুভূতি, সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে অনুস্যূত ভগবদ্ সত্তাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ, সচেতন বিশ্বপুরুষের স্পর্শ—এই সবের দিকে মন নিজেকে উন্মুক্ত করিতে পারে। একবার মন এই ধারণায় উদ্ভাসিত হইলে, মানুষ সহজেই পথটি অনুসরণ করিতে পারে এবং প্রথম প্রথম সাধারণ মানসিক অনুভূতি উপলব্ধি সকলের উপরে উঠা যতই কঠিন হউক, শেষ পর্য্যন্ত আত্মার অনুভূতিতে সেই সকল মূল সত্যে পৌছিতে পারে যাহারা আমাদের সত্তার এবং সর্ব্বভূতের সত্তার পশ্চাতে রহিয়াছে, আত্মনা আত্মানাম্। সে সহজেই ইহা পারে কারণ এই সকল জিনিষ একবার ধারণা করিতে পারিলেই স্পষ্ট সে-সবকে দিব্য সত্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়; আমাদের মানসিক সংস্কারাদির মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা ভগবানের এই সব উচ্চভাবকে স্বীকার করার পথে প্রতিবন্ধক হইতে পারে। কিন্তু কঠিন হইতেছে জগৎ বস্তুতঃ যেরূপ প্রতীয়মান হয় তাহার মধ্যেই ভগবানকে দেখা, প্রকৃতির এই বাস্তব সত্যের মধ্যে এবং এই সব ঘটনাপরম্পরার ছদ্মবেশের মধ্যে তাঁহার সন্ধান পাওয়া; কারণ এখানে সবই এই মহান ঐক্যসাধক ভাবের বিরোধী। কেমন করিয়া আমরা মানিয়া লই যে ভগবান রহিয়াছেন মানুষে, পশুতে, জড়পদার্থে? উত্তমে ও অধমে? মধুরে ও ভীষণে? শুভে ও অশুভে? ভগবান বিশ্বের সকল পদার্থে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ কোন ধারণা লইয়া যদি আমরা তাঁহাকে দেখি জ্ঞানের আদর্শ আলোকের মধ্যে, শক্তির মহত্ত্বের মধ্যে,

সৌন্দর্য্যের মনোহারিত্বের মধ্যে, প্রেমের কল্যাণকারিতার মধ্যে, আত্মার উদার বিশালতার মধ্যে, তাহা হইলে এই সকল মহৎ জিনিষের সহিত ইহাদের বিপরীত যে-গুলি বাস্তবে জড়িত রহিয়াছে, ইহাদিগকে ঢাকিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের দ্বারা সেই ঐক্যবোধ বিনষ্ট হইয়া যাইবে তাহা আমরা কেমন করিয়া নিবারণ করিব? আর যদি মানবীয় মন ও প্রকৃতির অপূর্ণতা সত্ত্বেও আমরা ভাগবত মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে পারি, তাহা হইলে যাহারা তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, আমরা ভগবদ্‌বিরোধী বলিতে যাহা বুঝি যাহারা কর্ম্মে ও স্বভাবে তাহারই প্রতিনিধি তাহাদের মধ্যে আমরা কেমন করিয়া ভগবানকে দেখিব? যদি সাধু সজ্জনের মধ্যে নারায়ণকে দেখা সহজ হয়, পাপীর মধ্যে, দুরাচারীর মধ্যে, পতিতা ও অন্ত্যজের মধ্যে তাঁহাকে দেখা কেমন করিয়া আমাদের পক্ষে সহজ হইবে? জগতের সকল ভেদ বৈষম্যের মধ্যে পরম পবিত্রতা ও ঐক্যের সন্ধান করিতে গিয়া জ্ঞানীকে দৃঢ়স্বরেই বলিতে হয় নেতি, নেতি, ইহা নয়, ইহা নয়। যদিও জগতের অনেক জিনিষেই আমরা ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক সায় দিতে পারি এবং বিশ্বমাঝে ভগবান রহিয়াছেন স্বীকার করিতে পারি, তাহা হইলেও অধিকাংশ জিনিষের সম্মুখেই মন কি পুনঃ পুনঃ বলিবে না, "ইহা নয়, ইহা নয়?" মানব মন সর্ব্বদা বাহ্য দৃশ্য ও ঘটনাবলীর মধ্যে আবদ্ধ, তাহার পক্ষে এখানে বুদ্ধির স্বীকৃতি, ইচ্ছাশক্তির সম্মতি, হৃদয়ের শ্রদ্ধা অনেক সময়েই কঠিন হইয়া পড়ে। অন্ততঃ কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ নিদর্শন প্রয়োজন, কতকগুলি এমন সূত্র ও সেতু প্রয়োজন যাহা ঐক্যবোধের কঠিন প্রয়াসের সহায় হইবে।

অর্জ্জুন এইরূপ সহায় ও নিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন, যদিও তিনি বাসুদেবই সব, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, এই দিব্য সত্য স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার হৃদয় ইহার আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে (কারণ ইতিমধ্যেই তিনি দেখিতেছেন যে এই সত্য তাঁহার মনের বৈকল্য ও ভেদবৈষম্য সকল হইতে তাহাকে মুক্ত করিতেছে, বিরোধসঙ্কুল জগতের সমস্যাসকলের দ্বারা বিভ্রান্ত তাঁহার সেই মন একটি সূত্র খুঁজিতেছিল, একটি দিশারী সত্যের সন্ধান করিতেছিল; এবং তাঁহার শ্রবণে ইহা অমৃতের ন্যায় অনুভূত হইতেছে, তৃপ্তির্হি নাস্তি মেঽমৃতম্।) তিনি অনুভব করিতেছেন যে পূর্ণ ও সুদৃঢ় উপলব্ধির দুরূহতা দুর করিবার জন্য ঐরূপ নিদর্শন ও আশ্রয় একান্ত প্রয়োজনীয়; কারণ তাহা না হইলে এই জ্ঞানকে কেমন করিয়া হৃদয়ের এবং জীবনের জিনিষ করিয়া তোলা যাইবে? তিনি সহায়ক নিদর্শন সকল জানিতে চাহিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার দিব্য বিভূতিসকল সম্পূর্ণভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে বলিলেন, প্রার্থনা করিলেন যেন তাঁহার দৃষ্টি হইতে কিছুই না বাদ পড়ে, আর যেন কিছুর দ্বারা তাঁহাকে বিভ্রান্ত হইতে না হয়*। তিনি বলিলেন, "তুমি যে-সকল বিভূতি দ্বারা সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ,

---

* বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥
কথং বিদ্যামহং যোগিং ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১০।১৬—১৮

তোমার সেই দিব্য আত্মবিভূতিসকল নিঃশেষে সমস্ত বর্ণনা কর। হে যোগিন্! আমি সদা সর্ব্বত্র তোমাকে চিন্তা করিয়া কিরূপে জানিব? হে ভগবান! কি কি প্রধান প্রধান ভাবে আমি তোমাকে চিন্তা করিব? এই যে যোগের দ্বারা তুমি সবের সহিত এক এবং সবের মধ্যে এক এবং সব তোমারই সত্তার পরিণাম, সবই তোমার প্রকৃতির ব্যাপক বা প্রকৃষ্ট বা প্রচ্ছন্ন শক্তি, সেই যোগ আমাকে বিস্তৃতভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা কর, এবং বার বার বল; আমার নিকটে ইহা অমৃত স্বরূপ, আমি যতই ইহা শ্রবণ করি না কেন, কিছুতেই আমার তৃপ্তি হইতেছে না। এখানে আমরা গীতার মধ্যে একটা জিনিষের ইঙ্গিত পাইতেছি, যেটি গীতা কোথাও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে নাই, কিন্তু উপনিষদের মধ্যে পুনঃ পুনঃ তাহার উল্লেখ আছে এবং পরে তাহা বৈষ্ণব ও শাক্ত-ধর্ম্মের দ্বারা গভীরতর দৃষ্টির সহিত বিকশিত হইয়াছিল—জগৎ মাঝে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহাতে মানুষের আনন্দলাভের সম্ভাবনা, বিশ্বানন্দ, জগজ্জননীর লীলা, ভগবদ্ লীলার মাধুরী ও সৌন্দর্য্য।

দিব্যগুরু শিষ্যের অনুরোধ রক্ষা করিলেন, কিন্তু প্রথমেই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, পূর্ণ উত্তর সম্ভব নহে। কারণ ভগবান অনন্ত এবং তাঁহার প্রকাশও অনন্ত। তাঁহার প্রকাশের রূপসকলও অসংখ্য। প্রত্যেক রূপই নিজের মধ্যে লুক্কায়িত কোন ভগবদ্ শক্তির প্রতীক, বিভূতি এবং যাঁহাদের দৃষ্টি আছে তাঁহারা দেখেন প্রত্যেক সসীম বস্তুই আপন আপন ভাবে অনন্তকে প্রকাশ করিতেছে। তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি তোমাকে আমার দিব্য বিভূতিসকল বর্ণনা করিব, তবে কেবল নিদর্শন হিসাবে প্রধান প্রধান বিভূতির কয়েকটি মাত্র বলিব; এমন

কতকগুলি জিনিষের দৃষ্টান্ত দিব যে-সবের মধ্যে তুমি খুব সহজেই ভগবানের শক্তি দেখিতে পাইবে, প্রাধান্যতঃ, উদ্দেশতঃ*। কারণ জগতে ভগবানের আত্মবিস্তারের অন্ত নাই, নাস্তি অন্তঃ বিস্তরস্য মে। এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া গুরু যে বর্ণনা আরম্ভ করিলেন, বর্ণনার শেষেও আবার তাহার উল্লেখ করিলেন এইটির উপর বিশেষ ভাবে জোর দিবার জন্য যেন এ-সম্বন্ধে আর কোনও ভুল না হইতে পারে। তাহার পর এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত আমরা পাই এই সকল প্রধান প্রধান দৃষ্টান্তের, জগতের মানুষ ও জিনিষসকলের মধ্যে যে ভগবদ্ শক্তি অনুস্যূত রহিয়াছে তাহার এই সব প্রকৃষ্ট লক্ষণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। প্রথমে মনে হয় যেন সেগুলি এলোমেলোভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোনও পারম্পর্য্য নাই; তথাপি সেই বর্ণনায় একটি বিশেষ সূত্র অনুসরণ করা হইয়াছে, যদি আমরা একবার সেই সূত্রটিকে ধরিতে পারি তাহা হইলে এখানকার বক্তব্যের নিগূঢ় অর্থ ও পরিণতি বুঝার পক্ষে সাহায্য হইবে। এই অধ্যায়টির নাম দেওয়া হইয়াছে, বিভূতি যোগ, এ-যোগটি অপরিহার্য্য। ভগবান বিশ্বে যাহা কিছু হইয়াছেন, শুভ অশুভ, পূর্ণতা অপূর্ণতা, আলো আঁধার, ভগবানের সমগ্র বিভূতির সহিতই সমানভাবে আমাদিগকে ঐক্য উপলব্ধি করিতে হইবে, তথাপি সেই সঙ্গেই আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ইহার মধ্যে একটা উত্তরোত্তর ক্রমবিকাশের শক্তি রহিয়াছে, বস্তুসকলের মধ্যে ভগবানের

---

* হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥ ১০।১৯

আত্মপ্রকাশের একটা ক্রমবর্দ্ধমান ধারা রহিয়াছে, একটি এমন স্তর-বিন্যাসের রহস্য রহিয়াছে যাহা আমাদিগকে নীচের ছদ্মবেশসকল হইতে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রকাশের ভিতর দিয়া বিশ্বপুরুষের উদার আদর্শ প্রকৃতির দিকে তুলিয়া লইয়া যায়।

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার আরম্ভ হইল সেই আদিতত্ত্বের উল্লেখ করিয়া যাহা এই বিশ্বপ্রকাশের সকল শক্তির মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। সেইটি এই যে, প্রত্যেক জীব প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ভগবান গুপ্তভাবে বাস করিতেছেন এবং তাঁহাকে সেখানে আবিষ্কার করা যায়; তিনি সকল জীব, সকল বস্তুর মন ও হৃদয়-গুহায় বাস করিতেছেন, তিনি তাহাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ জীবনধারার মর্ম্মস্থলে অন্তরাত্মা, যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু হইয়াছে বা হইবে তিনি সে-সবেরই আদি, মধ্য এবং অন্ত*। কারণ এই যে আভ্যন্তরীণ দিব্য আত্মা মন ও হৃদয়ের মধ্যে ইহাদের অগোচরে বাস করিতেছেন, এই যে জ্যোতির্ম্ময় অন্তর্বাসী তাহারই প্রতিনিধিরূপে প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত জীবাত্মার অগোচর, ইনিই নিরন্তর কালের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তনের বিকাশ করিতেছেন, এবং দেশের মধ্যে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক জীবনের বিকাশ করিতেছেন,—কাল ও দেশ আমাদের মধ্যে ভগবানেরই ভাবাত্মক গতি ও বিস্তার। সবই এই আত্মদর্শী আত্মা, আত্মবিকাশশীল অধ্যাত্ম সত্তা। কারণ সর্ব্বদা সকল জীবের মধ্য হইতে, সকল চেতন ও অচেতন সত্তার মধ্য হইতে, এই

---

* অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ১০।২০

অনুভূতিতে প্রতীয়মান হন। আবার দেশরূপে তিনিই সকল দিক হইতে আমাদের সম্মুখীন হন, লক্ষ লক্ষ তাঁহার শরীর, অসংখ্য তাঁহার মন, সর্ব্বভূতে তিনি প্রকাশমান ; আমরা আমাদের সকল দিকে তাঁহার মুখ দেখিতে পাই, ধাতা অহং বিশ্বতোমুখঃ। কারণ এই যে কোটি কোটি জীব ও বস্তু, সকলের মধ্যে, সর্ব্বভূতেষু, একই সঙ্গে ক্রিয়া করিতেছে তাঁহার আত্মা, চিন্তা ও শক্তির রহস্য, তাঁহার দিব্য সৃজন-প্রতিভা, তাঁহার আশ্চর্য্যময় গঠন-নৈপুণ্য এবং সম্বন্ধ, সম্ভাবনা এবং অনিবার্য্য কার্য্যকারণ-পরম্পরা নির্দ্ধারণের অভ্রান্ত নীতি। আবার তিনি জগতে সর্ব্বসংহারকর্ত্তা মৃত্যুরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হন, মনে হয় তিনি যেন সৃষ্টি করিতেছেন শুধু শেষকালে তাঁহার সৃষ্টিসকলকে ধ্বংস করিবার জন্যই, অহম্ মৃত্যুঃ সর্ব্বহরঃ। অথচ তাঁহার লীলাশক্তির কার্য্য বন্ধ হয় না, কারণ পুনর্জন্ম এবং নবসৃষ্টির শক্তি মৃত্যু ও ধ্বংসের সহিত সমান গতিতে চলিয়াছে, অহম্ উদ্ভবঃ চ ভবিষ্যতাম্। সর্ব্বভূতের অন্তর্নিহিত যে দিব্য আত্মা তাহাই বর্ত্তমানকে ধরিয়া রহিয়াছে, অতীতকে সংহরণ করিতেছে, ভবিষ্যতকে সৃষ্টি করিতেছে।

তাহার পর এই যে সব সজীব সত্তা, বিশ্বদেবতা, অতিমানব, মানব, মানবেতর প্রাণী, ইহাদের মধ্যে এবং সকল গুণ, শক্তি, বস্তুর মধ্যে—প্রত্যেক শ্রেণীর যাহা প্রধান, শীর্ষস্বরূপ, গুণে সর্ব্বোত্তম, তাহাই ভগবানের একটি বিশিষ্ট শক্তি, বিভূতি। ভগবান বলিলেন, আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, রুদ্রগণের মধ্যে শিব, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে রণদেবতা স্কন্দ, মরুদগণের মধ্যে মরীচি, যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে ধনপতি

কুবের, নাগগণের মধ্যে অনন্ত নাগ, বসুগণের মধ্যে অগ্নি, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, জনয়িতাদের মধ্যে প্রেমের দেবতা কন্দর্প, জলদেবতাগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, নিয়মস্থাপয়িতাগণের মধ্যে নিয়মের দেবতা যম, বায়ুগণের মধ্যে পবনদেবতা। আবার অন্যদিকে আমি জ্যোতি ও দীপ্তিগণের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য, নিশার নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র, তরঙ্গায়িত জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর, শিখরগণের মধ্যে সুমেরু, পর্ব্বতমালা সমূহের মধ্যে হিমালয়, নদীসকলের মধ্যে গঙ্গা, অস্ত্র সমূহের মধ্যে দিব্যাস্ত্র বজ্র। সকল লতা বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, অশ্বগণের মধ্যে ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত, বিহঙ্গগণের মধ্যে গরুড়, সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ বাসুকী, ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, মৎস্যগণের মধ্যে মকর, অরণ্যের পশুগণের মধ্যে সিংহ। আমি বৎসরের প্রথম মাস মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) ; ঋতুসমূহের মধ্যে আমি সুন্দরতম বসন্ত ঋতু।

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন, সজীব সত্তাসকলের মধ্যে আমি সেই চৈতন্য যাহার দ্বারা তাহারা নিজেদিগকে এবং নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহকে অবগত হয়। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন, মনের দ্বারাই তাহারা বস্তুসকলের জ্ঞান লাভ করে এবং তাহাদের উপর প্রতিক্রিয়া করে। তাহাদের মনের, চরিত্রের, শরীরের, কর্ম্মের সকল গুণই আমি। আমি কীর্ত্তি, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা ; তেজস্বিগণের তেজ আমি, বলবানগণের বল আমি। আমি দৃঢ়সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় ও জয় ; আমি পুণ্যবানগণের সত্ত্ব গুণ, চতুরগণের দ্যূত ছল ; আমি শাসকদের শাসন দণ্ড, জিগীষুদের নীতি। আমি গুহ্যবিষয়ের মৌন, জ্ঞানীর জ্ঞান, তার্কিকের

তর্কবুদ্ধি। অক্ষর-সমূহের মধ্যে আমি অ-কার, সমাস-সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বাক্য-সমূহের মধ্যে পূত একাক্ষর ওঁ-কার, ছন্দ-সমূহের মধ্যে গায়ত্রী, বেদ-সমূহের মধ্যে সামবেদ, এবং মন্ত্র-সমূহের মধ্যে বৃহৎ সাম। আমি গণকদের কাছে কাল। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি বিদ্যা-সমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা। মানুষের যাবতীয় সামর্থ্য আমি, বিশ্বের এবং বিশ্বের অন্তর্গত জীবসকলের যাবতীয় শক্তি আমি।

যাহাদের মধ্যে আমার শক্তিসকল মানবীয় সিদ্ধির উচ্চতম সীমায় উঠে, তাহারা সর্ব্বদা আমিই, আমার বিশেষ বিভূতি। আমি নরগণের মধ্যে নরাধিপ, নেতা, বীর, শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যোদ্ধাগণের মধ্যে আমি রাম, বৃষ্ণিগণের মধ্যে কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ঋষি আমার বিভূতি; মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু। মহান দ্রষ্টা, অনুপ্রাণিত কবি, যিনি ভাবের আলোকে এবং বাক্যের ধ্বনিতে সত্যকে দেখেন এবং প্রকট করেন, তিনিও আমি, মানবাধারে আমারই জ্যোতি; দ্রষ্টা-কবিগণের মধ্যে আমি উশনা। মুনি, মনীষী, দার্শনিকও মানুষের মধ্যে আমারই শক্তি, আমারই বৃহৎ মনীষা, মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস। কিন্তু প্রকাশ-ক্রমের যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, সকল জিনিষই আপন আপন ভাবে ও প্রকৃতিতে ভগবানেরই বিভিন্ন শক্তি; আমা ব্যতীত জগতে স্থাবর জঙ্গম, সজীব নির্জ্জীব, কিছুই থাকিতে পারে না। সর্ব্বভূতের আমি দিব্য বীজ, এবং সকলে সেই বীজেরই শাখা ও পুষ্প, আত্মায় বীজরূপে যাহা আছে, তাহাই তাহারা প্রকৃতিতে বিকাশ করিতে পারে। আমার দিব্য বিভূতিসকলের সীমা সংখ্যা নাই; আমি যাহা বলিলাম ইহা কেবল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, আমি কেবল কতকগুলি প্রধান

প্রধান ইঙ্গিতের আলোক দিয়াছি, এবং দৃঢ়ভাবে অসংখ্য সত্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছি। জগতে সুন্দর ও শ্রীমান যত জীব দেখিবে, মানবজাতির মধ্যে, তাহার ঊর্দ্ধে এবং তাহার নীচে যাহাকেই দেখিবে মহান এবং শক্তিমান তাহাকে আমার প্রভা, জ্যোতি, শক্তি বলিয়া এবং আমারই তেজের অংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া জানিবে। কিন্তু এই জ্ঞানের অত খুঁটিনাটি জানিবার প্রয়োজন কি? ইহাই জানিয়া রাখ যে, আমি এই জগতে এবং সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছি, আমি সকলের মধ্যে আছি এবং সকলের উপাদান; আমি ব্যতীত আর কিছুই নাই, আমাকে ছাড়া আর কিছুই নাই। আমি এই সমগ্র বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছি আমার অসীম শক্তির একটি মাত্রার দ্বারা, আমার অমেয় অধ্যাত্ম সত্তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের দ্বারা। এই সকল জগৎ শাশ্বত অপরিমেয় ভগবানের স্ফুলিঙ্গ, ইঙ্গিত, স্ফূরণ মাত্র।

বিভূতি তত্ত্ব

গীতার দশম অধ্যায়টি প্রথম দৃষ্টিতে যেরূপ মনে হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। যে মতবাদ সংসারের জীবন হইতে চরম মুক্তি চায়, মানব আত্মাকে সংসার-লীলা হইতে বিমুখ করিয়া বিশ্বের অতীত, সকল সম্বন্ধের অতীত সুদূর নিরুপাধিক সত্তার দিকে লইতে চায়, গীতার মধ্যে কেবল সেই মতবাদের সমর্থন খুঁজিতে গেলে এই দশম অধ্যায়ের প্রকৃত মূল্য ও মর্য্যাদা বুঝা যায় না। মানুষের মধ্যে ভগবান রহিয়াছেন—এই মহান সত্যই গীতার বাণী। তিনি ক্রমবর্দ্ধমান যোগশক্তির বলে নীচের প্রকৃতির মায়া আবরণ সরাইয়া নিজেকে প্রকাশিত করেন, মানবাত্মার সকাশে নিজের বিশ্ব-সত্তা প্রকট করেন, তাঁহার বিশ্বাতীত পরম ঐশ্বর্য্যসকল প্রকট করেন, মানুষের মধ্যে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যেই যে তিনি রহিয়াছেন তাহা স্পষ্টভাবেই দেখাইয়া দেন। এই যে দিব্যযোগ, মানুষের ভাগবত সত্তায় গড়িয়া উঠা, মানবাত্মার মধ্যে মানুষের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে ভগবানের আত্মপ্রকাশ, ইহারই ফলে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র অহং হইতে মুক্ত হইয়া এক দিব্য মানবতার ঊর্দ্ধতন প্রকৃতিতে উঠিতে সক্ষম হই। মর্ত্ত্যজীবনের জালে, গুণত্রয়ের জটিল বন্ধনে নহে, পরন্তু সেই উচ্চতর অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে বাস করিয়া, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মে ভগবানের সহিত এক হইয়া এবং নিজের সমস্ত সত্তাকে ভগবানে

অর্পণ করিয়া মানুষ চরমতম বিশ্বাতীত গতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু আবার সংসারের মধ্যেও কর্ম্ম করিতে পারে; সে কর্ম্ম তখন আর অজ্ঞানের কর্ম্ম থাকে না, ভগবানের সহিত ব্যষ্টিগত জীবের সত্য সম্বন্ধে, আত্মার সত্যতে, পূর্ণ অমৃতত্বে সে কর্ম্ম করা হয়; সে কর্ম্ম অহংয়ের জন্য সম্পাদিত হয় না, পরন্তু জগতে ভগবানের জন্যই সম্পাদিত হয়। অর্জ্জুনকে এই কর্ম্মের জন্য আহ্বান করা, সে নিজে কি সত্তা ও শক্তি এবং তাহার ভিতর দিয়া কোন্ মহান সত্তা ও শক্তির ইচ্ছা কার্য্য করিতেছে তাহা তাহাকে জানাইয়া দেওয়া, ইহাই মানবদেহধারী ভগবানের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেই ভগবান কৃষ্ণ তাহার রথের সারথি হইয়াছেন; এই জন্যই অর্জ্জুনের গভীর বিষাদ আসিয়াছিল, মানুষ সাধারণতঃ যে সব ক্ষুদ্র বাসনা ও আদর্শ লইয়া কার্য্য করে সে সবের প্রতি তাহার বিষম বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল; সে-সবের পরিবর্ত্তে তাহাকে উচ্চতর অধ্যাত্ম প্রেরণা দিবার জন্য ভগবান কুরুক্ষেত্রে, অর্জ্জুনের ভগবদ্ নির্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনের পরম মুহূর্ত্তে তাহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিলেন। অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার জন্য এবং যুদ্ধ করিতে ভগবদ্ আদেশ শুনাইবার জন্য এতক্ষণ তাহাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এখন সেই সময় আসন্ন; কিন্তু এই অধ্যায়ে বিভূতি-যোগের ভিতর দিয়া তাহাকে যে জ্ঞান দেওয়া হইবে, ইহা না হইলে অর্জ্জুন তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন না।

বিশ্ব-লীলার যে নিগূঢ়-রহস্য, গীতাতে তাহা আংশিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আংশিকভাবে, কারণ সে রহস্যের অনন্ত গভীরতাসকল কে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে? কোন্ মতবাদ, কোন্ দর্শন-শাস্ত্র

বলিতে পারে যে, এই অত্যাশ্চর্য্য বিশ্ব-লীলার সমস্ত রহস্য অল্প-পরিসরের মধ্যেই ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছে কিম্বা একটা সঙ্কীর্ণ মতবাদের মধ্যেই নিঃশেষে ধরিয়া দিয়াছে? কিন্তু গীতার যাহা উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যতটুকু আবশ্যক, গীতা তাহা প্রকাশ করিয়াছে। গীতাতে আমরা দেখিতে পাই, জগৎ কেমন করিয়া ভগবান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ভগবান জগতে অনুস্যূত রহিয়াছেন, জগৎ ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে; সর্ব্বভূত সকল সৃষ্টি মূলতঃ এক। আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতির অজ্ঞানে আবদ্ধ মানুষের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ কি, মানুষ কেমন করিয়া আত্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়, এক মহত্তর চৈতন্যে নব-জন্ম লাভ করে, নিজেরই উচ্চতর অধ্যাত্ম-সত্তায় উঠিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যখন প্রথমকার অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া এই নূতন আত্মদৃষ্টি ও চেতনা লাভ করা যায়, তখন সেই মুক্ত-পুরুষ তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত জগৎকে কি চক্ষে দেখিবে? যে বিশ্ব-লীলার মূল রহস্যটি সে পাইয়াছে, সেই বিশ্ব-লীলার প্রতি তাহার ভাব, তাহার আচরণ কিরূপ হইবে? প্রথমেই সে সর্ব্বভূতের ঐক্যজ্ঞান লাভ করিবে এবং সেই জ্ঞানের চক্ষুতেই সব কিছুকে দেখিবে। সে দেখিবে যে, তাহার চারিপাশে যাহা কিছু রহিয়াছে সে সব একই ভাগবত সত্তার আত্মা, রূপ, শক্তি। তখন হইতে সেই দৃষ্টিই হইবে তাহার চেতনার সমস্ত অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী প্রচেষ্টার আরম্ভ; ইহাই হইবে তাহার সকল কর্ম্মের মূল দৃষ্টি, অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা। সে দেখিবে সমস্ত বস্তু, সমস্ত জীব সেই একের মধ্যেই বাস করিতেছে, চলিতেছে, ফিরিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে, সেই দিব্য ও ও শাশ্বত সত্তার মধ্যে বিধৃত রহিয়াছে। কিন্তু সে আরও দেখিবে যে,

সেই এক সকলের মধ্যেই অধিবাসী, সকলের আত্মা, সকলের মধ্যেই মূল অধ্যাত্ম সত্তা; তিনি তাহাদের চেতন প্রকৃতিতে গুপ্তভাবে বিদ্যমান না থাকিলে তাহারা আদৌ বাঁচিতে পারিত না, চলিতে, ফিরিতে বা কর্ম্ম করিতে পারিত না, তাঁহার ইচ্ছা, শক্তি, অনুমতি বা প্রশ্রয় ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের বিন্দুমাত্র নড়া চড়া সম্ভব হইত না। সে দেখিবে যে, তাহারা নিজেরাও, তাহাদের আত্মা, মন, প্রাণ, শরীরাধার এ-সব সেই এক আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তারই শক্তি ও ইচ্ছার পরিণাম। তাহার কাছে সমস্তই হইবে সেই এক বিশ্বপুরুষের আত্মপ্রকাশ লীলা। সে দেখিবে যে, তাহাদের চেতনা সমগ্রভাবেই সেই বিশ্বপুরুষের চেতনা হইতে সমুদ্ভূত, তাহাদের শক্তি ও সঙ্কল্প সেই পুরুষেরই শক্তি ও সঙ্কল্প হইতে আহৃত এবং তাঁহারই আশ্রিত; তাহাদের আংশিক প্রকৃতি এখন যেরূপ রহিয়াছে তাহাতে তাহা ভগবানের প্রকাশ বা ছদ্মবেশ, রূপ বা বিকৃতি যাহাই মনে হউক না কেন, সে দেখিবে যে তাহা সেই বিশ্বপুরুষের মহত্তর দিব্য প্রকৃতি হইতেই সৃষ্ট। বাহত বস্তুসকল যেমনই বিসদৃশ বা বিশৃঙ্খল দেখা যাউক, যেমনই দুর্ব্বোধ্য হউক, তাহারা আর তাহার এই দৃষ্টির পূর্ণতাকে কিছুতেই এতটুকুও ক্ষুণ্ণ করিবে না বা তাহার বিরোধী হইবে না। সে যে মহত্তর চৈতন্যের মধ্যে উঠিয়াছে, এইটিই তাহার মূল ভিত্তি, তাহার চতুর্দ্দিকে এই জ্যোতির প্রকাশ অপরিহার্য্য, এইটিই যথার্থ দৃষ্টির একমাত্র সিদ্ধ পন্থা, এক সত্য যাহা দ্বারা অন্য সকল সত্যই সম্ভব হয়।

কিন্তু জগৎ ভগবানের কেবল আংশিক প্রকাশ, ইহা নিজেই ভগবান নহে। প্রাকৃত প্রকাশ যেমনই হউক না কেন, ভগবান তাহা হইতে

অনন্ত গুণে বড়। সকল সম্বন্ধের সকল বন্ধনের অতীত তাঁহার এই আনন্তে তিনি এত উচ্চে রহিয়াছেন যে, যত প্রকারেরই জগৎ হউক না কেন, বিশ্ব-প্রকৃতি যতই অনন্ত বৈচিত্র্যের সহিত অনন্তভাবে বিস্তৃত, প্রকট হউক না কেন, তাঁহাকে কিছুতেই সমগ্রভাবে প্রকাশ করিতে পারে না, নাস্তি অন্তঃ বিস্তরস্য মে। অতএব মুক্ত জীবের দৃষ্টি বিশ্বজগতের অতীতে পরম ভগবানকে দেখিবে। সে দেখিবে যে, জগৎ ভগবানের একটি রূপ কিন্তু তিনি সকল রূপের অতীত, দেখিবে যে, ভগবানের অনির্ব্বচনীয় নিরুপাধিক সত্তার মধ্যে জগৎ নিত্য হইলেও একটা গৌণ ক্রম। সে দেখিবে সকল সান্ত ও আপেক্ষিক বস্তু অনাপেক্ষিক অনন্ত ভগবানেরই এক একটি রূপ, এবং সকল সান্ত বস্তুর ঊর্দ্ধে এবং তাহাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়াও সে সেই একই ভগবানে পৌঁছিবে, প্রত্যেক প্রাকৃত ব্যাপার প্রাকৃত জীব এবং আপেক্ষিক ক্রিয়ার ঊর্দ্ধে সে সর্ব্বদা সেই একই ভগবানকে লক্ষ্য করিবে; এই সকলের দিকে এবং ইহাদের অতীতে দৃষ্টিপাত করিয়া সে ভগবানের মধ্যেই প্রত্যেকের অধ্যাত্ম সার্থকতার সন্ধান পাইবে।

এই সব তাহার মনের কাছে কেবল বুদ্ধির পরিকল্পনা মাত্র হইবে না, জগতের প্রতি এইরূপ মনোভাব কেবল একটা চিন্তার ধারা বা কর্ম্মোপযোগী মতবাদ মাত্র হইবে না। কারণ, তাহার জ্ঞান যদি কেবল এইরূপ পরিকল্পনামূলক হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে একটা দার্শনিক মতবাদ (philosophy), একটা মানসিক রচনা, তাহা অধ্যাত্ম জ্ঞান ও দৃষ্টি হইবে না, অধ্যাত্মভাব ও চেতনা হইবে না। ভগবান ও জগৎকে অধ্যাত্মভাবে দেখা কেবল মানসিক চিন্তামূলক একটা ক্রিয়া নহে,

এমনকি প্রধানতঃ বা মূলতঃও তাহা নহে। ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতি, মন যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মূর্ত্তি, বস্তু, ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করে ও অনুভব করে তাহারই মত বাস্তব, সুস্পষ্ট, সন্নিকট, নিত্য, কার্য্যকরী, নিবিড়। কেবল জড়ানুগত মনই ভাবে যে, ভগবান ও আত্মা একটা অবাস্তব পরিকল্পনা মাত্র, নাম, রূপ, প্রতীক বা কল্পনার সাহায্য ভিন্ন ভগবানকে দেখা যায় না, ধারণা করা যায় না। আত্মা আত্মাকে দেখে, দিব্যভাবাপন্ন চেতনা ভগবানকে দেখে ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষভাবে বা আরও অধিক প্রত্যক্ষভাবে, ঠিক সেইরূপ নিবিড়ভাবে বা আরও অধিক নিবিড়ভাবে, যেমন জড়ানুগত চৈতন্য জড়বস্তুকে দেখে। ইহা ভগবানকে দেখে, অনুভব করে, ধ্যান করে, ইন্দ্রিয়গোচর করে। কারণ অধ্যাত্ম চেতনার সম্মুখে সমস্ত দৃশ্যমান জগৎ প্রতীয়মান হয় যেন জড়ের জগৎ নহে, প্রাণের জগৎ নহে, এমন কি মনেরও জগৎ নহে, কিন্তু আত্মার জগৎ; মন প্রাণ ইত্যাদি তাহার নিকট প্রতীয়মান হয় যেন ভগবৎ-চিন্তা, ভগবৎ-শক্তি, ভগবৎ-রূপ। বাসুদেবের মধ্যে বাস করা, কর্ম্ম করা, ময়ি বর্ত্ততে, বলিতে গীতা ইহাই বুঝিয়াছে। অধ্যাত্ম চেতনা ভগবানকে যে ঐক্যবোধমূলক নিবিড় জ্ঞানের দ্বারা অবগত হয় তাহা এত অত্যন্ত ভাবে অধিক সত্য যে মনের প্রতীতি বা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি কখনই সেরূপ হইতে পারে না। এই ভাবেই ইহা সেই বিশ্বাতীত পুরুষকেও অবগত হয় যিনি সমস্ত জগৎলীলার পশ্চাতে ও ঊর্দ্ধে রহিয়াছেন, যিনি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন এবং চিরদিন ইহার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের বাহিরে অবস্থান করিতেছেন। আর এই ভগবান যে নিজের অপরিবর্ত্তনীয় শাশ্বত সত্তার দ্বারা জগতের সমস্ত পরিবর্ত্তন লীলাকে

ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, ধরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার সেই অক্ষর স্বরূপকেও ঐ অধ্যাত্ম চেতনা অবগত হয় সেইরূপ ঐক্যবোধের দ্বারা, আমাদের নিজেদের কালাতীত অপরিবর্ত্তনশীল অবিনাশী সত্তার সহিত ঐ অক্ষর স্বরূপের একত্ব উপলব্ধির দ্বারা; আবার এই ভাবেই ইহা সেই দিব্য পুরুষকেও জানিতে পারে যিনি এই সকল বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যে নিজেকে নিজে অবগত হন, যিনি নিজের চেতনায় এই সকল বস্তু ও জীব হইয়াছেন এবং নিজের অনুস্যূত ইচ্ছার দ্বারা তাহাদের চিন্তা ও রূপসকল গঠন করিয়া দিতেছেন, তাহাদের কর্ম্মসকল পরিচালন করিতেছেন ইহা ভগবানকে সকল সম্বন্ধের অতীত বিশ্বাতীত সত্তারূপে, বিশ্বের আত্মা রূপে, আবার জীবের আত্মা, অন্তর পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে নিগূঢ় জ্ঞানে অবগত হয়। এমন কি এই যে বাহ্য প্রকৃতি (external Nature), ইহাকেও সে অবগত হয় ঐক্য-বোধের দ্বারা এবং আত্মোপলব্ধির দ্বারা, কিন্তু সে ঐক্য বৈচিত্র্যের বাধক নহে, তাহা সম্বন্ধকে অস্বীকার করে না, বিশ্বলীলার একই শক্তির বিভিন্ন ক্রম, উচ্চতর এবং নিম্নতর ক্রিয়া স্বীকার করে। কারণ প্রকৃতি ভগবানের বিচিত্র আত্মপ্রকাশলীলার শক্তি, আত্ম-বিভূতি।

সাধারণ মানব মন অজ্ঞানের বশে জগতে প্রকৃতিকে যেরূপ দেখে, অথবা অজ্ঞানের পরিণামে উহা যেরূপ, এই অধ্যাত্ম চেতনা, জগৎ সম্বন্ধে এই অধ্যাত্ম জ্ঞান কিন্তু সে ভাবে দেখিবে না। এই প্রকৃতিতে অজ্ঞানের যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু অপূর্ণ বা দুঃখময় বা বিকৃত ও ঘৃণ্য, সে-সব ভগবানের প্রকৃতির একটা সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু নহে, কিন্তু তাহাদের পিছনে তাহাদের প্রকৃত মূল রহিয়াছে, তাহাদের পিছনে এমন অধ্যাত্ম

শক্তি আছে যাহার মধ্যে গিয়া তাহারা নিজেদের সত্য সত্তা ও সার্থকতা লাভ করিতে পারে। এক আত্মা ও সৃজনশীলা পরমা প্রকৃতি আছে, যাহার মধ্যে ভগবানের শক্তি ও সঙ্কল্প নিজের পূর্ণ স্বরূপ এবং শুদ্ধ প্রকাশের আনন্দ উপভোগ করে। জগতে আমরা যে-সব শক্তি ক্রিয়মান দেখিতে পাই, তাহাদের পূর্ণতম শক্তি সেইখানেই পাওয়া যায়। সেইটি আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় ভগবানের আদর্শ প্রকৃতিরূপে, সে প্রকৃতি পূর্ণ জ্ঞানের, পূর্ণ তেজ ও ইচ্ছাশক্তির, পূর্ণ প্রেম ও আনন্দের। তাহার অনন্ত গুণ, অগণন শক্তিসকল সেখানে আশ্চর্য্যভাবে বৈচিত্র্যময়, সে-সমুদয় সেই পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ তেজ, পূর্ণ প্রেম ও আনন্দের স্বতস্ফূর্ত্ত অপূর্ব্ব ও সামঞ্জস্যময় আত্মপ্রকাশ। সেখানে সবই হইতেছে সকল আনন্ত্যের বহুমুখী অবাধ ঐক্য। সেই আদর্শ ভগবদ্ প্রকৃতিতে প্রত্যেক শক্তি, প্রত্যেক গুণই শুদ্ধ, পূর্ণ, আত্মস্থ, আপন আপন ক্রিয়ায় সামঞ্জস্যময়, সেখানে কোন কিছুই নিজের স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ আত্মবিকাশের জন্য চেষ্টা করে না, সকলেই এক অনির্ব্বচনীয় ঐক্যের সহিত কর্ম্ম করে। সেখানে সকল ধর্ম্মই (ভগবদ্ শক্তি ও গুণের যাহা যথার্থ ক্রিয়া, গুণ কর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম) এক স্বচ্ছন্দ বহুমুখী ধর্ম্ম। ভগবানের সেই চিৎ শক্তি, তপঃ, অপরিসীম স্বাধীনতার সহিত কর্ম্ম করে, কোনও একমাত্র ধর্ম্ম বা নীতির বন্ধনে বদ্ধ থাকে না, কোনও এক সঙ্কীর্ণ পদ্ধতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না, নিজের অনন্তলীলার আনন্দ নিজেই উপভোগ করে, তাহার আত্মপ্রকাশের সত্যে কখনও পদস্খলন হয় না, তাহা চিরকাল পূর্ণ, সিদ্ধ।

কিন্তু আমরা যে জগতে বাস করিতেছি সেখানে রহিয়াছে নির্ব্বাচন

ও পার্থক্যের ভেদমূলক নীতি। সেখানে আমরা দেখিতে পাই, যে সকল শক্তি ও গুণ প্রকট হইতে চাহিতেছে তাহারা প্রত্যেকেই যেন শুধু নিজের জন্যই সচেষ্ট, প্রত্যেকেই চেষ্টা করিতেছে যে-কোনও উপায়ে যতদুর সম্ভব শুধু নিজেরই আত্মপ্রকাশ করিতে এবং অন্যান্য শক্তি ও গুণের নিজ নিজ স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের জন্য সহযোগী বা প্রতিযোগী চেষ্টার সহিত নিজের চেষ্টার ভাল বা মন্দ যাহা সম্ভব কোনও রকম একটা সামঞ্জস্য করিতে চাহিতেছে। এই দ্বন্দ্বময় পার্থিব প্রকৃতির মধ্যেও ভগবান অবস্থান করিতেছেন এবং এই সকল শক্তির ক্রিয়া যে নিগূঢ় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার অব্যভিচারী বিধানে সেই দ্বন্দ্বের মধ্যেই একটা সুসঙ্গতি আনিয়া দিতেছেন। কিন্তু এই সুসঙ্গতি আপেক্ষিক (relative); মনে হয় উহা এক মূল ভেদ হইতেই উত্থিত, বিভিন্ন জিনিষসকলের ঘাত প্রতিঘাতে একরকম সঙ্গতি হইয়াছে, কোনও মূল ঐক্য হইতে উহার উৎপত্তি নহে। অন্ততঃ মনে হয় যে, ঐ ঐক্য দমিত ও গুপ্ত রহিয়াছে, নিজেকে খুঁজিয়া পাইতেছে না, কখনই মিথ্যা ছদ্মবেশ ছাড়াইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে সক্ষম হইতেছে না। বস্তুতঃ ইহা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না, যতক্ষণ না এই পার্থিব প্রকৃতিতে আবির্ভূত ব্যষ্টিগত জীব নিজের মধ্যে সেই উচ্চতর দিব্য প্রকৃতির সন্ধান পাইতেছে যাহা হইতেই এই নীচের ক্রিয়ার উৎপত্তি। তথাপি জগতে যে সব গুণ ও শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, মানুষে, পশুতে, উদ্ভিদে, জড়পদার্থে নানাভাবে কর্ম্ম করিতেছে, যে কোনও রূপ তাহারা গ্রহণ করুক না কেন, তাহারা সকলেই দিব্য গুণ ও দিব্য শক্তি। সকল শক্তি ও গুণই ভগবানের শক্তি। প্রত্যেকেই ঊর্দ্ধে দিব্য প্রকৃতি হইতে

আসিয়াছে, এখানে নীচের প্রকৃতিতে নিজের আত্মপ্রকাশের জন্য চেষ্টা করিতেছে, এই সব বাধা প্রতিবন্ধকের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তব উপযোগিতার শক্তিকে বর্দ্ধিত করিতেছে, এবং যখন নিজের আত্মশক্তির শিখরে উঠিতেছে, তখন ভাগবত ভাবের সাক্ষাৎ প্রকাশের সমীপবর্ত্তী হইতেছে এবং উর্দ্ধে পরা আদর্শ দিব্য প্রকৃতির মধ্যে নিজের যে সিদ্ধ স্বরূপ সেই দিকে নিজেকে চালিত করিতেছে। কারণ প্রত্যেক শক্তিই ভগবানের সত্তা ও শক্তি, এবং শক্তির বিস্তার ও আত্মপ্রকাশ সকল সময়ে ভগবানেরই বিস্তার ও আত্মপ্রকাশ।

এমনও বলা যায় যে, আমাদের মধ্যে জ্ঞানের শক্তি, ইচ্ছার শক্তি, প্রেমের শক্তি, আনন্দের শক্তি, যে কোনও শক্তি খুব বাড়িয়া উঠিয়া নীচের রূপের গণ্ডীটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে এবং সেই শক্তি ভেদাত্মক ক্রিয়া হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের অসীমতা ও শক্তির সহিত যুক্ত হয়। ভগবানের দিকে টানের যখন পরাকাষ্ঠা হয়, তখন তাহা মনকে উচ্চতম জ্ঞানের পূর্ণতম দৃষ্টির ভিতর দিয়া মুক্ত করে, হৃদয়কে পূর্ণ প্রেম ও আনন্দের ভিতর দিয়া মুক্ত করে, সমস্ত জীবনকে এক উচ্চতর জীবন লাভের পূর্ণ ঐকান্তিক সঙ্কল্পের ভিতর দিয়া মুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু এই যে বিস্ফোরণের ফলে নীচের বন্ধন টুটিয়া যায়, আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতির উপর ভগবানের স্পর্শ হইতেই তাহা সম্ভব হয়; তাহা শক্তিটিকে সাধারণ সীমাবদ্ধ দ্বন্দ্বময় ক্রিয়া ও বিষয়সকল হইতে ফিরাইয়া শাশ্বতের দিকে, বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতীত সত্তার দিকে পরিচালিত করে, অনন্তের অভিমুখে, পূর্ণ ভগবানের অভিমুখে লইয়া যায়। সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া ভাগবত

শক্তি এইরূপ জীবন্তভাবে কার্য্য করিতেছে, এই সত্যই বিভূতি-তত্ত্বের ভিত্তি।

অনন্ত দিব্য শক্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং গুপ্তভাবে এই নীচের জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছে, পরা প্রকৃতি যে যয়া ধার্য্যতে জগৎ, কিন্তু ইহা নিজেকে পিছনে রাখে, প্রত্যেক প্রাকৃত সত্তার হৃদয়ে নিজেকে লুকাইয়া রাখে, সর্ব্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে, যতক্ষণ না জ্ঞানের জ্যোতিতে যোগমায়ার আবরণ বিদীর্ণ হইতে মানুষের অধ্যাত্ম সত্তার অর্থাৎ জীবের আছে দিব্য প্রকৃতি। সে হইতেছে এই প্রকৃতিকে ধরিয়া ভগবানের আবির্ভাব, প্রকৃতিঃ জীবভূতাঃ, এবং তাহার মধ্যে সমস্ত দিব্য শক্তি ও গুণ, ভাগবত সত্তার জ্যোতি, বল, শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কিন্তু এই যে নীচের প্রকৃতিতে আমরা বাস করিতেছি, এখানে জীব নির্ব্বাচনের ও বিশিষ্ট রূপায়ণের নীতি অনুসরণ করে, এবং এখানে শক্তির যে-কোন অংশ, যে-কোন গুণ বা অধ্যাত্ম-ভাব সঙ্গে লইয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অথবা তাহার আত্মপ্রকাশের বীজ স্বরূপ সম্মুখে আনিয়াছে, সেইটিই হয় তাহার স্বভাবের কার্য্যকরী অংশ, তাহার আত্মবিকাশের মূল ধর্ম্ম এবং সেইটিই তাহার স্বধর্ম্ম, তাহার কর্ম্মের নীতি নির্ণয় করিয়া দেয়। আর কেবল যদি ইহাই সব হইত তাহা হইলে কোনও সমস্যা বা বাধা থাকিত না, মনুষ্যের জীবন হইত ভাগবত সত্তার জ্যোতির্ম্ময় ক্রমবিকাশ। কিন্তু আমাদের জগতের এই যে নীচের শক্তি, অপরা প্রকৃতি, ইহার স্বরূপ হইতেছে অজ্ঞান ও অহঙ্কার, ইহা ত্রিগুণময়ী! অহঙ্কার এই প্রকৃতির স্বরূপ, সেইজন্য জীব নিজেকে ভেদাত্মক অহং বলিয়া ধারণা করে; তাহার ন্যায় অপরের

মধ্যেও স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের যে প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহার সহিত সহযোগে বা সংঘর্ষে অহংভাবের বশে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। সে জগৎকে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ধরিতে চায়, ঐক্য ও সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া নহে; অহংকেই জীবনের কেন্দ্র করিয়া সে বিরোধকে বাড়াইয়া তোলে। এই প্রকৃতির স্বরূপ হইতেছে অজ্ঞান, মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি এবং অপূর্ণ ও আংশিক আত্মপ্রকাশ, সেইজন্য সে নিজেকে জানিতে পারে না, নিজের সত্তার ধর্ম্ম সম্বন্ধে সজ্ঞান হইতে পারে না, কিন্তু বিশ্বশক্তির নিগূঢ় প্রেরণায় সংস্কারের বশে উহার অনুসরণ করে, কষ্টে সৃষ্টে, ভিতরে বহু দ্বন্দ্ব লইয়া অগ্রসর হয়, পথভ্রষ্ট হইবার খুব বেশী সম্ভাবনা থাকে। এই প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, সেইজন্য আত্মবিকাশের এই বিশৃঙ্খল ও কষ্টকর প্রয়াস নানা অক্ষমতার, বিকৃতির ও আংশিক আত্মোপলব্ধির রূপ গ্রহণ করে। যখন অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তিমূলক তমোগুণের আধিপত্য হয়, তখন সত্তার শক্তি দুর্ব্বল বিশৃঙ্খলায় সর্ব্বদা অক্ষমতার সহিত কর্ম্ম করে, অজ্ঞানের শক্তিসমূহের অন্ধ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করে, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিবার কোনও আকাঙ্ক্ষা রাখে না। যখন প্রবৃত্তি-বাসনা-ভোগ-মূলক রজোগুণের আধিপত্য হয়, তখন দেখা দেয় একটা সংগ্রাম, একটা চেষ্টা; শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পদে পদে স্খলন হয়, সে চেষ্টা হয় ব্যথাসঙ্কুল, উগ্র; ভ্রান্ত ধারণা, ভ্রান্ত পদ্ধতি ও আদেশের দ্বারা বিপথে চালিত হয়, সত্য ধারণা, পদ্ধতি ও আদর্শসমূহকে বিকৃত ও দূষিত করা হয়, বিশেষতঃ অহঙ্কারকে অতিশয়, এমন কি অতিমাত্রায় বাড়াইয়া দিবার প্রবণতা আসে। যখন জ্যোতি-স্থৈর্য্য-শান্তিমূলক সত্ত্বগুণের আধিপত্য হয়, তখন কর্ম্ম অধিকতর সুসমঞ্জস হয়, প্রকৃতিকে যথাযথ

ব্যবহার করা হয়; কিন্তু এই যে যথাযথ ব্যবহার ইহা ব্যক্তিগত জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, নীচের প্রকৃতির যে মানসিক বুদ্ধি, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি এই সবেরই উচ্চতর রূপের ঊর্দ্ধে উঠিবার সামর্থ্য থাকে না। এই জটিলতার জাল হইতে মুক্ত হওয়া, অজ্ঞান, অহং ও গুণত্রয়ের উপরে উঠা, প্রকৃতপক্ষে ইহাই দিব্য সিদ্ধিলাভের পথে প্রথম ধাপ। এইরূপে উপরে উঠিয়াই জীব তাহার নিজের দিব্য প্রকৃতির, নিজের সত্য জীবনের সন্ধান পায়।

অধ্যাত্ম চেতনায় জ্ঞানের যে মুক্ত দৃষ্টি তাহা জগৎকে দেখিবার সময় কেবল এই নীচের দ্বন্দ্বময়ী প্রকৃতিকেই দেখে না। আমরা যদি আমাদের এবং অপরের প্রকৃতির কেবল বাহিরের দৃশ্যমান দিকটাই অবলোকন করি, তাহা হইলে সেটা অজ্ঞানের চক্ষুতে দেখা হয়, তাহা হইলে আমরা ভগবানকে সর্ব্বত্র সমানভাবে জানিতে পারি না; সাত্ত্বিক জীবে, রাজসিক জীবে, তামসিক জীবে, দেবতায় ও দানবে, পাপাত্মায় ও পুণ্যবানে, জ্ঞানীতে ও মূর্খে, মহতে ও ক্ষুদ্রে, মানুষে, জন্তুতে, উদ্ভিদে, জড়জগতে সর্ব্বত্র সমানভাবে ভগবানকে দেখিতে পারি না। যিনি জ্ঞানের মুক্ত দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তিনি একই সঙ্গে তিনটি জিনিষ প্রকৃতির সমগ্র নিগূঢ় সত্য বলিয়া দেখেন। প্রথমেই তিনি দেখেন যে, সকলের মধ্যে ভগবদ্ প্রকৃতি গুপ্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, ক্রমবিকাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; তিনি দেখেন যে, এই ভগবদ্ প্রকৃতিই সকল বস্তুর প্রকৃত শক্তি, এই যে সব বিচিত্র গুণ ও শক্তির আপাতদৃষ্ট ক্রিয়া এসব সেই ভগবদ্ প্রকৃতি হইতেই সার্থকতা লাভ করিতেছে; আর তিনি এই সব ক্রিয়ার অর্থ ইহাদের আপন অহং ও অজ্ঞানের ভাষায় নহে, পরন্তু ভগবদ্

প্রকৃতির আলোকেই দেখিয়া থাকেন। সেই জন্যই তিনি দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পান যে, দেব ও রাক্ষস, মানুষ ও পশু ও পক্ষী ও সরীসৃপ, সাধু ও অসাধু, মূর্খ ও পণ্ডিত, ইহাদের কর্ম্মের মধ্যে যে বিভিন্নতা আপাত দৃষ্ট হয়, সে সব ভগবদ্ গুণ ও শক্তিরই নানা অবস্থায়, নানা ছদ্মবেশের ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি ছদ্মবেশের দ্বারা প্রতারিত হন না, কিন্তু প্রত্যেক ছদ্মবেশের অন্তরালেই ভগবানকে চিনিতে পারেন। তাঁহার দৃষ্টি বিকৃতি বা অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে কিন্তু অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া পিছনে আত্মার যে সত্য রহিয়াছে সেইখানে পৌঁছায়, বিকৃতি ও অপূর্ণতার মধ্যেও আত্মাকে দেখিতে পায়, দেখে যে আত্মা নিজে নিজেকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, নিজকে পাইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, নানারূপ আত্মপ্রকাশ ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া পূর্ণ আত্মজ্ঞানের অভিমুখে, নিজেরই অনন্ত ও পূর্ণতম সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। মুক্ত পুরুষের দৃষ্টি বিকৃতি ও অপূর্ণতার উপরেই অযথা ঝোঁক্ দেয় না, কিন্তু সকলকেই দেখিতে পারে হৃদয়ে পূর্ণ প্রেম ও উদারতার সহিত, বুদ্ধিতে পূর্ণ বোধের সহিত, আত্মায় পূর্ণ সমতার সহিত। তৃতীয়তঃ তিনি দেখেন আত্ম-প্রকাশের শক্তিসকল ভগবানের দিকেই উঠিতে চেষ্টা করিতেছে; যেখানেই তিনি দেখিতে পান গুণ ও শক্তির সমুচ্চ প্রকাশ, ভাগবত সত্তার প্রদীপ্ত শিখা, যেখানে তিনি দেখেন আত্মা মন প্রাণ নীচের প্রকৃতির সাধারণ স্তর হইতে উঠিয়া সমুজ্জ্বল জ্ঞান, মহান্ শক্তি, তেজ, সক্ষমতা, সাহস, বীরত্ব, প্রেম ও আত্মদানের কল্যাণময় মধুরতা, আবেগ ও মহিমা, পরম পুণ্য, মহৎ কর্ম্ম, মনোহর সৌন্দর্য্য ও সুষমা, দেবতুল্য সুন্দর সৃষ্টি, এই সব অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে, সেইখানেই তিনি সেইসবকে

শ্রদ্ধা করেন, অভ্যর্থনা করেন, উৎসাহিত করেন। আত্মার মুক্ত দৃষ্টি মহৎ বিভূতির মধ্যে দেখে যে মানুষের দেবত্ব জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে।

ইহা হইতেছে ভগবানকে শক্তিরূপে চেনা,—ব্যাপকতম অর্থে শক্তি, শুধু বলের শক্তি নহে পরন্তু জ্ঞানের, ইচ্ছার, প্রেমের, কর্ম্মের, পবিত্রতার, মধুরতার, সৌন্দর্য্যের শক্তি। ভগবান সৎ, চিৎ, আনন্দ; জগতের প্রত্যেক জিনিষ সৎএর শক্তি, চিৎএর শক্তি, আনন্দের শক্তি দ্বারা নিজকে বাহিরে প্রকট করিতেছে এবং নিজের দিব্যস্বরূপ লাভ করিতেছে; এই জগৎ ভগবদ্ শক্তির কর্ম্মের জগৎ। ঐ শক্তি অসংখ্য প্রকারের জীবে নিজেকে এখানে নানারূপে গড়িতেছে এবং প্রত্যেকের মধ্যেই তাহার বিশেষ বিশেষ শক্তি রহিয়াছে। প্রত্যেক শক্তিই ভগবানের নিজের এক একটি রূপ; ভগবান সিংহও হইয়াছেন আবার হরিণও হইয়াছেন, দানবও হইয়াছেন আবার দেবতাও হইয়াছেন, আকাশের উপর প্রদীপ্তমান অচেতন সূর্য্য হইয়াছেন, আবার পৃথিবীর উপর মননশীল মানুষও হইয়াছেন। গুণত্রয়ের ক্রিয়া হইতে যে বিকৃতির উদ্ভব তাহা কেবল একটা গৌণ ভাব, মুখ্য ভাব নহে; মূল জিনিষ হইতেছে ভগবদ্ শক্তি যাহা নিজের আত্মপ্রকাশের সন্ধান করিতেছে। উচ্চ মনীষা, বীর, নেতা, সিদ্ধগুরু, ঋষি, নবী, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সাধু, মানব-প্রেমিক, বড় কবি, বড় শিল্পী, বড় বৈজ্ঞানিক, আত্ম-সংযমী সন্ন্যাসী, জগজ্জয়ী শক্তিমান মানব, সকলের মধ্যে ভগবানই নিজেকে প্রকট করিতেছেন। কার্য্যটিও—মহৎ কাব্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ, গভীর প্রেম, মহৎ কর্ম্ম, দিব্য সিদ্ধি, এ-সবই ভাগবতলীলা, ভগবানের আত্মপ্রকাশ।

এই যে সত্য, সকল প্রাচীন শিক্ষা দীক্ষাই ইহাকে স্বীকার করিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে, কিন্তু আধুনিক মানব মনের একটা দিক এই সত্যের প্রতি কেমন যেন বিরূপ, ইহার মধ্যে কেবল বল ও শক্তির পূজাই দেখিতেছে, মনে করিতেছে এইভাবে শক্তিমানের পূজা করা অজ্ঞান-প্রসূত, ইহাতে মানুষকে হীন করা হয়, ইহা শুধু আসুরিক অতিমানবের তত্ত্ব। অবশ্য এই সত্যকে লোকে ভুলভাবে গ্রহণ করিতে পারে, বস্তুতঃ সকল সত্যকেই ভুলভাবে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু এই সত্যের যথাযোগ্য স্থান আছে, প্রকৃতির দিব্য ব্যবস্থায় ইহার অপরিহার্য্য ক্রিয়া আছে। গীতা সত্যটিকে সেই যথাস্থান ও যথার্থ রূপ দিয়াছে। সকল মানুষ, সকল জীবে ভাগবত সত্তা রহিয়াছে, এই জ্ঞানের উপর ঐ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; এই সত্য যেন উচ্চ নীচ, উজ্জ্বল ম্লান সকল প্রকার প্রকাশের প্রতি হৃদয়ের সমতা রাখার বিরোধী না হয়। মূর্খ, নীচ, দুর্ব্বল, অধম, পতিত, সকলের মধ্যেই ভগবানকে দেখিতে হইবে ও ভালবাসিতে হইবে। বিভূতিকেও যে পূজা করিতে হইবে, তাহা বাহ্যিক ব্যক্তিটিকে নহে, কিন্তু যে ভগবান তাহার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন সেই ভগবানকেই পূজা করিতে হইবে (তবে বিভূতির বাহ্য ব্যক্তিস্বরূপকে ভগবানের প্রতীক হিসাবে পূজা করা চলিতে পারে)। কিন্তু তাই বলিয়া এই সত্যটিকে অস্বীকার করা যায় না যে, প্রকাশেরও উচ্চ নীচ ক্রম আছে; প্রকৃতি তাহার আত্মপ্রকাশের ধারায় স্তরে স্তরে উর্দ্ধের দিকে চলিয়াছে, অনিশ্চিত, অস্পষ্ট, অস্ফুট প্রতীকসকল হইতে ভগবানের প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশের দিকে চলিয়াছে। প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তি, প্রত্যেক মহৎ কর্ম্ম, প্রকৃতির নিজেকে অতিক্রম করিবার সামর্থ্যের

নিদর্শন, এবং সর্ব্বশেষ ও পরম ঊর্দ্ধায়নের আশ্বাস। প্রকৃতির বিকাশে মানুষ নিজেই পশু পক্ষী সরীসৃপের তুলনায় একটা উচ্চতর ক্রম, যদিও সকলের মধ্যেই এক ব্রহ্ম রহিয়াছেন, সমং ব্রহ্ম। কিন্তু মানুষ নিজেকেও অতিক্রম করিয়া যত ঊর্দ্ধতম শিখরে উঠিতে পারে এখনও সেখানে পৌঁছায় নাই; ইতিমধ্যে যখনই তাহার মধ্যে আত্মবিকাশের কোনও মহত্তর শক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে, সেইটিকেই তাহার পরম ঊর্দ্ধগতির আশা ও সূচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যে-সকল অগ্রগামী মহাজন নিজেদের যে-কোনরূপ সিদ্ধির দ্বারা মানুষকে অতিমানবত্বের সম্ভাবনা দেখইয়া দেন বা সেই দিকে পরিচালিত করেন তাঁহাদের চিহ্নিত পথের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিলে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের অশ্রদ্ধা করা হয় না, বরং সে শ্রদ্ধা আরও উচ্চ, আরও গভীরতর অর্থে পূর্ণ হইয়া উঠে।

অর্জ্জুন নিজেই একজন বিভূতি; অধ্যাত্মবিকাশে তিনি একজন উচ্চস্তরের মানব, সমসাময়িক জনগণের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি, তিনি নারায়ণের, মানবরূপে অবতীর্ণ ভগবানের, নির্ব্বাচিত যন্ত্র। এক স্থানে গুরু সকলের পরম ও এক আত্মারূপে বলিয়াছেন, তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই, আবার অন্যান্য স্থলে তিনি বলিয়াছেন যে, অর্জ্জুন তাঁহার প্রিয়, তাঁহার ভক্ত, সেই জন্যই তিনি অর্জ্জুনের ভার লইয়াছেন, তাঁহাকে পথ দেখাইতেছেন, দৃষ্টি ও জ্ঞান দিবার জন্য তিনি অর্জ্জুনকেই নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। এখানে গুরুর কথায় বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ কোনই বিরোধ নাই। বিশ্বের আত্মারূপে ভগবদ্‌শক্তি সকলের প্রতিই সমান, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের কর্ম্ম অনুযায়ী ফল প্রদান করেন, কিন্তু পুরুষোত্তমের সহিত মানুষের একটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধও

আছে, যে-মানব তাঁহার নিকট আসে তিনিও বিশেষ করিয়া তাহার নিকটে যান। এই যে সব বীর ও শক্তিমান পুরুষ কুরুক্ষেত্রের মহাসমর প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছেন, ইহারা সকলেই ভগবানের ইচ্ছার যন্ত্র, প্রত্যেকের ভিতর দিয়া প্রত্যেকের স্বভাব অনুসারে ভগবানই কর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু তিনি তাহাদের অহংএর অন্তরালে থাকিয়া কর্ম্ম করিতেছেন। অর্জ্জুন এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন যখন তাঁহার এই অজ্ঞান আবরণ ভেদ করা যাইতে পারে এবং মানবদেহে অবতীর্ণ ভগবান তাঁহার বিভূতিকে তাঁহার কর্ম্মের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতে পারেন। এমন কি এইরূপ প্রকাশ অপরিহার্য্য। অর্জ্জুন এক মহান কর্ম্মের যন্ত্র, সে কর্ম্ম বাহ্যত অতি ভীষণ বটে, কিন্তু মানবজাতিকে প্রগতির পথে অনেকখানি অগ্রসর করাইয়া দিবার জন্য তাহা প্রয়োজনীয়, ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকে মানবজাতির যে প্রয়াস তাহার সহায়তায় এই যুদ্ধ একটি প্রধান ঘটনা। মানবের যুগবিবর্ত্তনের ইতিহাস, মানবের আত্মা ও প্রাণে ভাগবত সত্তারই ক্রমবর্দ্ধমান প্রকাশ এহ ইতিহাসের প্রত্যেক মহান ঘটনা ও অবস্থা ভগবানেরই এক একটি আবির্ভাব। অর্জ্জুন ভগবানের নিগূঢ় ইচ্ছার যন্ত্র, কুরুক্ষেত্রের মহান কর্ম্মী, তিনি যাহাতে কার্য্যটিকে ভগবানের কর্ম্ম বলিয়া জানিয়াই সজ্ঞানে করিতে পারেন সেই জন্য তাঁহাকে দিব্য মানব হইতে হইবে। কেবল তাহা হইলেই সে কর্ম্ম অধ্যাত্মভাবে প্রাণময় হইয়া উঠিবে, তাহার প্রকৃত আধ্যাত্মিক সার্থকতা, তাহার নিগূঢ় উদ্দেশ্যের জ্যোতি ও শক্তি লাভ করিবে। অর্জ্জুনকে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য আহ্বান করা হইল; তাঁহাকে দেখিতে হইবে যে, ভগবানই এই বিশ্বের অধীশ্বর, জগতের সকল জীব, সকল ঘটনার

উৎপত্তিস্থল, সমস্তই প্রকৃতিতে ভগবানের আত্ম-প্রকাশ, সর্ব্বত্র ভগবানকে দেখিতে হইবে। তাহার নিজের মধ্যে মানুষরূপে ও বিভূতিরূপে ভগবানকে দেখিতে হইবে, নীচ উচ্চ সকল স্তরের সত্তার মধ্যে ভগবানকে দেখিতে হইবে, উচ্চতম শিখরে ভগবানকে দেখিতে হইবে; দেখিতে হইবে মানুষও উন্নত অবস্থায় বিভূতি, সেখান হইতে পরম মুক্তি ও মিলনের মধ্যে উচ্চতম শিখরে উঠিতেছে। কাল যে সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতেছে, সেটিকেও ভগবানের রূপ, ভগবানের পদক্ষেপ বলিয়া দেখিতে হইবে,—সেই পদক্ষেপে জগতের যুগান্তর সাধিত হয়, মানুষের মধ্যে ভগবদ সত্তা সেই যুগান্তরের বেগকে অবলম্বন করিয়া জগৎ মাঝে বিভূতি রূপে ভগবদ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে করিতে লোকাতীত পরম সিদ্ধি লাভ করে। অর্জ্জুনকে এই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, এখন তাঁহাকে ভগবানের মহাকালরূপ দেখান হইবে এবং সেই রূপের সহস্র সহস্র মুখ হইতে মুক্ত বিভূতির প্রতি ভগবদ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসম্পাদনের নিমিত্ত আদেশ ঘোষিত হইবে।

বিশ্বরূপ দর্শন

সংহারক মহাকাল

বিশ্বরূপ দর্শন গীতার একটি সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত এবং কবিত্বশক্তিপূর্ণ অংশ, কিন্তু গীতার চিন্তাধারায় ইহার যে-বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে সেইটি সহসা ধরিতে পারা যায় না। ইহা যে একটি কবিত্বময় ও দিব্যার্থময় রূপক তাহা সুস্পষ্ট, এবং আমাদিগকে দেখিতে হইবে কি ভাবে ইহাকে আনা হইয়াছে, কি উদ্দেশ্যে আনা হইয়াছে, আবিষ্কার করিতে হইবে ইহার গূঢ়ার্থব্যঞ্জক অংশগুলির নির্দ্দেশ কি, তবেই আমরা ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিব। যে-অধ্যাত্মসত্তা ও শক্তি এই বিশ্বকে পরিচালিত করিতেছে তাহার জীবন্ত রূপ, অদৃশ্য ভগবানের দৃষ্ট মহত্ব, তাঁহার স্থূল শরীরটিই দেখিবার জন্য অর্জ্জুনের যে-ইচ্ছা তাহার দ্বারাই তিনি ইহাকে আহ্বান করিলেন। জগতের যে পরম গুহ্য অধ্যাত্ম তত্ত্ব তাহা তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, ভগবান হইতেই সব, সবই ভগবান এবং সকল বস্তুর মধ্যেই ভগবান বাস করিতেছেন, লুক্কায়িত রহিয়াছেন, এবং প্রত্যেক সসীম সত্তার মধ্যেই তাঁহাকে প্রকট করিতে পারা যায়*। যে-মোহ

---

* মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহঽয়ং বিগতো মম ॥ ১১।১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ১১।২

এমন দৃঢ়ভাবে মানুষের ইন্দ্রিয় ও মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, বস্তুসকল ভগবান ছাড়া নিজেদের মধ্যেই নিজেদিগকে লইয়া থাকিতে পারে অথবা প্রকৃতির অধীন কোনও জিনিষ স্বাধীনভাবে চলিতে পারে, নিজেদিগকে পরিচালিত করিতে পারে, এই ধারণা অর্জ্জুনের চিত্ত হইতে অপসারিত হইয়াছে, ঐটিই ছিল তাঁহার সংশয়ের, তাঁহার বিমূঢ়তার, তাঁহার কর্ম্ম-ত্যাগের প্রকৃত কারণ। এখন তিনি জানিয়াছেন যে, সত্তাসকলের উৎপত্তি ও লয়ের প্রকৃত অর্থ কি। তিনি জানিয়াছেন যে, দিব্য চৈতন্যময় আত্মার অব্যয় মাহাত্ম্যই এই দৃশ্য প্রপঞ্চের নিগূঢ় তত্ত্ব। সর্ব্বভূতের মধ্যে এই যে মহান শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তা, সবই তাঁহার যোগ এবং সকল ঘটনা সেই যোগেরই পরিণাম ও প্রকাশ, নিখিল প্রকৃতি সেই গোপন ভগবদ্ সত্তায় পূর্ণ এবং নিজের মধ্যে তাহাকে প্রকট করিতে প্রয়াসী। কিন্তু অর্জ্জুন সেই ভগবদ্‌সত্তার স্থূলরূপ ও শরীরটিও দেখিতে চান, যদি তাহা সম্ভব হয়*। তিনি তাঁহার গুণসকল শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার আত্মপ্রকাশের ধারা কি, ক্রম কি তাহাও বুঝিয়াছেন, কিন্তু এখন তিনি সেই তাঁহার অব্যয় আত্মরূপ দর্শন করান। অবশ্য তাঁহার নিষ্ক্রিয় অক্ষর সত্তার অরূপ স্তব্ধতা নহে, পরন্তু সেই পরম রূপ যাহা হইতে সকল তেজ ও কর্ম্মের উৎপত্তি, সকল রূপ যাহার ছদ্মবেশ, যিনি

---

* এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ১১।৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ১১।৪

বিভূতিতে নিজের শক্তি প্রকট করেন,—কর্ম্মের ঈশ্বর, জ্ঞান ও ভক্তির ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং তাহার সকল জীবের ঈশ্বর। এই মহত্তম সর্ব্বব্যাপী দর্শনের জন্য তাঁহাকে প্রর্থনা করান হইল কারণ এই ভাবেই বিশ্বরূপে প্রকট পরমাত্মার নিকট হইতে তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মে তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

অবতার উত্তর দিলেন, তোমাকে যাহা দেখিতে হইবে, মানবীয় চক্ষু তাহা ধরিতে পারে না, কারণ মানুষের চক্ষু কেবল জিনিবসকলের বাহ্যিক রূপই দেখিতে পায় অথবা তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকরূপে দেখে, ইহারা প্রত্যেকে অনন্ত রহস্যের কেবলমাত্র কয়েকটি দিকের আভাস দেয়*। কিন্তু দিব্যচক্ষু আছে, অন্তরতম দৃষ্টি, তাহার দ্বারা পরম ভগবানকে তাঁহার যোগশক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই চক্ষু এখন আমি তোমাকে দিতেছি। তুমি দেখিবে আমার নানাবিধ, নানা বর্ণের, নানা আকৃতির শত শত সহস্র সহস্র দিব্য রূপ; তুমি দেখিবে আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, মরুতগণ, অশ্বিনীকুমার দ্বয়; তুমি এমন অনেক অদ্ভুত জিনিষ দেখিবে

---

* ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥ ১১।৮
পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্‌
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ১১।৫-৭

যাহা কেহ কখনও দেখে নাই; আমার দেহের মধ্যে সমগ্র জগৎকে সংগ্রথিত ও একত্রিত দেখিতে পাইবে। এইটিই তাহা হইলে মূলভাব, ভিতরের অর্থ। ইহা হইতেছে বহুর মধ্যে এককে দর্শন, একের মধ্যে বহুকে দর্শন—সবই সেই এক। দিব্যযোগের চক্ষুতে এই যে দর্শন ইহাই মুক্তি আনিয়া দেয়, যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ছিল, যাহা কিছু হইবে সে-সবেরই সার্থকতা দেখাইয়া দেয়, সবেরই ব্যাখ্যা করিয়া দেয়। একবার এই দর্শন লাভ করিতে পারিলে এবং ইহাকে ধারণ করিতে পারিলে, ইহা ভগবদ্ জ্যোতির কুঠারে সকল সংশয় ও ভ্রান্তির মূল ছিন্ন করিয়া দেয় এবং সকল দ্বন্দ্ব, সকল বিরোধকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। এই যে দর্শন ইহা সামঞ্জস্য করে, ঐক্যসাধন করে। এই দর্শনে ভগবানকে যে-ভাবে দেখা যায় যদি তাহার সহিত আত্মা ঐক্যবোধ লাভ করিতে পারে (অর্জ্জুন এখনও তাহা পারেন নাই, তাই আমরা দেখি তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন), জগতে ভীষণ যাহা কিছু আছে সে-সবের ভীষণতা দূর হইয়া যায়। সেইটিকেও আমরা ভগবানেরই একটি রূপ বলিয়া দেখিতে পাই, এবং যখন আমরা ইহার মধ্যে তাঁহার দিব্য উদ্দেশ্যের সন্ধান পাই, শুধু এইটিকেই স্বতন্ত্রভাবে দেখি না, তখন আমরা সর্ব্বতোমুখী আনন্দ ও বিপুল সাহসের সহিত জগৎকে সমগ্রভাবেই বরণ করিয়া লইতে পারি, আমাদের উপর যে-কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছে অবিচলিত পদবিক্ষেপে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে পারি। যে-দিব্য জ্ঞান সকল জিনিষকে ঐক্যের দৃষ্টিতে দেখে, বিচ্ছিন্নভাবে আংশিকভাবে দেখে না এবং সেইজন্যই বিমূঢ় হয় না, আত্মা একবার সেই জ্ঞানে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে জগৎকে এবং যাহা কিছু সে দেখিতে ইচ্ছা করে

সবকেই নূতনভাবে আবিষ্কার করিতে পারে, যচ্চান্যদ্রষ্টুমিচ্ছসি। সকলের মধ্যে সম্বন্ধ-স্থাপনকারী, ঐক্য-স্থাপনকারী এই দৃষ্টির ভিত্তিতে সে দিব্য-জ্ঞান হইতে পূর্ণতর দিব্যজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

তাহার পর পরম ঐশ রূপ অর্জ্জুনের দৃষ্টিগোচর করা হইল*। সে-রূপ অনন্ত ভগবানের, তাঁহার মুখ সর্ব্বত্র এবং তাঁহার মধ্যে সমস্ত আশ্চর্য্যময় সৃষ্টি, তিনি তাঁহার সত্তার যে-সকল অপরূপ প্রকটন করিতেছেন তাহাদের শেষ নাই—সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত ভগবান তিনি, অসংখ্য চক্ষু দিয়া দেখিতেছেন, অসংখ্য মুখ দিয়া কথা কহিতেছেন, অসংখ্য দিব্য-অস্ত্রে তিনি যুদ্ধের জন্য সজ্জিত, দিব্য আভরণে ভূষিত, দিব্য-বস্ত্র-পরিহিত, দিব্য পুষ্পের মালায় অলঙ্কৃত, দিব্য সৌগন্ধ্যে

---

* এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১১।৯-১৪

অনুলিপ্ত। ভগবানের এই শরীরের এমন প্রভা যেন আকাশে একেবারে সহস্র সূর্য্য উদিত হইয়াছে। সেই দেবদেবের শরীরে সমগ্র জগৎ বহুধা বিভক্ত অথচ একীভূত দেখা যাইতেছে। অর্জ্জুন দেখিলেন অত্যাশ্চর্য্যময়, সুন্দর, ভীষণ ভগবান, জীবগণের অধিপতি, যিনি তাঁহার অধ্যাত্মসত্তার মহিমা ও মহত্ত্বে এই উদ্দাম ও বিকট, সুশৃঙ্খলাময় ও চমৎকার, মধুর ও ভয়ঙ্কর জগৎ প্রকটিত করিয়াছেন, এবং তিনি বিস্ময়ে, হর্ষে, ভয়ে অভিভূত হইয়া অবনতমস্তকে নমস্কারপূর্ব্বক ভক্তিপূর্ণবাক্যে করযোড়ে সেই বিরাট মূর্ত্তির স্তব করিতে লাগিলেন—"হে দেব, তোমার দেহে আমি সকল দেবতা, বিশেষ বিশেষ ভূতবর্গ, কমলাসনস্থ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং ঋষিগণ ও দিব্য সর্পগণকে দর্শন করিতেছি*। আমি দেখিতেছি

পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিনং চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥

অসংখ্য বাহু, অসংখ্য উদর, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য মুখ; সর্ব্বত্র আমি তোমার অনন্তরূপ দর্শন করিতেছি, কিন্তু হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, আমি তোমার অন্ত, মধ্য, আদি দেখিতে পাইতেছি না। আমি তোমাকে দেখিতেছি কিরীটী, গদাচক্রধারী, আমার চতুর্দ্দিকে দীপ্তিমান, তেজোপুঞ্জ তুমি দুর্ণিরীক্ষ্য, সর্ব্বব্যাপী দ্যুতি, সূর্য্য-প্রভ, অগ্নি-প্রভ অপ্রমেয়। তুমি পরম অক্ষর এবং তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের পরম আধার ও আশ্রয়, তুমিই শাশ্বত ধর্ম্মসমূহের অবিনশ্বর প্রতিপালক, তুমিই সনাতন পুরুষ।

কিন্তু এই মহান রূপের মধ্যেই ভীষণ সংহারকেরও মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই যে অপ্রমেয়, যাঁহার অন্ত নাই, মধ্য নাই, আদি নাই, ইহারই মধ্যে সকল জিনিষের উদ্ভব, স্থিতি ও লয় †। এই যে-ভগবান অসংখ্য বাহুর

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১১।১৫-১৮

† অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতম্ রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০

দ্বারা জগৎসমূহকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন এবং কোটি কোটি হস্তের দ্বারা সংহার করিতেছেন, সূর্য্য ও চন্দ্রসকল যাঁহার চক্ষু, ইঁহার মুখমণ্ডলে হুতাশন প্রজ্জ্বলিত, এবং নিজ তেজবহ্নিতে তিনি নিরন্তর নিখিল বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছেন। তাঁহার রূপ অতিশয় ভয়ঙ্কর ও চমৎকার; একাকীই তাহা দিক্‌সমূহে ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সমগ্র ব্যবধান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। ভীতান্তঃকরণে স্তব করিতে করিতে সুরসঙ্ঘ তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, মহর্ষি ও সিদ্ধগণ "শান্তি হউক, কল্যাণ হউক" ইহা বলিয়া তাঁহাকে বহুলভাবে স্তব করিতেছেন। দেবগণ, রুদ্রগণ, গন্ধর্ব্ব যক্ষ অসুরগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইতেছে। তাঁহার নয়নসকল প্রদীপ্ত ও বিশাল; তাঁহার মুখমণ্ডল করাল দ্রংষ্ট্রাযুক্ত এবং ভক্ষণ করিবার জন্য বিস্ফারিত; প্রলয় কালের হুতাশন সদৃশ তাঁহার ভীষণ আনন ‡। সেই মহাযুদ্ধে

অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্ব যক্ষাসুর সিদ্ধসংঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥ ২২

‡ রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহুরুপাদম্।

উভয়পক্ষের নৃপতিগণ, সেনাপতিগণ, বীরগণ তাঁহার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক মুখসমূহের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করিতেছেন, দেখা যাইতেছে কেহ কেহ তাঁহার বিশাল দংষ্ট্রার সন্ধিস্থলে সংলগ্ন, তাঁহাদের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া

বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহহম্ ॥২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাহসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥২৭

যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥২৮

যাইতেছে ; যেমন বহু নদী সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয় অথবা যেমন পতঙ্গগণ প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনিই লোকসমূহ অবশভাবে মরণের নিমিত্ত অতি বেগে তাঁহার অগ্নিময় মুখসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সেই সকল প্রদীপ্ত বদন লইয়া সেই করাল মূর্ত্তি চারিদিক লেহন করিতেছেন, সমগ্র জগৎ তাঁহার অগ্নিময় তেজে পরিব্যাপ্ত এবং তাঁহার অত্যুগ্র দীপ্তিতে সন্তপ্ত। জগৎ এবং তাহার লোকসমূহ ধ্বংস-ভয়ে কম্পিত ও ব্যথিত, এবং চারিদিকে যে ভয় ও যন্ত্রণা অর্জ্জুনও তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি সেই করাল মূর্ত্তি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই উগ্র মূর্ত্তিধারী তুমি কে, আমাকে বল। হে দেববর, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। আদিপুরুষ তোমাকে জানিবার আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে, কারণ তোমার সঙ্কল্প ও কর্ম্মধারা আমি বুঝিতেছি না।"

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০

আখ্যা হি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১

অর্জ্জুনের এই যে শেষ প্রশ্ন ইহার মধ্যে বিশ্বরূপের দুইটি ভাবের ইঙ্গিত রহিয়াছে। এইটি হইতেছে সনাতন চির-পুরাতন বিশ্বপুরুষের রূপ, সনাতনম্ পুরুষম্ পুরাণম্, ইনিই চিরকাল সৃষ্টি করিতেছেন কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ইঁহারই দেহে দৃশ্য দেবগণের মধ্যে একজন, তাঁহা হইতেই সর্ব্বদা জগতের স্থিতি কারণ তিনিই শাশ্বত ধর্ম্মসকলের প্রতিপালক, কিন্তু তিনিই আবার সর্ব্বদা ধ্বংস করিতেছেন যেন পুনরায় নূতন সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি কাল, তিনি মৃত্যু, তিনি শান্ত ও মহিমাময় নটরাজ রুদ্র, তিনি কালী মুণ্ডমালা পরিয়া উলঙ্গিনী হইয়া সমরে নৃত্য করিতেছেন এবং নিহত অসুরগণের শোণিতে নিজেকে রঞ্জিত করিতেছেন, তিনিই ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত, দাবানল, ভূমিকম্প, তিনিই দুঃখ দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব, ধ্বংস এবং সর্ব্বগ্রাসী সমুদ্র। আর এই যে তাঁহার শেষোক্ত রূপ, এইটিই তিনি এখন সম্মুখে ধরিলেন। এই রূপের সম্মুখ হইতে মানুষের মন স্বভাবতঃই প্রত্যাবৃত্ত হয়, এবং সে চক্ষু মুদিয়া থাকে এই আশায় যে সে নিজে না দেখিলে হয়ত বা সেই ভীষণ মূর্ত্তি তাহাকে দেখিতে পাইবে না। মানুষের দুর্ব্বল হৃদয় শুধু চায় মনোরম ও আরামদায়ক সত্য, আর তাহা না পাওয়া গেলে চায় মনোরম মিথ্যা কাহিনী, ইহা সত্যকে তাহার পূর্ণতায় চায় না কারণ তাহার মধ্যে অনেক কিছুই আছে যাহা স্পষ্ট নহে, মনোরম নহে, আরামপ্রদ নহে, পরন্তু বুঝা কঠিন এবং সহ্য করা আরও কঠিন। অপক্ক ধর্ম্মপন্থী, তরলবুদ্ধি আশাবাদী, ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী, ইন্দ্রিয় ও হৃদয়াবেগের দাস মানুষ, নির্ম্মম সিদ্ধান্ত সকলকে, বিশ্বজগতের কর্কশ ও ভীষণ দিকগুলিকে বিকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা উড়াইয়া দিতে চায়। ভারতের ধর্ম্মকে অনেকেই

অজ্ঞভাবে নিন্দা করিয়া থাকে কারণ উহা এই লুকোচুরি খেলায় যোগ দেয় নাই, বরং ভগবানের যেমন মধুর ও সুন্দর ভাবগুলির তেমনিই ভীষণ ভাবগুলিরও প্রতীক গড়িয়া তুলিয়াছে এবং সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়াছে। কিন্তু ইহার সুদীর্ঘ চিন্তাধারা ও অধ্যাত্মসাধনার গভীরতা ও উদারতার কল্যাণে ইহা এই সব দৌর্ব্বল্যসূচক সঙ্কোচ অনুভব করে নাই বা সে-সবকে প্রশ্রয় দেয় নাই।

ভারতের আধ্যাত্মিকতা জানে যে, ভগবান প্রেমময়, শান্তিময় এবং সুস্থির শাশ্বত,—যে গীতা আমাদিগকে এই সব ভীষণ রূপ দর্শন করাইয়াছে, সেই গীতাই বলিয়াছে যে, ভগবান সর্ব্বভূতের প্রেমিকরূপে, সুহৃদরূপে তাহাদের মধ্যে প্রকট। কিন্তু তাঁহার দিব্যভাবে জগৎপরিপালনের নির্ম্মম দিকও রহিয়াছে, ধ্বংসের দিক, এবং তাহা প্রথম হইতেই আমাদের চক্ষে পড়ে; এইটিকে দেখিতে অস্বীকার করার অর্থ ভগবদ প্রেম, শান্তি, নির্ব্বিকারতা ও আনন্তের পূর্ণ মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হওয়া, এমন কি তাহার উপরে একটা পক্ষপাত ও মিথ্যার ভাব আরোপ করা হয়, কারণ ইহাকে যে একান্ত প্রীতিদায়ক রূপ দেওয়া হয়, আমরা যে জগতে বাস করিতেছি তাহার প্রকৃতির সহিত সোটর মিল হয় না। এই যে আমাদের সংগ্রামের, কষ্টকর প্রয়াসের জগৎ, ইহা ভীষণ, বিপজ্জনক, ধ্বংসকারী, গ্রাসকারী জগৎ, এখানে জীবনের অস্তিত্ব ক্ষণভঙ্গুর, মানুষের আত্মা ও দেহ এখানে অসংখ্য বিপদের মধ্যে বিচরণ করে, এইটি এমন জগৎ যে এখানে আমাদের প্রতি পদবিক্ষেপে, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, কোন কোন জিনিষকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হয়, এখানে জীবনের প্রত্যেক নিশ্বা

মরণেরও নিশ্বাস। যাহা কিছু অশুভ বলিয়া, ভীষণ বলিয়া আমাদের মনে হয়, সে-সবের দায়িত্ব একটি প্রায়-সর্ব্বশক্তিমান সয়তানের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া, অথবা প্রকৃতির অংশ বলিয়া উপেক্ষা করা এবং এই-ভাবে ভগবদ্ প্রকৃতি এবং জাগতিক প্রকৃতির মধ্যে এক অনতিক্রমনীয় ব্যবধানের সৃষ্টি করা, যেন প্রকৃতি ভগবান ছাড়া একটা কিছু, অথবা সমস্ত দায়িত্ব মানুষ এবং তাহার পাপের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, যেন জগৎ কিরূপ হইবে সে-বিষয়ে তাহার মতের খুব প্রাধান্য ছিল বা সে ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু সৃষ্টি করিতে পারিত,—এইসব কৌশলের দ্বারা লোকে যে কোনরকমে নিজেদিগকে ভুলাইতে চায়, ভারতের অধ্যাত্ম চিন্তাধারা কখনও এ-সবের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। আমাদিগকে সাহসভরে সত্যের দিকে চাহিয়া দেখিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যে, আর কেহ নহে স্বয়ং ভগবানই নিজের সত্তার মধ্যে এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এম্নি করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, প্রকৃতি নিজের সন্তানগণকে উদরসাৎ করিতেছে, কাল জীবসকলের জীবন গ্রাস করিতেছে, সর্ব্বব্যাপী ও অপরিহার্য্য মৃত্যু, এবং মানুষে ও প্রকৃতিতে রুদ্র শক্তিসকলের প্রচণ্ডতা, এই সবই হইতেছে পরম ভগবানের বহু বিশ্বরূপের একটি রূপ। আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, ভগবান মুক্ত-হস্ত অমিত সৃষ্টিকর্ত্তা, সাহায্যদাতা, শক্তিমান ও করুণাময় রক্ষাকর্ত্তা, আবার সেই ভগবানই গ্রাসকর্ত্তা ও ধ্বংসকর্ত্তা। সুখ ও মাধুর্য্য ও আনন্দ যেমন তাঁহার স্পর্শ, তেমনই যে দুঃখ ও অশুভের পীড়ন-যন্ত্রে আমরা দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করি তাহাও তাঁহারই স্পর্শ। যখন আমরা পূর্ণ মিলনের দৃষ্টি লইয়া দেখি এবং

আমাদের সত্তার গভীরতম প্রদেশে এই সত্য অনুভব করি, কেবল তখনই আমরা সেই ছদ্মবেশেরও পশ্চাতে সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবানের শান্ত ও সুন্দর মুখ পূর্ণভাবে আবিষ্কার করিতে পারি, এবং এই যে বেদনার স্পর্শ আমাদের দোষ ত্রুটির পরীক্ষা করে তাহার মধ্যেও মানুষের বন্ধুর, মানুষের অধ্যাত্মজীবন-বিকাশকর্ত্তার সন্ধান পাইতে পারি। জগতে যে-সব দ্বন্দ্ব বিরোধ, সে-সব ভগবানেরই দ্বন্দ্ব বিরোধ, আর কেবল সেই সবকে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহাদের মধ্য দিয়া যাইয়াই আমরা তাঁহার পরম সামঞ্জস্যের মহত্তর সুসঙ্গতিগুলির মধ্যে, তাঁহার বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত আনন্দের শিখর ও অনন্তপ্রসারী পুলকস্পন্দনসকলের মধ্যে উপনীত হইতে পারি।

গীতা যে-সমস্যাটি তুলিয়াছে এবং তাহার যে সমাধান দিয়াছে, তাহাতে বিশ্বপুরুষকে এই স্বরূপেই দেখাইতে হয়। সমস্যাটি হইতেছে এক বিরাট যুদ্ধের, ধ্বংসের, হত্যাকাণ্ডের যাহা সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবদিচ্ছার দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহাতে চির-অবতার নিজে প্রধান যোদ্ধার রথের সারথিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই রূপ যিনি দর্শন করিতেছেন তিনি নিজেই সেই প্রধান যোদ্ধা, সংগ্রামপরায়ণ মানবাত্মার প্রতিভূ তিনি, তাঁহাকে তাঁহার ক্রমবিকাশের পথে বাধাস্বরূপ নির্ম্মম ও অত্যাচারী শক্তিসকলকে দমন করিতে হইবে এবং এক উচ্চতর অধিকারের, মহত্তর ধর্ম্মের রাজ্য স্থাপন ও উপভোগ করিতে হইবে। যে-বিরাট উপপ্লবে আত্মীয় আত্মীয়কে হত্যা করে, জাতিসকল সমূলে বিনষ্ট হয়, সমগ্র সমাজই বিশৃঙ্খলা ও অনাচারের আবর্ত্তে ডুবিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়, তাহার ভীষণ স্বরূপে বিকল হইয়া তিনি পিছাইয়া

পড়িয়াছেন, নিয়তির নির্দ্ধারিত কর্ম্ম করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন এবং তাঁহার দিব্য বন্ধু ও দিশারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কেন তাঁহাকে এই ভীষণ কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইল, কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি? তখন তাঁহাকে দেখান হইয়াছে, যে-কোন কর্ম্মই সে করুক না কেন, কেমন করিয়া ব্যক্তিগতভাবে সেই কর্ম্মের বাহ্যিক স্বরূপের উপরে উঠা যায়, কেমন করিয়া দেখা যায় যে, কার্য্যনির্ব্বাহকশক্তিরূপিণী প্রকৃতিই কর্ম্মের কর্ত্তা, তাঁহার প্রাকৃত সত্তা যন্ত্রস্বরূপ, ভগবান প্রকৃতির এবং কর্ম্মসকলের অধীশ্বর, কোনরূপ বাসনা বা স্বার্থপরতা না রাখিয়া সকল কর্ম্মই যজ্ঞরূপে তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহাকে আরও দেখান হইয়াছে যে, ভগবান এই সব জিনিষের ঊর্দ্ধে রহিয়াছেন, তাহাদের-স্পর্শের অতীত, অথচ তিনি মনুষ্যে ও প্রকৃতিতে ও তাহাদের কর্ম্মে নিজেকে প্রকট করিতেছেন এবং সংসারের সব কিছুই ভগবানের এই লীলাবর্ত্তের অঙ্গ। কিন্তু এখন তাঁহাকে এই সত্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহের সম্মুখীন করা হইল, এই মহান ভগবদ রূপের মধ্যে তিনি ভীষণতা ও ধ্বংসের দিকটিকে অতিশয় পরিবর্দ্ধিতাকারে দেখিলেন, তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হইয়া উঠিল। কারণ সর্ব্বাত্মাকে এমন করিয়া প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে প্রকট করিতে হয় কেন? এই যে মর-জীবন সৃজন ও ধ্বংসের বহ্নি, এই জগৎব্যাপী সংগ্রাম, অনর্থকারী বিপ্লবের এইরূপ পুনঃ পুনঃ সংঘটন, জীবগণের এই কষ্টকর প্রয়াস, নিদারুণ দুঃখ ও যন্ত্রণা ও মৃত্যু—এ-সবের কি অর্থ? তিনি সেই পুরাতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শাশ্বত প্রার্থনা ব্যক্ত করিলেন—"আমাকে বল, এই উগ্রমূর্ত্তিধারী তুমি কে? আদিপুরুষ তোমাকে

জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে; কারণ আমি তোমার সঙ্কল্প ও কর্ম্মধারা কিছুই জানি না। তুমি প্রসন্ন হও"*।

ভগবান উত্তর দিলেন, ধ্বংসই আমার সঙ্কল্প ও কর্ম্মধারা, সেই সঙ্কল্প লইয়াই আমি এই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ("ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র" মানবের কর্ম্মক্ষেত্রেরই রূপক) দণ্ডায়মান হইয়াছি, মহাকালের গতিতে এই জগৎব্যাপী ধ্বংসকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই দৃষ্ট আমার এক উদ্দেশ্য আছে, তাহা অনিবার্য্যরূপেই সিদ্ধ হইবে, কোন মানুষ যোগ দিক বা না দিক কিছুতেই সে-উদ্দেশ্যকে বাধা দিতে, পরিবর্ত্তন করিতে বা ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না; মানুষ পৃথিবীতে আদৌ তাহা সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে আমার সঙ্কল্পের শাশ্বত দৃষ্টিতে আমি পূর্ব্বেই সব করিয়া রাখিয়াছি। মহাকালরূপে আমাকে পুরাতন সংগঠন সকলকে ধ্বংস করিতে হয় এবং নূতন, মহান, গরিমাময় রাজ্য গড়িয়া তুলিতে হয়। এই যুদ্ধ তুমি নিবারণ করিতে পারিবে না, ইহাতে ভাগবত শক্তি ও জ্ঞানের মানবীয় যন্ত্রস্বরূপ তোমাকে ধর্ম্মের জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে এবং ধর্ম্মবিরোধী-গণকে নিধন করিতে হইবে, জয় করিতে হইবে। প্রকৃতিতে আবির্ভূত মানবাত্মা তুমি, আমি প্রকৃতির ক্ষেত্রে তোমাকে যে ফল প্রদান করিব, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের রাজ্য, তাহাও তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। ইহাই

---

* আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ১১।৩১

যেন তোমার পক্ষে যথেষ্ট হয়—তোমার আত্মায় ভগবানের সহিত এক হওয়া, তাঁহার আদেশ মাথা পাতিয়া লওয়া, তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদন করা, জগতে এক মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতেছে, শান্তভাবে তাহা অবলোকন করা। "আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছি, লোকসকলকে ধ্বংস করাই এখানে আমার সঙ্কল্প ও কর্ম্মধারা। তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধাগণের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবে না*। অতএব উঠ, যশোরাশি লাভ কর, তোমার শত্রুগণকে জয় করিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর। তাহারা ইতিপূর্ব্বে আমারই দ্বারা নিহত হইয়া আছে, হে সব্যসাচিন্! তুমি নিমিত্তমাত্র হও। আমার দ্বারা যাহারা নিহত হইয়াছে সেই দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য বীর

* কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩
দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

যোদ্ধাগণকে বধ কর, ব্যথিত বা ক্ষুব্ধ হইও না। যুদ্ধ কর, তুমি শত্রুদিগকে জয় করিতে পারিবে।" এই মহান ও ভীষণ কর্ম্মের ফল কি হইবে সে সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল, ভবিষ্যদ্বাণী করা হইল, মানুষ যে বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া ফল কামনা করে সে ফল নহে,—কারণ কর্ম্মফলে আসক্তি রাখা চলিবে না—পরন্তু ভগবদিচ্ছার পরিপূরণ, যে-কার্য্যটি করিতে হইবে তাহার সম্পাদনের গৌরব ও সাফল্য, এই গৌরব ভগবান বিভূতিরূপে নিজেকেই দিতেছেন। এই ভাবেই সেই জগৎ-যুদ্ধের প্রধান নায়ককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার শেষ ও অলঙ্ঘনীয় আদেশ প্রদান করা হইল।

যিনি কালের অতীত তিনিই মহাকাল ও বিশ্ব-পুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়া আদেশ প্রদান করিলেন। কারণ ভগবান যখন বলিলেন, কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ, আমি সত্তাসকলের ধ্বংসকারী মহাকাল, তাহার অর্থ নিশ্চয়ই ইহা নহে যে, তিনি শুধুই মহাকাল এবং মহাকালের সমগ্র মূল তত্ত্বই হইতেছে ধ্বংস করা। কিন্তু এইটিই বর্ত্তমানে তাঁহার সঙ্কল্প ও কর্ম্মধারা, প্রবৃত্তি। ধ্বংস সকল সময়েই সৃষ্টির সহিত এক সঙ্গে বা পর্য্যায়ক্রমে চলে, এবং এইভাবে সমতালে ধ্বংস ও নব-সৃষ্টি করিতে করিতেই জীবনের অধীশ্বর তাঁহার রক্ষা-কার্য্য সম্পাদন করেন। তাহা ছাড়া ধ্বংস হইতেছে প্রগতির জন্য প্রথম প্রয়োজন। অন্তর রাজ্যে যে মানুষ তাহার নীচের সত্তার রূপগুলিকে ধ্বংস না করে, সে উচ্চতর জীবনের মধ্যে উঠিতে সক্ষম হয় না। বাহিরের রাজ্যেও যে রাষ্ট্র বা জনসমাজ বা জাতি তাহার জীবনের প্রাচীন রূপগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে এবং পুনর্গঠন করিতে খুব বেশী দিন ধরিয়া ইতস্ততঃ করে, সে নিজেই

ধ্বংসের অধীন হয়, জীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহার ধ্বংসস্তূপ হইতে অন্য রাষ্ট্র, জনসমাজ এবং জাতি গড়িয়া উঠে। প্রাচীনকালে যে-সব অতিকায় জীব এই পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াই মানুষ পৃথিবীতে নিজের স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে। দানবগণকে বধ করিয়াই দেবগণ বিশ্বে ভগবদবিধানের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখে। যে-কেহ অকালে এই যুদ্ধ ও ধ্বংসের নীতিকে উঠাইয়া দিতে চায়, সে বিশ্ব-পুরুষের মহত্তর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃথা চেষ্টা করে। যে-কেহ তাহার নিম্নতন প্রকৃতির দুর্ব্বলতার জন্য ইহা হইতে সরিয়া থাকিতে চায় (যেমন অর্জ্জুন প্রথমে চাহিয়াছিলেন, এবং সেইজন্যই ভগবান তাহার এই কাতরতাকে মিথ্যা কৃপা, অযশস্কর অনার্য্যসেবিত অস্বর্গ্য ক্লৈব্য ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য বলিয়া তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছিলেন) সে প্রকৃত ধর্ম্মের পথ অনুসরণ করিতেছে না, পরন্তু প্রকৃতির কর্ম্মের এবং জীবনের যে-সকল রূঢ়তর সত্য সেইগুলির সম্মুখীন হইবার অধ্যাত্ম সাহসেরই অভাব দেখাইতেছে। মানুষ যুদ্ধের নীতিকে অতিক্রম করিতে পারে কেবল তাহার মধ্যে অমৃতত্বের মহত্তর নীতির আবিষ্কার করিয়া। কেহ কেহ ইহাকে সেইখানে সন্ধান করেন যেখানে ইহা নিরন্তর রহিয়াছে, শুদ্ধ আত্মার ঊর্দ্ধতন স্তরসকলে, এবং ইহাকে লাভ করিবার জন্য তাহারা মৃত্যুর কবলিত সংসার হইতে সরিয়া যাইতে চাহেন। এইরূপে ব্যক্তিগত সমাধান মিলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে মানবজাতির বা জগতের কোনই লাভ হয় না, অথবা শুধু এইটুকু ফল হয় যে, ঐ অধ্যাত্ম শক্তি তাহাদিগকে যে তাহাদের ক্রমবিকাশের দুষ্কর পথে সাহায্য করিতে পারিত, সেই সাহায্যটুকু হইতেই তাহারা বঞ্চিত হয়।

তাহা হইলে যিনি শ্রেষ্ঠ মানব, দিব্য কর্ম্মী, বিশ্ব-পুরুষের ইচ্ছার অবাধ যন্ত্র, তিনি যখন দেখিবেন যে, বিশ্ব-পুরুষ এক বিরাট বিপ্লবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সংহারক মহাকালরূপে লোকসকলকে বিনাশ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উত্থিত ও প্রবৃদ্ধ হইয়াছেন, এবং তাঁহাকেও স্থূল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধারূপে অথবা লোকসকলের নেতা, দিশারী বা অনুপ্রেরকরূপে সম্মুখে আনা হইয়াছে (তাঁহার স্বভাবজ অন্তর্নিহিত শক্তি তাঁহাকে এই এই অবস্থায় আনিবেই, স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা), তখন তিনি কি করিবেন? তিনি কি বিরত হইবেন, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিবেন, ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রতিবাদ করিবেন? কিন্তু বিরত হইয়া কোনও লাভ নাই, তাহাতে ঐ সংহারক ইচ্ছার পরিপূরণ নিবারিত হইবে না, বরং ঐ ছিদ্রকে ধরিয়া অনর্থ আরও বাড়িয়া উঠিবে। ভগবান বলিলেন, তুমি যুদ্ধ না করিলেও, আমার এই ধ্বংসের সঙ্কল্প পূর্ণ হইবেই, ঋতেঽপি ত্বাং। যদি অর্জ্জুন বিরত হন, এমন কি যদি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও সংঘটিত না হয়, সেই বিরতির ফলে অবশ্যম্ভাবী উপপ্লব, বিশৃঙ্খলা, আসন্ন ধ্বংস আরও দীর্ঘ, আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। কারণ এই সব জিনিষ কেবল আকস্মিক ঘটনা নহে, যে অনিবার্য্য বীজ রোপিত হইয়াছে তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইবেই। তাঁহার প্রকৃতিও তাঁহাকে সত্য সত্যই বিরত হইতে দিবে না, প্রকৃতিঃ ত্বাম্ নিয়োক্ষ্যতি। গুরু শেষে অর্জ্জুনকে এই কথাই বলিয়াছেন :—"অহঙ্কারের বশে তুমি যে জল্পনা করিতেছ, 'আমি যুদ্ধ করিব না', তোমার এ-সঙ্কল্প বৃথাই। প্রকৃতি তোমাকে তোমার কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেই। মোহের বশে তুমি যাহা করিতে চাহিতেছ না, তোমার স্বভাবজনিত

স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া তোমাকে তাহা করিতেই হইবে" ।* তাহা হইলে কি অন্যপন্থা অবলম্বণ করিবে, স্থূল অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ না করিয়া কোনরকম অধ্যাত্ম শক্তি, যৌগিক শক্তি ও প্রণালী প্রয়োগ করিবে? কিন্তু সেইটিও হইবে ঐ কর্ম্মেরই কেবল আর একটি রূপ; তাহাতেও ধ্বংস সংঘটিত হইবে, আর এই ভাবে যে অন্য পন্থা অবলম্বন তাহাও বিশ্বপুরুষেরই ইচ্ছা অনুসারে হইবে, ব্যক্তিগত অহংয়ের ইচ্ছা অনুসারে নহে। এমন কি ধ্বংসের শক্তি এই নূতন শক্তি হইতেই পুষ্টিলাভ করিয়া আরও ভয়ঙ্কররূপে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে, এবং কালী আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ভীষণতর অট্টহাসির রোলে জগৎকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন। প্রকৃত শান্তি হইতেই পারে না, যতক্ষণ না মানুষের হৃদয় শান্তির যোগ্য হইয়া উঠিতেছে; বিষ্ণুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, যতক্ষণ না রুদ্রের ঋণ পরিশোধিত হইতেছে। তবে কি প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে? এই যে মানবজাতি এখনও অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে ইহাকে প্রেম ও ঐক্যের বাণী শুনাইতে হইবে? প্রেম ও ঐক্যধর্ম্মের প্রচারক থাকিবেনই, কারণ শেষ পর্য্যন্ত ঐ পথেই মুক্তি আসিবে। কিন্তু মানুষের মধ্যে কালধর্ম্ম যতদিন না পূর্ণ হইতেছে, ততদিন বাহিরের সত্যের পরিবর্ত্তে ভিতরের সত্য, দৃশ্যমান সত্যের পরিবর্ত্তে পরম সত্য

* যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ১৮।৫৯, ৬০

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধের আবির্ভাব তিরোভাব হইয়া গেল, কিন্তু রুদ্র এখনও তাঁহার কবলে জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে স্বার্থপরতার ছিদ্রান্বেষী শক্তিসকল ও তাহাদের অনুচরগণের দ্বারা উৎপীড়িত অত্যাচারিত মানব তাহার অগ্রগতির জন্য ভীষণ ও দুরূহ সংগ্রামে বীর যোদ্ধার তরবারির সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে, এবং মহাপুরুষের আশ্বাসবাণী শুনিতে চাহিতেছে।

তাঁহার জন্য যে নির্দ্ধারিত শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা হইতেছে অহংভাবশূন্য হইয়া ভগবদিচ্ছা সম্পাদন করা, যাহা ভগবদনির্দ্দিষ্ট বলিয়া দেখিতে পাইতেছেন তাহারই মানবীয় নিমিত্ত ও যন্ত্র হওয়া, তাঁহার মধ্যে, মানুষের মধ্যে, যে-ভগবান রহিয়াছেন সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণে রাখা, মাম্ অনুস্মরন্, তাঁহার প্রকৃতির অধীশ্বর তাঁহাকে যে-পথে চালাইবেন সেই পথই অনুসরণ করা। নিমিত্তমাত্রম্ ভব সব্যসাচীন্। কাহারও প্রতি তিনি ব্যক্তিগত শত্রুতা, ক্রোধ, ঘৃণা পোষণ করিবেন না, স্বার্থপর বাসনা বা আবেগের বশবর্ত্তী হইবেন না, দুর্দ্দান্ত অসুরের ন্যায় দ্বন্দের দিকে ধাবিত হইবেন না, উপদ্রব ও ধ্বংসের জন্য উন্মত্ত হইবেন না, কিন্তু তিনি তাঁহার কার্য্য করিবেন লোকসংগ্রহায়। কার্য্যটির ঊর্দ্ধে তিনি দৃষ্টিপাত করিবেন কার্য্যের লক্ষ্যের দিকে, যাহার জন্য তিনি যুদ্ধ করিতেছেন। কারণ মহাকালরূপী ভগবান ধ্বংস করেন শুধু ধ্বংসের জন্যই নহে, পরন্তু এক মহত্তর রাজ্য স্থাপনের, প্রগতিশীল বিবর্ত্তনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য। বহির্মুখী মন যাহা দেখিতে পায় না, এই যুদ্ধের মহত্ত্ব, জয়ের গৌরব তিনি গভীরতর অর্থে গ্রহণ করিবেন; যদি প্রয়োজন হয় তিনি সেই জয়েরই গৌরব গ্রহণ করিবেন যাহা পরাজয়ের ছদ্মবেশে

আসে, এবং মানুষকে সমৃদ্ধিশালী রাজ্যভোগের দিকেই লইয়া যায়। বিশ্বসংহারমূর্ত্তির আনন দর্শনে ভীত না হইয়া, তিনি ইহার মধ্যে দেখিবেন সেই শাশ্বত আত্মাকে যিনি সকল বিনশ্বর দেহের মধ্যে অবিনশ্বর, এবং ইহার পশ্চাতে দেখিবেন সেই চির-সারথির মুখ যিনি মানবের পথপ্রদর্শক, সর্ব্বভূতের সুহৃদ, সুহৃদম্ সর্ব্বভূতানাম্। এই করাল বিশ্বরূপ দর্শন করা হইল, স্বীকার করা হইল, তাহার পর এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে এই আশ্বাসময় সত্যটিকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; পরিশেষে শাশ্বতের এক অধিকতর হৃদয়গ্রাহী মুখ ও মূর্ত্তি দর্শন করান হইয়াছে।

বিশ্বরূপ দর্শন

দুই ভাব

সেই ভীষণ বিশ্বরূপদর্শনের প্রভাব তখনও অর্জ্জুনের উপর রহিয়াছে, সেই অবস্থায় অর্জ্জুন ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমেই যে-কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন সেগুলি এই মৃত্যু ও ধ্বংসমূর্ত্তির পশ্চাতে যে মহত্তর উৎসাহ ও আশ্বাসপ্রদ সত্য রহিয়াছে তাহারই নির্দ্দেশে পূর্ণ। তিনি বলিয়া উঠিলেন* "হে কৃষ্ণ, তোমার নামকীর্ত্তনে সমস্ত জগৎ হৃষ্ট ও পুলকিত হয়, রাক্ষসকুল ভয়ে দিগ্দিগন্তে পলায়ন করে, সিদ্ধগণ অবনত-মস্তকে তোমাকে নমস্কার করেন—এ-সমস্তই যুক্তিযুক্ত ও যথোচিত। হে মহাত্মা! তোমাকে তাঁহারা কেনই বা নমস্কার না করিবেন? কারণ তুমিই আদি স্রষ্টা ও কর্ম্মকর্ত্তা, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা অপেক্ষাও গরীয়ান। হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি অক্ষর, তুমি সৎ, তুমি অসৎ এবং তুমিই পরাৎপর। তুমি পুরাণ পুরুষ, তুমি আদি-দেব এবং তুমিই এই বিশ্বের পরম নিধান; তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয় এবং তুমিই

---

* স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ১১।৩৬

পরম-ধাম ; হে অনন্তরূপ ! তোমার দ্বারাই বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে*। যম, বায়ু, অগ্নি, সোম, বরুণ, সবই তুমি ; তুমি প্রজাপতি, জীবসকলের পিতা, এবং প্রপিতামহ। তোমাকে পুনঃ পুনঃ, সহস্র সহস্র বার নমস্কার, সম্মুখে তোমাকে নমস্কার, পশ্চাৎভাগে তোমাকে নমস্কার, সকল দিক হইতে তোমাকে নমস্কার, কারণ যাহা কিছু সে-সবই তুমি। তুমি অনন্তবীর্য্য ও অমিতবিক্রম, তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, তুমিই সব।

* কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্নমহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥

এই পরম বিশ্বপুরুষ এখানে মানব-মূর্ত্তি লইয়া নরদেহে তাঁহার সম্মুখে বিরাজ করিতেছিলেন, তিনি দিব্য মানব, দেহধারী ভগবান, অবতার—কিন্তু ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি কেবল তাঁহার মানব স্বরূপটিই দেখিয়াছেন এবং ভগবানের প্রতি শুধু মানুষেরই মত ব্যবহার করিয়াছেন। পার্থিব ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া তাহার পশ্চাতে যে ভগবান বিরাজিত, মানবরূপটি যাঁহার কেবল একটি আধার, একটি প্রতীক মাত্র, তাঁহাকে তিনি দেখিতে পান নাই, তাই এখন তাঁহার অন্ধ অবহেলা ও অসতর্ক অজ্ঞানের জন্য তিনি সেই ভগবানের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।* হঠকারিতার বশে তোমাকে কেবল আমার মানব সখা মাত্র জ্ঞান করিয়া, প্রমাদেই হউক বা প্রণয়েই হউক তোমার এই মহিমা না জানিয়া "হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা" এইরূপ যত সব বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, বিহারে, শয্যায়, উপবেশনে, ভোজনে, একাকী বা তোমার সম্মুখে, তোমার প্রতি যত কিছু অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছি, হে অপ্রমেয়, আমার সে-সব অপরাধ ক্ষমা কর। এই চরাচর সমস্ত লোকের তুমি

---

* সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

পিতা, তুমি পূজ্য, তুমি গুরু হইতেও গরীয়ান।* ত্রিজগতে তোমার সমানই কেহ নাই, তাহা হইলে হে অমিতপ্রভাব, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেই বা হইতে পারে? অতএব বন্দনীয় ঈশ্বর তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ের অপরাধ ক্ষমা করেন তুমি তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর। যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, আমি দেখিয়াছি ও

---

* পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
 ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
 ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
 লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

 তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
 প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
 পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
 প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪

 অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
 ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
 তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
 প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

 কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
 মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
 তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
 সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬

পুলকিত হইয়াছি, কিন্তু আমার মন ভয়ে ব্যাকুল। হে দেব, তোমার সেই অন্য রূপ দেখাও। আমি পূর্ব্বের ন্যায় তোমার কিরীট-গদা-চক্রধারী রূপটি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি। হে সহস্রবাহু, হে বিশ্বমূর্ত্তি, তোমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর।

প্রথমোক্ত কথাগুলি হইতেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই করাল রূপসকলের পশ্চাতে যে-সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা আশ্বাসময়, উৎসাহজনক এবং আনন্দপূর্ণ সত্য। এমন কিছু সেখানে রহিয়াছে যাহাতে ভগবানের সান্নিধ্যে, ভগবানের নামে জগতের হৃদয় হৃষ্ট ও পুলকিত হয়। ইহা সেই গভীর তত্ত্ব যাহার কল্যাণে আমরা কালীর করাল-বদনের মধ্যে মায়ের মুখ দেখিতে পাই, এমন কি ধ্বংসের মধ্যেই সর্ব্বভূত-সুহৃদের বরাভয়প্রদ হস্ত দেখিতে পাই, অশুভের মধ্যে শুদ্ধ অপরিবর্ত্তনীয় কল্যাণরূপকে দেখিতে পাই এবং মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতত্বের অধিপতিকে দেখিতে পাই। দিব্যকর্ম্মের অধীশ্বরের করালমূর্ত্তির সম্মুখ হইতে অন্ধকারের দুর্দ্দান্ত দানবীয় শক্তিসকল, রাক্ষসকল, নিহত পরাজিত অভিভূত হইয়া পলায়ন করে। কিন্তু সিদ্ধগণ, যাঁহারা মৃত্যুঞ্জয়ের নাম জানেন ও কীর্ত্তন করেন এবং তাঁহার সত্তার সত্যে বাস করেন, তাঁহারা তাঁহার প্রত্যেক রূপের সম্মুখেই প্রণত হন এবং জানেন প্রত্যেক রূপের মধ্যে কি বস্তু আছে এবং তাহার অর্থ কি; বাস্তবিক কাহারও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই, ভয়ের কারণ আছে শুধু তাহাদেরই যাহাদিগকে ধ্বংস হইতে হইবে—অশুভ, অজ্ঞান, নিশা-চমূ, রাক্ষসী শক্তিসংঘ। করাল রুদ্রের যত গতি, যত ক্রিয়া সমুদয়েরই লক্ষ্য সিদ্ধি, দিব্য জ্যোতি ও পূর্ণতা।

কারণ এই যে আত্মা, এই ভগবদপুরুষ ইনি শুধু বাহ্যরূপেই সংহারক, এই সব সসীম বস্তুর ধ্বংসকর্ত্তা মহাকাল; কিন্তু নিজের সত্তায় তিনি অনন্ত, বিশ্বদেবগণের অধীশ্বর, তাঁহারই মধ্যে জগৎ এবং ইহার সমুদয় ক্রিয়া নিশ্চিতভাবে বিধৃত। তিনি আদি এবং সর্ব্বদা উদ্ভাবনশীল স্রষ্টিকর্ত্তা, তিনি সৃষ্টিশক্তির মূর্ত্তরূপ ব্রহ্মা অপেক্ষাও গরীয়ান, তাঁহার যে ত্রয়ীভাব, স্থিতি ও ধ্বংসের সাম্যের দ্বারা বিচিত্রিত সৃষ্টি, ইহারই শুধু একটি ভাব রূপে তিনি ব্রহ্মাকে বিশ্বরূপের মধ্যে দেখাইয়াছেন। প্রকৃত যে দিব্য সৃষ্টি তাহা শাশ্বত; তাহা হইতেছে সসীম জিনিষের মধ্যে অনন্তের নিত্য প্রকাশ, পরমাত্মা তাঁহার অগণন অনন্ত জীবাত্মায়, তাহাদের কর্ম্মের মহিমায়, তাহাদের রূপের সৌন্দর্য্যে নিজেকে চিরকাল লুক্কায়িত ও প্রকটিত করিতেছেন। তিান সনাতন, অক্ষর; সৎ অসৎ, ব্যক্ত চির-অব্যক্ত, যে-সব জিনিষ ছিল কিন্তু এখন আর নাই বলিয়া মনে হয়, যে-সব জিনিষ আছে কিন্তু ধ্বংস হইবেই বলিয়া মনে হয়, যে-সব জিনিষ ভবিষ্যতে হইবে এবং লোপ পাইবে—এ-সব তাঁহারই দুই ভাব। কিন্তু এই সকলের উর্দ্ধে তিনি যাহা তাহা হইতেছে তৎ পরং, পরম পুরুষ, তিনি সকল নশ্বর জিনিষকে কালের এক আনন্তের মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছেন, সেখানে সবই চির-বিরাজমান। তাঁহার অক্ষর সত্তা রহিয়াছে কালের অতীত আনন্তে, কাল এবং সৃষ্টি তাহারই চির-প্রকাশমান রূপ।

তাঁহার এই যে সত্য, ইহার মধ্যেই সকলের সমন্বয় হইয়াছে; যুগপৎ ও পরস্পরসাপেক্ষ সত্যসকলের সামঞ্জস্য সেই এক সত্য হইতেই উদ্ভূত এবং এই সকলকে লইয়াই সেই সত্য এই সত্য হইতেছে পরমাত্মার,

যাঁহার পরমা প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি, জগৎ সেই অনন্তেরই একটি নীচের রূপ; তিনি পুরাণ পুরুষ, কালের অন্তর্গত সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশধারার উপর তিনি অধ্যক্ষ হইয়া আছেন; তিনি আদিদেব, সকল দেব, মানব ও জীব তাঁহারই সন্তান, শক্তি, আত্ম-সত্তা, তাঁহারই সত্তার সত্যে সকলের আধ্যাত্মিক সার্থকতা; তিনি জ্ঞাতা, তিনিই মানুষের মধ্যে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকাশ করিয়া দেন; তিনি সকল জ্ঞানের একমাত্র জ্ঞেয়, যিনি মানুষের হৃদয়, মন ও আত্মার সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করেন, আমাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রত্যেক নববিকাশ তাঁহারই আংশিক প্রকাশ, আর আমাদের যে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান তাহাতে তিনিই অন্তরঙ্গ ভাবে, গভীর ভাবে, সমগ্র ভাবে দৃষ্ট ও আবিষ্কৃত হন। তিনি উচ্চ পরম সংস্থান, পরং নিধানং, বিশ্বে যাহা কিছু আছে তিনিই সবকে সৃষ্টি করিতেছেন, ধরিয়া রহিয়াছেন, নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার দ্বারা তাঁহার নিজেরই সত্তার মধ্যে জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, তাঁহার সর্ব্বজয়ী শক্তি দ্বারা, তাঁহার অলৌকিক আত্মরূপায়ন, তেজ এবং অন্তহীন সৃষ্টির আনন্দের দ্বারা। তাঁহার অনন্ত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক রূপসকলকে লইয়াই সমগ্র বিশ্ব। নিম্নতম হইতে উচ্চতম সমস্ত দেবতাই তিনি, জীবগণের পিতা, সকলেই তাঁহার সন্ততি, তাঁহার প্রজা। তিনি ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা, এই সকল বিভিন্ন জাতির জীবগণের দিব্য স্রষ্টা যাঁহারা, তিনি তাঁহাদের পিতার পিতা, প্রপিতামহ। এই সত্যটির উপর পুনঃ পুনঃ জোর দেওয়া হইয়াছে। পুনরায় পুনরাবৃত্তি করা হইল যে, তিনি সবই, প্রত্যেকটিই তিনি, সর্ব্বঃ। তিনি অনন্ত বিশ্বসত্তা আবার প্রত্যেক ব্যষ্টিসত্তা, প্রত্যেক

বস্তুই তিনি, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে এক শক্তি ও সত্তা রহিয়াছে তাহা তিনিই, তিনি অনন্ত তেজ যাহা অসংখ্য বস্তুসকলের মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করিতেছে, তিনি অপ্রমেয় ইচ্ছা এবং গতি ও কর্ম্মের মহতী বীর্য্য নিজের মধ্য হইতে কালের সকল প্রবাহ এবং প্রাকৃত জগতে আত্মার সমুদয় ঘটনাকে রূপ দিতেছেন, গঠন করিতেছেন।

এই সত্যটির উপর পুনঃ পুনঃ জোর দেওয়ায় মানুষের মধ্যে এই যে মহান ভগবান বিরাজ করিতেছেন তাঁহার কথা স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। বিশ্বরূপ-দ্রষ্টার হৃদয়ে ক্রমান্বয়ে তিনটি তত্ত্ব উপলক্ষিত হইল। প্রথমতঃ তাঁহার উপলব্ধি হইল, এই যে মানব-সন্তান পৃথিবীর একটি অনিত্য জীবরূপে তাঁহার পার্শ্বে বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহার সন্নিকটে উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, এক স্থানে ভোজন করিয়াছেন এবং যাঁহার সহিত তিনি কত ব্যঙ্গ কৌতুক করিয়াছেন, যিনি যুদ্ধে, মন্ত্রণা পরিষদে এবং সাধারণ ব্যাপারে কর্ম্মী হইয়াছেন, ইহার দেহে, মর মানবের এই মূর্ত্তিটির মধ্যে বরাবরই একটি মহান ও বিরাট তাৎপর্য্যপূর্ণ কিছু লুক্কায়িত ছিল,—এক দেবতা, এক অবতার, এক বিশ্বশক্তি, একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক বিশ্বাতীত পরম সত্তা। এই যে গুহ্য দেবত্ব, যাহার মধ্যে মানুষ এবং তাহার সমগ্র ইতিহাসের তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে এবং যাহা হইতে সমস্ত বিশ্ব-জীবন অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্বপূর্ণ নিগূঢ় সার্থকতা লাভ করিতেছে, অর্জ্জুন এই দিকে অন্ধ ছিলেন। কেবল এখনই তিনি দেখিলেন ব্যষ্টি-আয়তনের মধ্যে বিশ্ব-আত্মা, মানবদেহের মধ্যে ভগবান, এই প্রতীক স্বরূপ প্রকৃতির মধ্যে অধিষ্ঠিত বিশ্বাতীত পরম পুরুষ। দৃশ্যমান বস্তু সকলের এই যে বিরাট,

অনন্ত, অপ্রমেয় সত্তা, এই যে সীমাহীন বিশ্বরূপ যিনি প্রত্যেক ব্যষ্টিরূপকে অতিক্রম করিয়া আছেন, আবার প্রত্যেক ব্যষ্টিরূপই যাঁহার আবাস গৃহ, অর্জ্জুন কেবল এখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। কারণ সেই মহান সত্তা সমান এবং অনন্ত, ব্যষ্টিতে এবং বিশ্বে তিনি একই। আর প্রথমেই তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহার অন্ধতা, ভগবানের প্রতি সাধারণ মানুষের ন্যায় ব্যবহার, তাঁহার সহিত কেবল মানসিক ও শারীরিক সম্বন্ধটি ছাড়া আর কিছু না দেখা—তাঁহার পক্ষে এ-সব হইয়াছে সেই মহান শক্তিময়ের বিরুদ্ধে পাপ; কারণ যাহাকে তিনি কৃষ্ণ, যাদব, সখা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তিনি এই অপ্রমেয় মহত্ত্ব, এই অতুলনীয় বীর্য্য, এই সর্ব্বভূতস্থিত আত্মা যাঁহার সৃষ্টি এই বিশ্ব প্রপঞ্চ। মানবীয় তনুটিকে অবজ্ঞা না করিয়া সেইটিকে আশ্রয় করিয়া যিনি বিরাজিত তাঁহাকেই বিস্ময়, ভক্তি ও অনুরাগের সহিত তাহার দেখা ও উপাসনা করা উচিত ছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় তত্ত্বটি হইতেছে এই যে, মানবীয় রূপ এবং মানবীয় সম্বন্ধের ভিতর দিয়া যাহা মূর্ত্ত হইয়াছে সেইটিও সত্য, বিশ্বরূপের করাল স্বরূপের সহিত সেইটি যুক্ত থাকিয়া আমাদের মনের কাছে উহাকে সহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। ভগবানের বিশ্বাতীত সত্তা এবং বিশ্বাত্মক রূপ দেখিতে হইবে, কারণ তাহা ছাড়া মানবীয়তার গণ্ডী অতিক্রম করা সম্ভব নহে। সেই ঐক্যসাধক একত্বের মধ্যে সবকে লইতে হইবে। কিন্তু শুধু এইটির দ্বারা বিশ্বাতীত সত্তা এবং নীচের প্রকৃতিতে বদ্ধ এই সসীম জীবাত্মার মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হইবে। অনন্ত স্বরূপের যে পূর্ণ তেজ, সীমাবদ্ধ ব্যষ্টিগত প্রাকৃত মানবের স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রতার পক্ষে তাহা

অসহনীয়। একটি যোগসূত্র চাই যাহার সাহায্যে সে বিরাট বিশ্বপুরুষকে দেখিতে পারে নিজের ব্যষ্টিগত প্রাকৃত সত্তার মধ্যে, নিজের সন্নিকটে। তিনি শুধু তাঁহার বিশ্বব্যাপী ও অপ্রমেয় বীর্য্যের দ্বারা তাহার সব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন না, পরন্তু মানবীয় মূর্ত্তিতে তাহাকে সাহায্য করিতেছেন এবং অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ভিতর দিয়া তাহাকে ঐক্যের মধ্যে তুলিয়া লইতেছেন। যে-ভক্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ জীব অনন্তের সম্মুখে প্রণত হয়, তাহা তখনই পূর্ণ মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠে এবং সখ্য ও ঐক্যের নিগূঢ়তম সত্যের সমীপবর্ত্তী হয়, যখন তাহা গভীর হইয়া অধিকতর অন্তরঙ্গ ভক্তিতে পরিণত হয়, ভগবানকে পিতারূপে অনুভব করা যায়, সখারূপে অনুভব করা যায়, পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণমূলক প্রেমের অনুভব লাভ করা যায়। কারণ ভগবান মানব আত্মা, মানব দেহের মধ্যে বাস করেন; তিনি পরিচ্ছদের ন্যায় মানবীয় মন ও মূর্ত্তির দ্বারা নিজেকে আবরিত করেন। নরদেহের মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মা পরস্পরের মধ্যে যে-সব সম্বন্ধ স্থাপন করে, ভগবানও সেই সব সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং ভগবানকে অবলম্বন করিয়াই সে-সব পায় তাহাদের পূর্ণতম সার্থকতা এবং মহত্তম সিদ্ধি। ইহাই বৈষ্ণব ভক্তি, এখানে গীতার কথাগুলির মধ্যে ইহার বীজ রহিয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ইহাদের অধিকতর গভীর, আনন্দময় ও সার্থকতাপূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

আর এই দ্বিতীয় তত্ত্বটি হইতেই আর একটি তত্ত্ব আপনিই উদ্ভূত হইতেছে। এই যে বিশ্বাতীত এবং বিশ্বময় পুরুষের রূপ, মুক্ত আত্মার শক্তির পক্ষে ইহা মহান, উৎসাহপ্রদ, সাহসপ্রদ, ইহা বীর্য্যের উৎস, এই

দর্শন সমতা সাধন করে, উন্নয়ন করে, সকল জিনিষের সার্থকতা দেখাইয়া দেয়; কিন্তু সাধারণ মানবের পক্ষে ইহা অসহনীয়, ভয়ঙ্কর, দুর্ব্বোধ্য। এই যে সর্ব্বগ্রাসী কাল এবং ধারণাতীত ইচ্ছাশক্তির ভীষণ ও মহান রূপ, এই বিরাট অপ্রমেয় গহন কর্ম্মধারা, ইহার পিছনে যে আশ্বাসপ্রদ সত্য রহিয়াছে সেটিকে জানিলেও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়। কিন্তু আবার দিব্য নারায়ণের প্রসন্ন মধ্যবর্ত্তী রূপও আছে, সেখানে ভগবান মানুষের অতি সন্নিকটে, এবং তাহার মধ্যেই বিরাজিত, তিনি যুদ্ধে এবং যাত্রাপথে সারথি, সাহায্য করিবার জন্য তিনি চতুর্ভুজ, তিনি ভগবানের মানবীয় ভাবাপন্ন প্রতীক, এই সহস্রবাহু বিশ্বরূপ নহেন। নির্ভর করিবার জন্য মানুষকে এই মধ্যবর্ত্তী রূপটিই সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে। কারণ যে-সত্য আশ্বাস প্রদান করে, নারায়ণের এই রূপই তাহার প্রতীক। বিশ্বের কর্ম্মধারাসকল তাহাদের বিরাট আবর্ত্তন, পশ্চাৎগতি, অগ্রগতির ভিতর দিয়া মানুষের অন্তরাত্মা ও অন্তর্জীবনের পক্ষে যে বিশাল অধ্যাত্ম আনন্দে চরম পরিণতি লাভ করে, যেটি তাহাদের অত্যাশ্চর্য্য কল্যাণময় লক্ষ্য, সেইটি অন্তরঙ্গ, দৃশ্য, জীবন্ত, সহজবোধ্য হইয়া উঠে নারায়ণের এই সৌম্যমূর্ত্তির সাহায্যে। এই মানবীয় ভাবাপন্ন দেহধারী পুরুষের সহিত মিলন ও সান্নিধ্যই হয় তাহাদের পরিণাম,—মানুষের সহিত ভগবানের নিত্য সাহচর্য্য, মানুষ জগতে ভগবানের জন্যই জীবন যাপন করে, ভগবান মানুষের মধ্যে বাস করেন, এই রহস্যময় জগৎলীলাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মানুষের মধ্যে নিজের দিব্য ইচ্ছাসকলই পূর্ণ করেন। আর মানুষের এই পরিণামেরও পরে হইতেছে অধিকতর আশ্চর্য্যময়

ঐক্য, শাশ্বতের শেষ রূপান্তরসকলের মধ্যে নিবিড়ভাবে বাস করা।

অর্জ্জুনের প্রার্থনার উত্তরে ভগবান তাঁহার স্বকীয় সাধারণ নারায়ণ রূপ পুনরায় ধারণ করিলেন, স্বকং রূপম্, প্রসাদ ও প্রেম ও মাধুরী ও সৌন্দর্য্যের বাঞ্ছনীয় মূর্ত্তি*। কিন্তু অন্য যে বিরাট মূর্ত্তিটি তিনি সম্বরণ করিতেছেন সেইটির অপরিমেয় গূঢ়ার্থের কথা প্রথমেই বলিলেন। তিনি বলিলেন—"যাহা তুমি এখন দেখিতেছ, ইহা আমার পরম মূর্ত্তি, আমার তেজোময় রূপ, বিশ্বাত্মক, আদ্য, আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন এ পর্য্যন্ত আর কেহ দেখিতে পায় নাই।† আমি আমার আত্মযোগের দ্বারা ইহা দেখাইয়াছি। কারণ ইহা আমার আত্মার, আমার নিগূঢ় অধ্যাত্ম সত্তারই রূপ, এই রূপে পরাৎপর পরম পুরুষ নিজেকে বিশ্বলীলায় প্রকট করিয়াছেন; আমার সঙ্গে যে পূর্ণযোগে যুক্ত কেবল সে-ই এই রূপ অবিচলিত ভাবে দেখিতে পারে, তাহার স্নায়ুমণ্ডলী কম্পিত হয় না, তাহার মন বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে না, কারণ ইহার বাহ্যরূপে

* ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

† ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭

যাহা ভয়ঙ্কর ও দুঃসহনীয় আছে সে শুধু তাহাই দেখে না, কিন্তু ইহার মহান ও আশ্বাসময় নিগূঢ় মর্ম্মও উপলব্ধি করিতে পারে। আর তোমারও উচিত বিমূঢ় ও অবশ না হইয়া আমার এই ঘোর রূপ দর্শন করা* ; কিন্তু তোমার নিম্নতন প্রকৃতি এখনও ইহাকে সেই মহৎ সাহস ও স্থৈর্য্যের সহিত দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই, অতএব তোমার জন্য আমি পুনরায় আমার নারায়ণ রূপ ধারণ করিতেছি, তাহার মধ্যে মানুষের মন পৃথকভাবে, মানবীয় শক্তির অনুযায়ী প্রশমিত ভাবে সুহৃদরূপী ভগবানের সৌম্যভাব, আনুকুল্য ও আনন্দকে দেখিতে পায়। মহত্তর রূপটি অদৃশ্য হইবার পর ভগবান আবার বলিলেন, † "কেবল অসাধারণ শ্রেষ্ঠ মহাত্মারাই ঐ রূপ দেখিতে পান। দেবতাগণই নিত্য এই রূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন। বেদের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দানের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা ইহাকে লাভ করা যায় না, ইহাকে

* মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ় ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

† সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিনঃ ॥ ৫২
নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো হ্যহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪

দেখা যায়, জানা যায়, ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় কেবল সেই ভক্তির দ্বারা যাহা সর্ব্বভূতে শুধু আমাকেই শ্রদ্ধা করে, ভজনা করে, ভালবাসে।”

কিন্তু তাহা হইলে এই রূপের এমন কি বৈশিষ্ট্য যাহার জন্য ইহা এতদূর ধারণাতীত যে, মানবজ্ঞানের সকল সাধারণ প্রয়াস, এমন কি তাহার অধ্যাত্ম সাধনারও গভীরতম তপস্যা অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে সে রূপ দর্শনে সমর্থ হয় না? তাহা এই যে, মানুষ অন্যান্য উপায়ে একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তার কোন একটি বিশেষ ভাবকে আংশিক-ভাবে, স্বতন্ত্রভাবে জানিতে পারে, তাঁহার ব্যষ্টিগত বা বিশ্বাতীত রূপসকলকে জানিতে পারে, কিন্তু ভগবানের সকল ভাবের সমন্বয়মূলক এই যে মহত্তম ঐক্য, যাহাতে এক সময়ে একসঙ্গে একই রূপের মধ্যে সমস্ত প্রকটিত, সমস্ত অতিক্রমিত, সমস্ত সংসিদ্ধ—ইহাকে নহে। কারণ বিশ্বাতীত, বিশ্বগত, ব্যষ্টিগত ভগবান, আত্মা ও প্রকৃতি, অনন্ত ও সান্ত, দেশ ও কাল ও কালাতীত ভাব, সৎ (Being) ও সম্ভূতি (Becoming), ভগবান সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু ভাবিতে, জানিতে চেষ্টা করি, কৈবল্যাত্মক সত্তাই হউক বা প্রকটিত বিশ্বলীলাই হউক, সবই এখানে এক অনির্ব্বচনীয় ঐক্যে অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই দর্শন লাভ করা যায় কেবল সেই অনন্য ভক্তি দ্বারা, সেই প্রেমের ও নিবিড় ঐক্যের দ্বারা যাহা পূর্ণ বিকশিত কর্ম্ম ও জ্ঞানের মুকুটস্বরূপ। ইহাকে জানা, ইহাকে দর্শন করা, ইহার মধ্যে প্রবেশ করা, পরম পুরুষের এই পরম রূপের সহিত এক হওয়া তখনই সম্ভব হয়, এবং এইটিকেই গীতা নিজ যোগের লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছে।

এক পরম চৈতন্য আছে, তাহার ভিতর দিয়া বিশ্বাতীতের মহিমার মধ্যে প্রবেশ করা এবং তাঁহার মধ্যে অক্ষর আত্মা এবং ক্ষর সর্ব্বভূতকে ধারণ করা সম্ভব হয়,—সকলের সহিত এক হইয়াও সকলের উর্দ্ধে থাকা, জগতের অতীত হওয়া অথচ বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাতীত ভগবানের সমগ্র প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করা সম্ভব হয়। মন ও দেহের মধ্যে বন্দী সীমাবদ্ধ মানুষের পক্ষে ইহা কঠিন সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগবান বলিলেন "আমার কর্ম্ম কর, আমাকে পরম পুরুষ, পরম বস্তু বলিয়া স্বীকার কর, আমার ভক্ত হও, আসক্তি বর্জ্জন কর, সর্ব্বভূতের প্রতি বৈরিতাশূন্য হও; কারণ এইরূপ মানুষই আমাকে প্রাপ্ত হয়।"* অন্য কথায়, নিম্নতন প্রকৃতিকে জয়, সর্ব্বভূতের সহিত ঐক্য, বিশ্বাত্মক ভগবান এবং বিশ্বাতীত সত্তার সহিত একত্ব, কর্ম্মে ভগবদিচ্ছার সহিত ঐক্য, অদ্বিতীয় একের প্রতি, সর্ব্বভূতস্থিত ভগবানের প্রতি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন প্রেম,—ইহাই হইতেছে পন্থা যাহার দ্বারা মানুষ সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া সেই সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম মুক্তি এবং সেই অচিন্ত্য রূপান্তর লাভ করিতে পারে।

* মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ১১।৫৫

পথ ও ভক্ত

গীতার একাদশ অধ্যায়ে গীতাশিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটি সাধিত হইয়াছে এবং তাহাকে কতকটা পূর্ণ করিয়া তোলা হইয়াছে। দিব্য কর্ম্মের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যে-আত্মা জগতের মধ্যে এবং ইহার জীবসকলের মধ্যে রহিয়াছে তাহার সহিত যোগে, জগতের হিতের জন্য সে-কর্ম্ম করিতে হইবে, এবং বিভূতি সে আদেশ মানিয়া লইয়াছেন। শিষ্যকে তাহার সাধারণ মানবোচিত পুরাতন ভাব, তাহার অজ্ঞানের আদর্শ, উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গী, স্বার্থ চেতনা হইতে, শেষকালে তাহার অধ্যাত্ম সঙ্কটের সময় যে-সব আর তাহার কোন কাজেই লাগে নাই সে-সব হইতে তাহাকে ফিরান হইয়াছে। সেই প্রতিষ্ঠায় যে-কর্ম্মটিকে তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই ঘোর কর্ম্ম, ভয়াবহ প্রয়াসকেই তিনি এখন স্বীকার করিতে, এক নূতন অভ্যন্তরীণ ভিত্তিতে গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। এক সমন্বয়কারী মহত্তর জ্ঞান, এক দিব্যতর চৈতন্য, এক উচ্চ নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্য, যে ভগবদিচ্ছা আদি জ্যোতি হইতে উৎসারিত হইয়া অধ্যাত্ম প্রকৃতির প্রেরণাশক্তি লইয়া জগতের উপর ক্রিয়া করিতেছে তাহার সহিত ঐক্যের আধ্যাত্মিক স্থিতি—ইহাই হইতেছে কর্ম্মের নূতন অভ্যন্তরীণ নীতি, ইহাই পূর্ব্বতন অজ্ঞান কর্ম্মকে রূপান্তরিত করিয়া দিবে। যে জ্ঞান ভগবানের সহিত ঐক্য স্থাপন করে এবং ভগবানের

পরম আত্মা। তিনি পরম ঈশ্বর, সকল কর্ম্ম ও বিশ্বপ্রকৃতির প্রভু। তিনি একই সময়ে জীবের অন্তরপুরুষরূপে তাহার দেহ মন আত্মার মধ্যে বিরাজ করেন, আবার সে-সবকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। তিনি পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর ও পরমাত্মা, এবং এই সকল সমতুল্য রূপের মধ্যেই তিনি সেই এক শাশ্বত ভগবান। এই সমগ্র সমন্বয়সাধক জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হওয়াই আত্মার চরম মুক্তিলাভের এবং প্রকৃতির কল্পনাতীত অচিন্ত্য সংসিদ্ধিলাভের প্রশস্ত দ্বার। এই যে-ভগবানে তাঁহার সকল রূপের সম্মিলন হইয়াছে, ইঁহারই উদ্দেশ্যে আমাদের কর্ম্ম, আমাদের ভক্তি, আমাদের জ্ঞানকে নিত্য অভ্যন্তরীণ যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করিতে হইবে। এই যে পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম, বিশ্বের অতীত. আবার ইহার আধারস্বরূপ আত্মা, ইহার অধিবাসী, ইহার অধিপতি, যিনি ঠিক এই ভাবেই কুরুক্ষেত্রের মহান বিশ্বরূপের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছেন, ইঁহারই মধ্যে মুক্ত আত্মাকে প্রবেশ করিতে হইবে; আর সে ইহা পারিবে যখন সে একবার তাঁহাকে তাঁহার সকল তত্ত্ব এবং সকল শক্তির সহিত জানিয়াছে, দর্শন করিয়াছে, যখন সে তাঁহার অনন্তমুখী ঐক্যকে ধারণা করিতে, উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে, জ্ঞাতুম্ দ্রষ্টুম্ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুম্ চ।

অদ্বিতীয় একের মধ্যে নির্মজ্জিত হইয়া জীবের ব্যক্তিগত সত্তার যে আত্ম-বিস্মৃত বিলোপসাধন, সাযুজ্যমুক্তি, গীতার মুক্তি তাহা নহে; ইহা একই সঙ্গে সকল প্রকারের মিলন। এখানে আছে পরম ভগবানের সহিত মূল সত্তায়, চৈতন্যের অন্তরঙ্গতায় এবং আনন্দের ঐক্যে সম্পূর্ণ সংযোজন, সাযুজ্য,—কারণ এই যোগের একটি লক্ষ্য হইতেছে ব্রহ্ম

হওয়া, ব্রহ্মভূতঃ। এখানে আছে পরমপুরুষের শ্রেষ্ঠতম সত্তার মধ্যে আনন্দময় চিরনিবাস, সালোক্য,—কারণ বলা হইয়াছে, তুমি আমার মধ্যে বাস করিবে, নিবসিষ্যসি মায্যেব। এখানে আছে ঐক্যসাধক সামীপ্যে অনন্ত প্রেম ও ভক্তি, এখানে মুক্ত জীব তাহার প্রেমাস্পদ ভগবানের আলিঙ্গনে আবদ্ধ, তাহার সকল আনন্তের আধার আত্মায় পরিবৃত, সামীপ্য। এখানে আছে ভগবদ প্রকৃতির সহিত জীবের মুক্ত প্রকৃতির একত্ব, সাদৃশ্য মুক্তি,—কারণ মুক্ত জীবের সিদ্ধাবস্থা হইতেছে ভগবানেরই তুল্য হওয়া, মদ্‌ভাবমাগতাঃ, এবং সত্তার ধর্ম্মে, কর্ম্ম ও প্রকৃতির ধর্ম্মে তাঁহার সহিত এক হওয়া, সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ। প্রাচীনপন্থী জ্ঞানযোগের লক্ষ্য হইতেছে এক অনন্ত সত্তার অতলতায় নিমজ্জিত হওয়া, সাযুজ্য; তাহা কেবল এইটিকেই পূর্ণ মুক্তি বলিয়া গণ্য করে। ভক্তিযোগ ভগবানের সামীপ্য কিম্বা তাঁহার মধ্যে নিত্য নিবাসকেই মহত্তর মুক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, সালোক্য, সামীপ্য। কর্ম্মযোগ চায় সত্তা ও প্রকৃতির শক্তিতে একত্ব, সাদৃশ্য। কিন্তু গীতা তাহার উদার সমগ্রতায় এই-সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে এবং সকলের সমন্বয় করিয়া এক মহত্তম, সমৃদ্ধতম দিব্য মুক্তি ও সংসিদ্ধিতে পরিণত করিয়াছে।

এই প্রভেদটি সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে দিয়া প্রশ্ন করান হইল। মনে রাখিতে হইবে যে, নৈর্ব্যক্তিক অক্ষর পুরুষ এবং পুরুষোত্তম যিনি একই সময়ে নৈর্ব্যক্তিক এবং দিব্য পুরুষ এবং এই দুইয়েরও বহু ঊর্দ্ধে, এই উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ (কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ অহম্ মাম্ বলিতে যে ভাগবত "আমি" কে বুঝিয়াছেন তাহাতে এই মুখ্য প্রভেদটি উপলক্ষিত হইয়াছে), এ পর্য্যন্ত স্পষ্ট ভাবে, সঠিকভাবে এই প্রভেদটি করা হয়

নাই। আমরা বরাবর এই প্রভেদটি পূর্ব্ব হইতেই ধরিয়া লইয়াছি, যাহাতে প্রথম হইতেই গীতার বাণীর পূর্ণ মর্ম্মটি বুঝিতে পারা যায়, নতুবা এই মহত্তর সত্যের আলোকে নূতনভাবে দেখিয়া আমাদিগকে সেই একই কথা পুনরায় বলিতে হইত। অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, প্রথমতঃ তাঁহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিস্বরূপকে এক অদ্বিতীয় শাশ্বত ও অক্ষর আত্মার শান্ত নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে নিমজ্জিত করিতে, এ-শিক্ষা তাঁহার পূর্ব্ব ধারণাসকলের অনুযায়ীই হইয়াছিল এবং ইহা বুঝা তাঁহার পক্ষে কঠিন হয় নাই। কিন্তু এখন তাঁহার সম্মুখে দেখান হইতেছে এই মহত্তম বিশ্বাতীত সত্তাকে, এই বিশালতম বিশ্বপুরুষকে এবং জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি দ্বারা ইহার সহিতই একত্বলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করা হইতেছে। অতএব, এ-সম্বন্ধে যে সন্দেহ উঠিতে পারে তাহার সমাধান করা ভাল মনে করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে-সকল ভক্ত এইভাবে নিত্যযুক্ত হইয়া তোমাকে উপাসনা করে, ত্বাম্, এবং যাহারা অব্যক্ত, অক্ষর আত্মার উপাসনা করে, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা কাহারা?"* আত্মনি অথ ময়ি, "আমাতে, তাহার পর আত্মাতে", এই সব বাক্যের দ্বারা প্রথমেই যে প্রভেদ করা হইয়াছিল, এখানে সেইটিই পুনরায় সূচিত হইতেছে। অর্জ্জুন প্রভেদ করিলেন, ত্বাম্ আর অক্ষরম্ অব্যক্তম্। তাঁহার বক্তব্যের সার মর্ম্ম এই, তুমি সকল সত্তার পরম উৎস ও আদি, সকল বস্তুতে অনুস্যূতে ভগবদ সত্তা, তোমার রূপসকলের দ্বারা বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত শক্তি

* এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১২।১

তুমি, তোমার বিভূতি সকলের মধ্যে, জীবগণের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে প্রকট পুরুষ তুমি, তোমার মহীয়ান বিশ্বযোগের দ্বারা কর্ম্মের অধীশ্বররূপে জগতের মধ্যে এবং আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তুমি বিরাজিত। এই ভাবেই তোমায় আমাকে জানিতে হইবে, ভক্তি করিতে হইবে, আমার সকল সত্তায়, চেতনায়, চিন্তায়, অনুভবে ও কর্ম্মে তোমার সহিত নিজেকে যুক্ত করিতে হইবে, সততযুক্ত। কিন্তু তাহা হইলে এই যে অক্ষর সত্তা যাহা কখনও ব্যক্ত হয় না, কখনও কোন রূপ পরিগ্রহ করে না, সকল কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র থাকে, সরিয়া দাঁড়ায়, জগতের সহিত বা ইহার কোনও বস্তুর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখে না, যাহা চির-নিস্তব্ধ, অদ্বিতীয়, নৈর্ব্যক্তিক, অচল—ইহার সম্বন্ধে কি? সকল প্রচলিত মতবাদ অনুসারে এই শাশ্বত আত্মাই হইতেছে মহত্তর তত্ত্ব, ব্যক্ত ভগবান একটি নিম্নতন রূপ; ব্যক্ত নহে, অব্যক্তই হইতেছে শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তা। তাহা হইলে এই যে যোগ অভিব্যক্তিকে স্বীকার করে, এইটি কেমন করিয়া মহত্তর যোগ-জ্ঞান হইল?

শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়তার সহিত এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দিলেন। "যাহারা আমার উপর মন নিবেশ করে, এবং নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত আমাকে উপাসনা করে, আমার মতে তাহারাই শ্রেষ্ঠতম যোগী"*। তাহাই পরম শ্রদ্ধা যাহা সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখে,

* ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩

যাহার দৃষ্টিতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত একই ভগবান। তাহাই পূর্ণতম যোগ যাহা ভগবানকে পায় প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক কর্ম্মে এবং প্রকৃতির সকল সমগ্রতা দিয়া। কিন্তু যাহারা কঠিন পথ ধরিয়া অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষরের অভিমুখে আরোহণ করিতে চায়, ভগবান বলিলেন, তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হয়। কারণ তাহাদের লক্ষ্যে কোনও ভুল নাই, কেবল তাহাদের পথ অধিকতর কঠিন এবং তাহা ততখানি সম্পূর্ণ ও অখণ্ড নহে। অব্যক্ত কৈবল্যাত্মক সত্তাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য এখানে যে-ব্যক্ত অক্ষর সত্তা রহিয়াছে ইহারই মধ্য দিয়া তাহাদিগকে উঠিতে হয়, এবং তাহাদের পক্ষে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পন্থা। এই ব্যক্ত অক্ষর সত্তা হইতেছে আমারই সর্ব্বব্যাপী নৈর্ব্যক্তিকতা ও প্রশান্তি; বিরাট, অচিন্ত্য কূটস্থ, ধ্রুব, সর্ব্বত্র বিদ্যমান ইহাই ক্ষর পুরুষের কর্ম্মকে ধারণ করিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে যোগদান করে না। মন ইহার মধ্যে অবলম্বন করিবার কিছুই পায় না; ইহাকে পাওয়া যায় কেবল এক নিশ্চল অধ্যাত্ম নৈর্ব্যক্তিকতা ও প্রশান্তি দ্বারা, আর যাহারা শুধু ইহাকেই অনুসরণ করে তাহাদিগকে মন ও ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্মকে সম্যকরূপে সংযত করিতে হয়, এমন কি সম্পূর্ণভাবেই প্রত্যাহার করিতে হয়। তথাপি তাহাদের বুদ্ধির সমতা দ্বারা, সকল জিনিষের মধ্যে এক আত্মাকে দর্শনের দ্বারা এবং সর্ব্বভূতের হিতের জন্য স্থির শান্ত শুভ সঙ্কল্পের দ্বারা তাহারাও সকল বস্তু, সকল জীবের মধ্যে আমাকে প্রাপ্ত হয়। যাহারা তাহাদের সত্তার সকল ভাবে, সর্ব্বভাবেন, নিজেদিগকে ভগবানের সহিত

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪

সক্ত করে, এবং বিশ্বের বস্তুসকলের জীবন্ত উৎস অচিন্ত্য দিব্য পুরুষের মধ্যে সমগ্র ও পূর্ণভাবে প্রবেশ করে, ঠিক তাহাদেরই ন্যায় এই যে সব উপাসক এই অধিকতর কষ্টকর অনন্য একত্বের ভিতর দিয়া এক সম্বন্ধবিহীন অব্যক্ত কৈবল্যাত্মক সত্তাকে লাভ করিতে চায়, ইহারাও পরিশেষে সেই একই শাশ্বতকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ-পথটি তেমন সরল নহে এবং ইহা অধিকতর ক্লেশদায়ক। অধ্যাত্মভাবাপন্ন মানবপ্রকৃতির পক্ষে এইটি সমগ্র ও স্বাভাবিক গতি নহে।

আর ইহা মনে করাও ভুল যে, এই পথটি অধিকতর ক্লেশদায়ক সেই জন্যই ইহা উচ্চতর এবং অধিকতর ফলদায়ী প্রণালী। গীতার যে অপেক্ষাকৃত সুগম পন্থা তাহা অধিকতর দ্রুত, স্বাভাবিক ও সহজভাবে সেই একই পূর্ণ মুক্তির দিকে লইয়া যায়। কারণ ইহা ভাগবৎ পুরুষকে স্বীকার করে বলিয়া যে দেহধারী প্রকৃতির মানসিক ও ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় বন্ধনসকলে আসক্ত হইয়া পড়ে তাহা নহে। বরঞ্চ ইহা জন্ম ও মৃত্যুর বাহ্যিক বন্ধন হইতে অচিরে নিশ্চিতভাবে মুক্তি আনিয়া দেয়*। অনন্য জ্ঞান পন্থার যোগীকে নিজের প্রকৃতির অশেষ প্রকার দাবীর সহিত কষ্টকর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে হয়; তিনি তাহাদিগকে উচ্চতম ভোগ হইতেও বঞ্চিত করেন এবং তাঁহার অধ্যাত্ম সত্তার ঊর্দ্ধমুখী প্রবৃত্তিগুলিকেও বর্জ্জন করেন যখনই তাহারা কোনরূপ সম্বন্ধের সূচনা করে অথবা নৈতিমূলক কৈবল্যাত্মক সত্তায় পৌছাইয়া দিতে অক্ষম হয়। অন্য পক্ষে গীতার যে জীবন্ত পন্থা তাহা আমাদের

* তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌॥ ৭

সত্তার তীব্রতম ঊর্দ্ধমুখী গতিকে আবিষ্কার করে এবং সেইটিকে ভগবদ্-মুখী করিয়া জ্ঞান, সঙ্কল্প, অনুভব, সিদ্ধিলাভের স্বাভাবিক প্রেরণা, এই সকলকে শক্তিশালী সহায়রূপে ব্যবহার করিয়া পূর্ণ মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়। অব্যক্ত ব্রহ্ম তাহার অনির্দ্দেশ্য একত্বে এমন জিনিষ যে দেহধারী জীব কচিৎ তাহাকে লাভ করিতে পারে, এবং তাহাও পারে কেবল সর্ব্বদা দুঃখ স্বীকার করিয়া, সকল অঙ্গকে নিগ্রহ করিয়া, প্রকৃতিকে কঠোরভাবে ক্লেশ ও যন্ত্রণা দিয়া, দুঃখম্ অবাপ্যতে, ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্*। অনির্দ্দেশ্য অদ্বিতীয় সত্তা যাহারা তাহার নিকট উঠিয়া আসে সকলকেই গ্রহণ করে, কিন্তু কোনরূপ সম্বন্ধের দ্বারা সাহায্য করে না, আরোহণকারীদিগকে ধরিবার মত কোনও অবলম্বন দেয় না। সবই করিয়া লইতে হয় কঠোর তপস্যার দ্বারা, কঠিন ও একক ব্যক্তিগত প্রয়াসের দ্বারা। কিন্তু যাহারা গীতার পন্থায় পুরুষোত্তমের উপাসনা করে তাহাদের পথ কত পৃথক! যখন তাহারা অনন্যযোগে তাঁহাকে ধ্যান করে, কারণ তাহারা সবকেই বাসুদেব বলিয়া দেখে, তিনি প্রতি স্থানে, প্রতি মুহূর্ত্তে, অসংখ্য মূর্ত্তিতে তাহাদিগকে দেখা দেন, তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া ধরেন, এবং ইহার দিব্য ও সুখময় জ্যোতিতে সমগ্র জীবনকে প্লাবিত করিয়া দেন। জ্ঞানদীপ্ত তাহারা প্রত্যেক মূর্ত্তিতেই পরম আত্মাকে চিনিতে পারে, সকল প্রকৃতির ভিতর দিয়া একেবারেই তাহারা প্রকৃতির অধীশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, সকল সত্তার ভিতর দিয়া সকল সত্তার অন্তপুরুষকে

* ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ১২ । ৫

প্রাপ্ত হয়, নিজেদের ভিতর দিয়া তাহারা নিজেরা যাহা কিছু সে-সবেরই আত্মাকে প্রাপ্ত হয়; ক্ষণমাত্রে শত দ্বার যুগপৎ বিদীর্ণ করিয়া তাহারা তাহাকে প্রাপ্ত হয় যাহা হইতে প্রত্যেক জিনিষের উৎপত্তি। অন্য প্রণালীটি কঠিন সম্বন্ধহীন স্তব্ধতার পথ, তাহা চায় সকল কর্ম্ম হইতে সরিয়া যাইতে, কিন্তু দেহধারী জীবের পক্ষে ইহা অসম্ভব। আর এখানে সকল কর্ম্ম পরম কর্ম্মেশ্বরকে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা হয় এবং তিনি পরম ইচ্ছাশক্তিরূপে যজ্ঞের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করেন, ইহার সকল বোঝা তুলিয়া লন, এবং আমাদের মধ্যে দিব্য প্রকৃতির কর্ম্মের ভার নিজে গ্রহণ করেন। আর যখন ভক্ত বিপুল প্রেমাবেগে মানবের ও সর্ব্বভূতের দিব্য সখা ও প্রেমাস্পদের উপরে সমগ্র হৃদয় ও চিত্ত নিবেশ করে, তাঁহাতেই আনন্দ আকাঙ্ক্ষা করে, তখনও পরম পুরুষ সমুদ্ধর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তারূপে দ্রুত তাহার সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁহার মন, হৃদয়, দেহের সুখময় আলিঙ্গন দিয়া তাহাকে এই মৃত্যুসমাকুল সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করেন এবং শাশ্বতের চির-নিরাপদ বক্ষের মধ্যে তুলিয়া লন।

তাহা হইলে এইটিই দ্রুততম, উদারতম, মহত্তম পন্থা। ভগবান মানবাত্মাকে বলিলেন,* আমাতে তোমার সমস্ত মন স্থাপন কর, সমস্ত বুদ্ধি নিবেশ কর। আমি দিব্য প্রেম ও ইচ্ছা ও জ্ঞানের পরম জ্যোতিতে এই সকলকে অভিষিক্ত করিয়া ইহাদের উৎস আমারই মধ্যে তুলিয়া লইব। সংশয় করিও না, এই মরজীবনের ঊর্দ্ধে তুমি আমার মধ্যেই

---

* ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়॥ ১২।৮

বাস করিবে। যে অমর আত্মা শাশ্বত প্রেম, সঙ্কল্প ও জ্ঞানের আবেগ, শক্তি ও জ্যোতিতে মহিমান্বিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র পার্থিব প্রকৃতির শৃঙ্খল তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। অবশ্য এই পথেও বিঘ্ন আছে; কারণ নীচের প্রকৃতি রহিয়াছে তাহার প্রচণ্ড অথবা স্থূল নিম্নমুখী আকর্ষণ লইয়া, তাহা আরোহণের গতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং উন্নয়ন ও উর্দ্ধমুখী উল্লাসের গতিপথ অবরুদ্ধ করে। ভাগবত চৈতন্যকে যখন কোন অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অথবা কোন প্রশান্ত ও প্রোজ্জ্বল অবকাশে প্রথম লাভ করা যায়, তখনও তাহাকে একেবারে ধরিয়া রাখা সম্ভব হয় না, বা ইচ্ছামত পুনরায় ডাকিয়া আনা যায় না*; অনেক সময়েই ব্যক্তিগত চৈতন্যকে ভগবানে স্থির নিবিষ্ট করিয়া রাখা যায় না; জ্যোতি হইতে নির্ব্বাসনের কত দীর্ঘ রজনী আছে, বিদ্রোহ, সংশয়, ব্যর্থতার কত প্রহর বা মুহূর্ত্ত আছে। তথাপি যোগ অভ্যাসের দ্বারা, এবং অনুভূতি উপলব্ধির পুনরাবৃত্তির দ্বারা সেই উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্য সত্তার মধ্যে বিকশিত হয় এবং প্রকৃতিকে স্থায়ীভাবে অধিকার করিয়া লয়। মনের বহির্মুখী প্রবৃত্তির প্রাবল্য ও দুর্নিবারতার জন্য এইরূপ অভ্যাসও কি অতি কঠিন? তাহা হইলে সহজ পথ, কর্ম্মেশ্বরের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম্ম করা, যেন মনের প্রত্যেক বহির্মুখী গতি সত্তার ভিতরের অধ্যাত্ম সত্যের সহিত সংযুক্ত হয়। তখন প্রাকৃত মানবের মধ্যে পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠা গড়িয়া

---

* অথ চিত্তং সমাধাতুম্ ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০

উঠিবে, এবং ক্রমশঃ সে ইহার দ্বারা পূর্ণ হইয়া একটি দেবতায়, এক অধ্যাত্মপুরুষে পরিণত হইবে; সকল জীবন হইবে ভগবানের নিত্য অনুস্মরণ, এবং সিদ্ধিরও বিকাশ হইবে, এবং মানবাত্মার সমগ্র জীবনের সহিত পরম ভাগবত সত্তার একত্ব বিকশিত হইবে।

কিন্তু এমনও হইতে পারে যে ভগবানের এইরূপ নিত্য অনুস্মরণ এবং আমাদের সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাতে উৎসর্গ করা সীমাবদ্ধ মনের পক্ষে সাধ্যাতীত বলিয়া অনুভূত হয়, কারণ স্মৃতিভ্রংশতা বশতঃ সে-মন কর্ম্ম এবং কর্ম্মের বাহ্যিক লক্ষ্যের দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে এবং প্রত্যেক ক্রিয়াকে ভগবানের দিব্য বেদীতলে অর্পণ করিতে ভুলিয়া যায়। তাহা হইলে পথ হইতেছে কর্ম্মে নীচের সত্তাকে সংযত করা এবং ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম্ম করা*। সকল ফল বর্জ্জন করিতে হইবে, সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং, যে দিব্য শক্তি কর্ম্মকে পরিচালিত করিতেছে তাহার নিকট উৎসর্গ করিতে হইবে, অথচ সে-শক্তি প্রকৃতির উপর যে-কর্ম্মের ভার অর্পণ করে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। কারণ এই উপায়ে বাধা ক্রমশঃ হ্রাস পায় এবং সহজেই দূর হইয়া যায়, মন ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে এবং ভাগবত চেতনার মুক্তির মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করিতে সুযোগ পায়। আর এইখানে গীতা শক্তি অনুযায়ী সাধনার ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে†। কোন প্রচেষ্টা ও অনুভূতির

---

* অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌॥ ১১

† শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌॥ ১২

পুনরাবৃত্তি, অভ্যাস, মহান ও শক্তিশালী বস্তু; কিন্তু ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে জ্ঞান, বস্তু সকলের পশ্চাতে যে-সত্য রহিয়াছে চিন্তাকে তদভিমুখী করিয়া সফল ও জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোলা; আবার এই মানসিক জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইতেছে সম্পূর্ণ একাগ্রতার সহিত সত্যকে নীরবে ধ্যান করা যেন চৈতন্য পরিশেষে ইহার মধ্যে বাস করিতে পারে এবং সর্ব্বদা ইহার সহিত এক হইতে পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও শক্তিশালী হইতেছে কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ করা, কারণ তাহা অনতিবিলম্বে সকল রকম বিক্ষোভের কারণকে নাশ করে, এবং স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে অভ্যন্তরীণ স্থিরতা ও শান্তি স্থাপন করে, আর স্থিরতা ও শান্তিই হইতেছে সেই ভিত্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া সব কিছু পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, এবং প্রশান্ত আত্মার অধিকারের মধ্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে। তখন চৈতন্য নিরুদ্বেগ হইতে পারে, সানন্দে নিজেকে ভগবানে নিবিষ্ট করিতে পারে এবং অবিচলিতভাবে সিদ্ধিলাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। তখন জ্ঞান, সঙ্কল্প ও ভক্তি অটুট শান্তির সুদৃঢ় ভূমি হইতে শাশ্বতের আকাশের মধ্যে নিজেদের শিখর উন্নীত করিতে পারে।

তাহা হইলে যে-ভক্ত এই পন্থা অনুসরণ করিয়া শাশ্বতের অনুরক্ত হয় তাহার দিব্য প্রকৃতি কি হইবে, তাহার চেতনার ও সত্তার মহত্তর অবস্থাটি কি হইবে? গীতা প্রথম হইতেই যে সমতা, নিষ্কামতা ও অধ্যাত্ম মুক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছে, এখানে কয়েকটি শ্লোকে তাহাদেরই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বদা এইটিই হইবে ভিত্তি এবং সেইজন্য প্রারম্ভেই ইহার উপর এত জোর দেওয়া হইয়াছিল। এবং সে সমতায় ভক্তি, পুরুষোত্তমের প্রতি প্রেম ও অনুরাগ আত্মাকে এব

মহত্তম, শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধির দিকে তুলিয়া লইয়া যাইবে, এই শান্ত সমতাই হইবে তাহার উদার প্রতিষ্ঠা-ভূমি। এই মূলগত সম-চৈতন্যের কয়েকটি সূত্র এখানে দেওয়া হইয়াছে।* প্রথমতঃ, অহংভাবের, "আমি" ও "আমার" ভাবের বর্জ্জন, নির্ম্মমঃ, নিরহঙ্কারঃ। যিনি পুরুষোত্তমের ভক্ত তাঁহার হৃদয় ও মন বিশ্বপ্রসারিত, তাহা অহংয়ের সকল সঙ্কীর্ণ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। বিশ্বপ্রেম তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, সেখান হইতে সর্ব্বভূতের প্রতি করুণা সর্ব্বতোমুখী সমুদ্রের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহার থাকিবে সর্ব্বভূতের প্রতি মৈত্রী ও করুণা, কোন জীবের উপরেই তাঁহার ঘৃণা নাই; কারণ তিনি ধৈর্য্যশীল, চির-সহিষ্ণু, তিতিক্ষাশালী, তিনি ক্ষমার নির্ঝর। তাঁহার আছে কামনাশূন্য সন্তোষ, সুখে দুখে

* অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮

আনন্দে ও যন্ত্রণায় স্থির সমতা, অবিচলিত আত্মসংযম এবং যোগীজন-সুলভ দৃঢ় অটল সঙ্কল্প ও স্থিরনিশ্চয়তা এবং এমন প্রেম ও ভক্তি যাহা সমস্ত মন ও বুদ্ধিকে তাঁহার চৈতন্য ও জ্ঞানের অধীশ্বর ভগবানে অর্পণ করে। অথবা সংক্ষেপে তিনি হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি বিক্ষুব্ধ চঞ্চল নীচের প্রকৃতি হইতে এবং ইহার হর্ষ, ভয়, উদ্বেগ, ক্রোধ, কাম প্রভৃতির তরঙ্গ হইতে মুক্ত, তিনি হইবেন শান্ত আত্মা, তাঁহার দ্বারা জগৎ সন্তপ্ত বা ব্যথিত হয় না, তিনিও জগতের দ্বারা সন্তপ্ত বা ব্যথিত হন না—তিনি শান্ত আত্মা, তাই তাঁহার নিকটে সকলেই শান্ত।

অথবা তিনি হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি সকল কামনা ও কর্ম্ম তাঁহার জীবনের অধীশ্বরকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ ও শান্ত, যাহাই আসুক সকল বিষয়ে উদাসীন, কোন ফল, কোন ঘটনার দ্বারাই তিনি ব্যথিত বা ক্ষুব্ধ হন না, তিনি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী অহঙ্কারের বশে, ব্যক্তিগত ভাবে ও মনের দ্বারা তিনি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কোন কর্ম্মই আরম্ভ করেন না, তিনি তাঁহার মধ্য দিয়া ভাগবত ইচ্ছা ও ভাগবত জ্ঞানকে তাঁহার নিজের সঙ্কল্প, ব্যক্তিগত অভিলাষ বা বাসনার দ্বারা বিচ্যুত না করিয়া অবাধে প্রবাহিত হইতে দেন, অথচ ঠিক সেই জন্যই তিনি তাঁহার প্রকৃতির সকল কর্ম্মে হন ক্ষিপ্র ও সুকৌশলী, কারণ পরম ভগবানের ইচ্ছার সহিত এই যে নিখুঁত ঐক্য, এই যে শুদ্ধ যন্ত্রভাব, ইহা হইতেই আসে কর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌশল। আবার তিনি হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি সুখের স্পর্শ আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাহাতে হর্ষান্বিত হন না, দুঃখের স্পর্শেও দ্বেষ করেন না বা তাহার ভারে শোকাচ্ছন্ন হন না। তিনি শুভ ও অশুভের প্রভেদ লোপ করিয়া

দিয়াছেন, কারণ তাঁহার ভক্তি তাঁহার শাশ্বত প্রেমিক ও প্রভুর হস্ত হইতে সকল জিনিষই সমানভাবে মঙ্গলময় বলিয়া গ্রহণ করে। যিনি ভগবানের প্রিয় ভগবদ্ভক্ত তাঁহার আত্মায় আছে উদার সমতা; শত্রু মিত্র, মান অপমান, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, মানুষের সাধারণ প্রকৃতি এই যে-সব দ্বন্দ্বে পীড়িত হয় এ-সবেরই প্রতি তাঁহার সমভাব। কোন ব্যক্তি বা বস্তুতে, কোন স্থান বা নিকেতনে তাঁহার কিছুমাত্র আসক্তি থাকিবে না*; তিনি যেরূপ পরিস্থিতির মধ্যেই থাকুন, মানুষ তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুক, তাঁহার পদ বা ভাগ্য যাহাই হউক সবেতেই তিনি সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত। সকল জিনিষেই তাঁহার মন থাকিবে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ, কারণ তাহা শ্রেষ্ঠতম আত্মায় নিত্য অবস্থিত এবং তাঁহার প্রেম ও ভক্তির একমাত্র পাত্র ভগবানে চিরনিবিষ্ট। সমতা, কামনাশূন্যতা এবং নীচের অহংভাবময় প্রকৃতির এবং তাহার দাবীসকল হইতে মুক্তি,—গীতা মহান্ মুক্তির সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ভিত্তিস্বরূপ সর্ব্বদা এইগুলিকেই প্রয়োজনীয় বলিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত তাহার মূল শিক্ষা ও প্রথম প্রয়োজনটির উপর পুনঃ পুনঃ জোর দেওয়া হইয়াছে,—শান্ত জ্ঞানময় আত্মা যাহা সকল জিনিষের মধ্যেই এক অধ্যাত্ম সত্তাকে দেখিতে পায়, স্থির অহংভাবশূন্য সমতা যাহা এই জ্ঞানেরই ফল, নিষ্কাম কর্ম্ম যাহা এই সমতার মধ্যে কর্ম্মেশ্বরকে উৎসর্গ করা হয়, মানুষের সমগ্র মানসিক প্রকৃতিকে মহত্তর অভ্যন্তরীণ ভাগবৎ সত্তার হস্তে সমর্পণ। আর এই সমতার শিখর হইতেছে সেই প্রেম যাহার ভিত্তি জ্ঞানে, যাহা যন্ত্রভাবে

* তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

কর্ম্ম করায় পরিপূর্ণতা লাভ করে, যাহা সকল জিনিষ, সকল বস্তুর প্রতিই প্রসারিত, যে ভাগবত পুরুষ এই বিশ্বের স্রষ্টা ও অধীশ্বর, সুহৃদম্ সর্ব্বভূতানাম্ সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্, তাঁহার প্রতি উদার একনিষ্ঠ সর্ব্বতোমুখী প্রেম।

এইটিই হইতেছে সেই ভিত্তি, সেই বিধান, সেই উপায় যাহা দ্বারা শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্ম মুক্তি লাভ করিতে হইবে; ভগবান বলিলেন, যাহাদের ইহা কোনরূপ আছে তাহারা সকলেই আমার প্রিয়, ভক্তিমান্ মে প্রিয়ঃ। কিন্তু আমার অতীব প্রিয়, অতীব মে প্রিয়াঃ, হইতেছে ভগবানের নিকটতম সেই সকল ভক্ত যাহাদের ভগবদ্ভক্তি আরও উদারতর ও মহত্তর সিদ্ধির দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, এই মাত্র আমি সেইটিরই পথ ও প্রণালী তোমাকে দেখাইলাম*। সেই সব ভক্ত পুরুষোত্তমকেই তাহাদের একমাত্র পরম লক্ষ্য করে এবং এই শিক্ষায় বর্ণিত অমৃত ধর্ম্ম পূর্ণতম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করে। গীতার ভাষায় ধর্ম্ম শব্দের অর্থ হইতেছে, সত্তা ও তাহার কর্ম্মের স্বভাবসিদ্ধ নীতি এবং অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি হইতে উৎসারিত এবং তদ্দ্বারা নির্দ্ধারিত কর্ম্ম, স্বভাবনিয়তম্ কর্ম্ম। মন, প্রাণ, দেহের যে নিম্নতন অজ্ঞান চৈতন্য তাহাতে আছে বহু ধর্ম্ম, বহু নীতি, বহু আদর্শ ও নিয়ম; কারণ মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক প্রকৃতির আছে বহু বিচিত্র রূপায়ন ও শ্রেণী। অমৃত ধর্ম্ম এক; তাহা উচ্চতম আধ্যাত্মিক ভাগবত চৈতন্য এবং তাহার শক্তি সকলের ধর্ম্ম। তাহা গুণত্রয়ের অতীত, এবং তাহা

---

* যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

লাভ করিতে হইলে এই সকল নীচের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেই হই সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। সে-সবের পরিবর্ত্তে শাশ্বতের এক মুক্তিও একত্বসাধক চৈতন্য ও শক্তিই হইবে আমাদের কর্ম্মের একমাত্র অনন্ত উৎস, আমাদের কর্ম্মের ছাঁচ, নিয়ামক শক্তি ও দৃষ্টান্তস্বরূপ আদর্শ। আমাদের নিম্নতন ব্যক্তিগত অহংভাবকে ছাড়াইয়া উঠা, শাশ্বত সর্ব্বব্যাপী অক্ষরপুরুষের নৈর্ব্যক্তিক ও সমতাপূর্ণ শান্তির মধ্যে প্রবেশ করা, সেই শান্তি হইতে আমাদের সকল প্রকৃতি, সকল সত্তার সমগ্র আত্মসমর্পণের দ্বারা অক্ষরেরও উপরে যে অন্যতর পুরুষ রহিয়াছেন, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে তদভিমুখী করা, ইহাই হইতেছে এই যোগের প্রথম প্রয়োজন। সেই আকাঙ্ক্ষার শক্তিতেই আমরা অমৃত-ধর্ম্মে উঠিতে সক্ষম হই। সেখানে সত্তায়, চৈতন্যে ও ভাগবত আনন্দে শ্রেষ্ঠতম উত্তম পুরুষের সহিত এক হইয়া, তাঁহার পরম লীলাময়ী প্রকৃতি-শক্তির (স্বা প্রকৃতি) সহিত এক হইয়া মুক্ত আত্মা অনন্তভাবে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, অসীমভাবে ভালবাসিতে পারে, এক উচ্চতম অমৃতত্ব ও পূর্ণতম মুক্তির যথার্থ শক্তিতে অটল ভাবে কর্ম্ম করিতে পারে। গীতার অবশিষ্টাংশে এই অমৃত ধর্ম্মের উপরেই পূর্ণতর আলোকসম্পাত করা হইয়াছে।